প্রাকৃতিক বিপর্যয়
ও
তার মোকাবিলা



ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন

WBVHA-এ প্রসঙ্গে দু'চার কথা

WBVHA রাজ্যস্তরের বেসরকারী সংস্থা সমূহের এক সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অগ্রগন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে চলেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের এক হাজারেরও বেশী সহযোগী বেসরকারী সংস্থা আছে যারা স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের কাজ করে।

WBVHA এর (ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশন) সমগ্র ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই ভি-এইচ-এ রয়েছে যারা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ, সমন্বয় ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে। নতুন দিল্লীতে জাতীয় স্তরে একটি সমন্বয় নিগমও আছে।

WBVHA বেসরকারী ও সরকারী উভয় সংস্থারই স্বাস্থ্য ও উন্নয়ণের কাজকে শক্তিশালী করতে যে সব বিষয়ে সাহায্য করে থাকে তা নিম্নরূপ :-

যে কোন সাংগঠনিক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া, দক্ষতা বাড়ান, তথ্য আদান-প্রদান, সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ, কাজের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ ও নিরুপণ, ভিত্তি-স্তরে সমীক্ষা, প্রচার কাজে সহায়তা, শিক্ষামূলক উপাদানের মান উন্নয়ন ও বন্টন, প্রকল্প রচনায় সহায়তা, প্রকল্প চলাকালীন তত্ত্বাবধান, সরকারী-বেসরকারী নীতি পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরী করা, প্রাক্ অর্থ প্রদান বিষয়ক সমীক্ষা, কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণ, মূল্যায়ণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রকাশনা ও জনশিক্ষামূলক প্রচার পুস্তিকা।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন
১৯এ, ডাঃ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন : ২৪৪ ৬৭৫৪ / ২৪৬ ০১৬৩

প্রাকৃতিক বিপর্যয়
ও
তার মোকাবিলা

লেখক ঃ তারক ব্যানার্জি

ডিরেক্টর

ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স সেল

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন

১৯এ, ডাঃ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

ফোন ঃ ২৪৬-০১৬৩, ফ্যাক্স ঃ ২৪৪ ৬৭৫৪

Email : wbvha@giascl01.vsnl.net.in

dpcwbvha@vsnl.net

web : www.wbvha.org.

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও তার মোকাবিলা
PRAKRITIK BIPARJOY O TAR MOKABILA

চতুর্থ সংস্করণ ঃ আগস্ট, ২০০২

প্রধান সম্পাদক ঃ ডি. পি. পোদ্দার

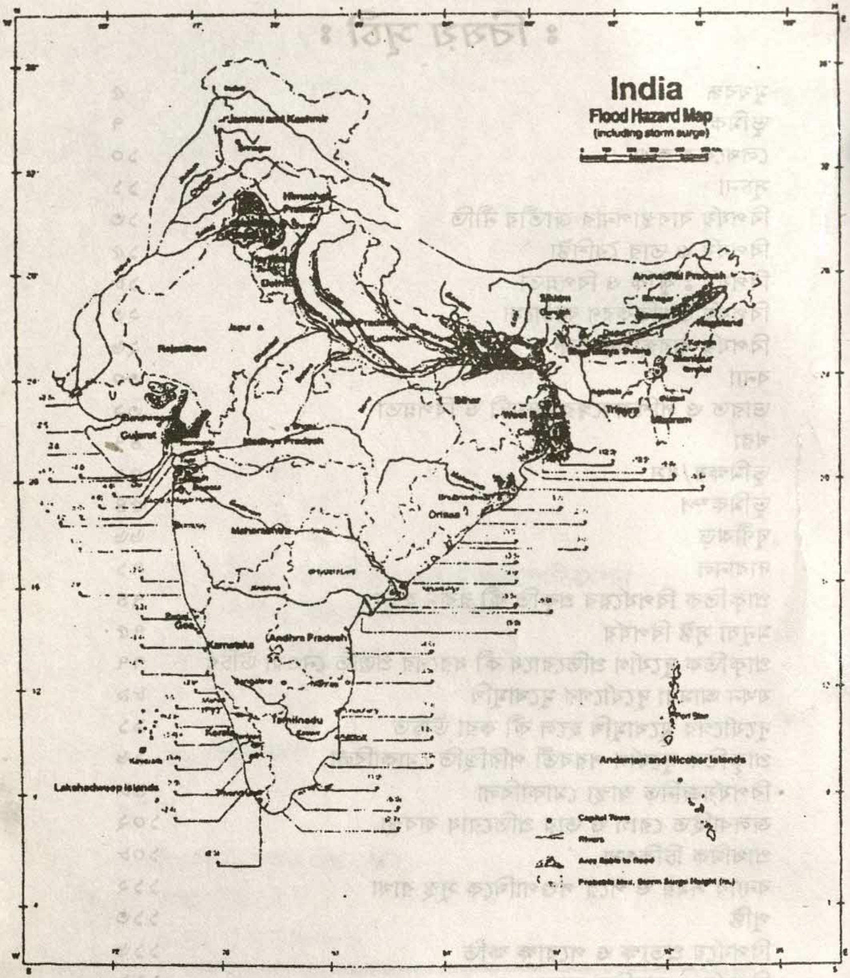
সম্পাদনা ঃ অতীন সরকার

প্রকাশক ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন
১৯এ, ডাঃ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ বি. আর. ঘোষ এণ্ড কোং
কলকাতা-১২
ফোন ঃ ২২৭-০০৮১

ঃ বিষয় সূচী ঃ



Source : District Disaster Management
Ministry of Agriculture, Govt. of India.

মুখবন্ধ

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের কাছে চিরকালীন বিভীষিকা। সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ একে দেব-দেবীর অভিশাপ বলে মনে করত। তাই তারা সেই সব দেবদেবীকে তুষ্ট করতে পূজা দিত। তেমনি ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল বরুণ দেব, পবন দেব প্রমুখ। দেবদেবীদের তুষ্ট করতে এখনও দেখা যায় ঝড় উঠলে ঘরে ঘরে শাঁখ বাজানো হয়, দেওয়া হয় উলুধ্বনি। মানুষের এই কাজ হল অন্যদের বিপর্যয় সম্পর্কে সজাগ করা। প্রকৃতি চলে নিজের নিয়মে। আমরা সেই নিয়মকে বদল করতে পারি না, কাজে লাগাতে পারি মাত্র। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে সাধারণভাবে আমাদের অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাতে ঘটে জীবন হানি, ফসল সহ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি। এই ক্ষতি কোন কোন সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে।

নানা ধরনের বিপর্যয় থাকলেও তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাকৃতিক, মনুষ্য সৃষ্ট এবং মানুষ ও প্রাকৃতিক যৌথ কারণে সৃষ্ট। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ, গভীরতা ও উৎস এখনও মানুষ সম্পূর্ণভাবে আগাম জানতে পারে না। যেমন আগ্নেয়গিরির লাভার স্রোত, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণীঝড়, খরা প্রভৃতি। আর কোন কোন সময় আগাম সঙ্কেত পাওয়া গেলেও সাবধান না হওয়ায় বিপদ বেড়ে যায়। অন্যগুলি হল, মানুষের অবহেলা বা অপকর্মের ফলে সৃষ্ট। যেমন নদী তল ভরাট হয়ে অববাহিকায় প্লাবন, নদীর পাড়ে বাঁধ দিয়ে মাছচাষ বা ইঁটভাটা তৈরি প্রভৃতি। অন্যদিকে জীবাণুঘটিত নানা বিপর্যয় বহুকাল ধরেই আছে। নদীর তলানি না কেটে বা বাধা না সরিয়ে শুধু বাঁধ উঁচু করে বন্যা ঠেকানো যায় না। শিল্প দুর্ঘটনা, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা, যান বাহনের ধোঁয়া, পাহাড়ের ধস নামা প্রভৃতিও বিপর্যয়। আবার গাছ কেটে বা বিপর্যয়ে গাছপালা বিধ্বস্ত হয়ে সৃষ্টি হয় খরা এবং অবাধ হয় ঝড়ের দাপট। তাছাড়া জবর দখল ও জঙ্গলে আটকে যাওয়া প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে সৃষ্টি হয় প্লাবন। এখন জলাধার ও নদী মোহনায় পলি জমে থাকা প্লাবনের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। এছাড়া নদীর মধ্যে নানা ভাবে মানুষের তৈরি বাঁধের ফলে নদীর গতি স্বাভাবিক থাকে না। সৃষ্টি হয় কৃত্রিম বন্যা। লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মানুষ নদী ও সমুদ্রের কাছে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এরাই বন্যার সময় বেশি আক্রান্ত হয়। এমনি ধারা প্লাবন খোদ কলকাতায় দেখা গেছে ১৯৯৯ সালে এবং ২০০০ সালে দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দেখা গেছে মানুষের দুর্গতি ও মৃত্যু।

আবার এর বিপরীত চিত্রও দেখা গেছে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে। সেখানে বন সৃজনের পরে বৃষ্টিপাত বেড়েছে। সেই জল কাজে লাগানোয় মরু অঞ্চলের সঙ্কোচন ঘটেছে। তাই আমাদের সব ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ ও সচেতন হতে হবে, প্রস্তুতি নিতে হবে প্রাক্‌বিপর্যয় স্তরে। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে বিপর্যয় কালে ও পরবর্তী পুনর্বাসন পর্বে। এগুলি সবই এক সূত্রে গাঁথা একটি মালা। স্থায়ী ও আশু সমাধান-এর সুতো এবং অন্য সব এর ফুল।

সারা ভারতের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গেরও স্থান রয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় ১৭৩৭ সালে ভূমিকম্পে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। তাই একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলার মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি কম হয় না।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ্ অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য স্তরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থা নিজে এবং তার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি সারা রাজ্যে গত ২৭ বছর ধরে জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। মানুষের চেতনা বৃদ্ধি ও এই কাজে কর্মীদের প্রশিক্ষণ আমাদের প্রধান কাজ। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আমরা আমাদের কাজের ক্ষেত্রের বাইরে রাখতে পারি না। নানা ধরনের ত্রাণের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তীব্রতা বুঝতে পেরেছি। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতা ও রাজ্যের ১৫টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০০ সালের সেই সেপ্টেম্বরেই আবার অল্প সময়ের বেশি বৃষ্টি, জলাধার থেকে হঠাৎ বেশি জল ছাড়া এবং নদীর জোয়ার এক সঙ্গে মিলে রাজ্যের ৯টি জেলা ডুবে যায়। জলাধার ও নদীতে পলি এবং সেই সঙ্গে নদী পথে বাঁধা থাকায় জল নিকাশি ছিল নিতান্তই মন্থর। ফলে দুর্গতি হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। সরকারি হিসাবেই মানুষ মারা গেছে প্রায় ১৩৫৩ জন। মজুদ ধান-চাল যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি ছাগল ও গবাদি পশুও মারা গেছে অগণিত। এমন কি সংরক্ষিত বনের পশুও মারা গেছে প্রচুর সংখ্যায়।

২০০১ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে গুজরাটে এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে কয়েক হাজার লোক বাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছেন গৃহহীন, বহুতল বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে তাসের ঘরের মত। ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। এই মানুষদের পাশে সামান্য ক্ষমতা নিয়েও আমরা দাঁড়িয়েছি।

১৯৯৯ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রস্তাব আসে। তারই সূত্রধরে আমরা একটি কর্মশিবির পরিচালনা করি। সেখানে উপস্থিত এবং অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শিবিরকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় নানা পথ ও পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে। জরুরী প্রয়োজন বিবেচনা করে একটি বিশেষ বিভাগও খোলা হয়েছে। সেখান থেকে সকল স্তরের মানুষকে জরুরী সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলার কাজ তুলে ধরতে চাই। তাই এই প্রয়াশ। আমরা বুঝেছি এবং অন্যদের বোঝাতে চাই—বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। যতটা ভালভাবে বাঁচা যায় সেটাই কাম্য। এই বইটির প্রয়োজনীয় সংযোজন সহ চতুর্থ সংস্করণ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করি।

ডি পি পোদ্দার

১৫ই আগষ্ট, ২০০২

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন

ভূমিকা

জন্মলগ্ন থেকেই পৃথিবীকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সৌর মন্ডল এবং তার অন্তর্গত গ্রহাদির সৃষ্টি সম্ভবত প্রাকৃতিক সংঘাত, বিপর্যয়, কিম্বা আকস্মিক ঘটনাতেই সংঘটিত। বিতর্কিত হ'লেও সৃষ্টি রহস্যে বিগ বাং থিয়োরী উপেক্ষনীয় নয়।

অতিক্রান্ত কোটি বছরে মাতা ধরিত্রীর বহু রূপান্তর হ'য়েছে। তৎ সম্ভূত জীবন, যা সৌর মন্ডল বা তৎসম কোন অনুরূপ অংশে আছে কিনা, সেই নিয়ে গবেষণার অন্ত নাই।

পৃথিবীতে এক কোষ নিবিষ্ট প্রাণ থেকে শুরু করে সব থেকে জটিল প্রজাতি মানুষ। কাব্য করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে গূঢ় যে মানুষ আপন অন্তরালে যার কোন পরিমাপ নাই কোন কালে, বৈশিষ্টময় এই পৃথিবী সৃষ্ট প্রজাতিই পারে তার শ্রষ্টা প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে। সৃষ্টির অপার রহস্যে অনেক অংশই এখন তার গোচরী ভূত।

মনুষ্য জাতি শৈশবে তার সীমিত জ্ঞানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ বুঝতে পারতো না। কল্পনা করতে তার নিজের চেয়ে অনেক শক্তিমান কোন জীবের কথা ভাবত। যাকে নাম দিয়েছিল দেবতা। মনে করতো তাদের ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টিই এই সমস্ত অনাসৃষ্টির কারণ, তাদের সন্তুষ্টি বিধানই এই সমস্ত বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। দেবতা আবিষ্কারের আগে তারা পুজা করেছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে, নিজের সমগোত্রীয় ছাড়া অন্য প্রাণী যেমন মাছ, কুর্ম, সরীসৃপকে। সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে পর্বত সমুদ্র আকাশ, বৃক্ষ, প্রভৃতি প্রকৃতিরই বিভিন্ন অংশকে।

দেবত্ব আরোপ করেছে সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর। এই প্রাথমিক অনভিজ্ঞতার ভীতি এবং অসহায়ত্ব থেকে মুক্ত মানুষেরা সক্ষম হ'য়েছে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রহস্য উন্মোচনে। বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি তাকে তার স্রষ্টার সমকক্ষ করে তুলেছে। এই শক্তি প্রকৃতির এই নিয়ন্ত্রণে আবার উদ্ভূত হ'য়েছে মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়।

এই কারণে চিরায়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে মানুষের নিজেরই সৃষ্ট বিপর্যয়। তা কখনো প্রতিফলিত হ'য়েছে প্রকৃতির প্রতিশোধে আবার কখনো মানুষের অতি স্বার্থপরতার শক্তি দম্ভের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এই আলোচনায় স্মর্তব্য যে প্রকৃতি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। কিন্তু অ-সীমিত লোভকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম। বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে এই বিপত্তির বিশ্লেষণ ও প্রতিবিধান করতে হ'বে।

বিপর্যয় দুর্ঘটনার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে এখন আর বিশেষ বিতর্ক নাই। বিস্তৃত এবং ব্যাপক জীবন হানি ও সম্পদ বিনষ্টিই বিপর্যয়। এই বিনষ্টি আকস্মিক এবং দীর্ঘ সূচনা সাপেক্ষ, দুইই হ'তে পারে। তরে আকস্মিক ঘটনাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মর্মন্তুদ।

তাই এইরূপ বিপর্যয়ই সকলের দৃষ্টিতে সংগত কারণেই প্রাধান্য পায়। মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয় অসাবধানতা এবং নিষ্ক্রিয়তা প্রসুত। আবার গোষ্ঠী, জাতি, দেশ ও ধর্ম বৈরিতাও যুদ্ধ দাঙ্গা অন্তর্ঘাত ইত্যাদির জন্য দায়ী। আশু প্রয়োজনে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্টিও দুর্যোগ দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

বিপর্যয় প্রতিরোধ, প্রতিরোধের প্রস্তুতি, তার তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা, সবটাই অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে প্রস্তুতি প্রয়োজন।

এই কাজ সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করতে ব্যক্তি, সমাজ এবং যারা রাজ্য পরিচালনা করছেন সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল, রাজ্য প্রশাসন এবং সর্বস্তরের পেশাগত এবং গোষ্ঠী সংগঠনের সহযোগিতার অত্যন্ত প্রয়োজন। সবার আগে প্রয়োজন বিপর্যয় সম্বন্ধে সমস্ত স্তরের মানুষকে সচেতন করা। এই সচেতন করার পদ্ধতি স্তর বিশেষে-নির্দিষ্ট করতে হ'বে, মাধ্যম ও সতর্ক ভাবে নির্বাচন করতে হ'বে। মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়ের গতি প্রকৃতি বোঝা যেতে পারে কিন্তু কখন কী ভাবে ঘটবে তা বলা সম্ভব নয়। সন্ত্রাস, যুদ্ধ, বিগ্রহ, দাঙ্গা ইত্যাদি সমাজ সচেতনতা এবং মানবিকতার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এটা কঠিন হ'লেও সকলেরই করা উচিত। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারও তজ্জনিত বিপদ মানুষের সচেতনতায় আটকানো সম্ভব। যান্ত্রিক বিচ্যুতি সৃষ্ট বিপদ যথা রেল, বিমান এবং প্রয়োজনীয় অথবা অপব্যবহারে ক্ষতি কারক রাসায়নিক বা জৈব পদার্থের সুষ্ঠু রক্ষণ ও ব্যবহার সবই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মোকাবিলা একটু স্বতন্ত্র ভাবে করা দরকার। কোন কোন এলাকায় কী ধরনের বিপর্যয় হ'য় তার একটা নির্ঘন্ট তৈরী করা, বস্তুত এই তালিকা সরকার এবং বহু সমাজ সেবী সংস্থাদের কাছে আছে। প্রতি বৎসর এই তালিকাতে কিছু তথ্য যোগ হ'তে পারে কিন্তু এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায়, বারে বারে তাদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

এখানে একটি বিষয় কর্মীদের মনে রাখা দরকার। যে যে অঞ্চলে এ বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় সেই অঞ্চলের মানুষেরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বিপদ মোকাবিলার যোগ্য পদ্ধতিতে (appropriate technology) অভ্যস্ত। তাদের সংগতি বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সচেতনতা এবং প্রতিকার পদ্ধতির পরিকল্পনা করতে হ'বে।

এ বিষয়ে প্রধান সমস্যা হ'চ্ছে, বিপর্যয় কোথায়, কখন হ'বে তার সঠিক অনুমান, বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির অসাধারণ অগ্রগতি সত্বেও সম্ভব হ'চ্ছে না। এই বিপদ মোকাবিলায় একটা বড় পরিকাঠামো সৃষ্টি করে দীর্ঘদিন তাকে অব্যবহৃত রাখলে সমস্যা বেড়েই যাবে। সুতরাং ইতি কর্তব্য নির্ণয়ে সবাইকে সতর্ক হ'তে হ'বে।

প্রাচীণ ব্যক্তিরা (বিশেষ, চিন দেশে) মনুষ্যেতর প্রাণীর গতিবিধি দেখে এঁরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা অনুমান করতে পারতেন। আমাদের দেশেও এই রকম অনুমান সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ছিল। তাতে বিপর্যয় রোধ করা যেত না। কিন্তু জীবন হানি অন্ততঃ কমানো যেত। তাই এ বিষয়ে প্রাথমিক কাজ হ'চ্ছে সবাইকে সচেতন করা।

পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা এই পুস্তকে পৃথক ভাবে করা হ'বে। দ্বিতীয় কাজ হ'চ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে বিপদ সঙ্কেত পূর্বাহ্নেই জানবার বারংবার চেষ্টা করা এবং সেই বার্তা সম্ভাব্যস্থান গুলিতে পৌঁছে দেওয়া। ঘূর্ণীঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প এগুলিই প্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এদের পূর্বাভাষ প্রায় সবক্ষেত্রেই পাওয়া সম্ভব। তড়িঘড়ি এর মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত পরিধি পর্য্যন্ত যাতে স্থানীয় সম্পদ ও লোকশক্তিকে কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী করা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিমার্জন মারফৎ কর্মসূচি রূপায়িত করা।

তৃতীয় কাজ হ'চ্ছে বিপদ এসে লেগে বিপদ গ্রস্তদের উদ্ধার এবং তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা। এই সঙ্গে তাদের খাদ্য-পানীয় ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করা।

আপৎকালীন অবস্থা উদ্ধারের পর ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ ও প্রাণীকে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তর ও তাদের সেখানে থাকা এবং জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা।

সর্বশেষ কাজ হ'বে দীর্ঘ মেয়াদি, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ভবিষ্যতে এই রূপ বিপর্য্যয়ে কিংকর্তব্যের শিক্ষা। ভারতবর্ষে প্রতি বছরই এক বা একাধিক বিপর্যয় হ'য়েই চলেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এর প্রতিবিধানের উপায় খুঁজি। নিবেদন হ'চ্ছে ঘটনার পিছনে না ছুটে ঘটনার পূর্বাহ্ন প্রস্তুতিই সমীচিন।

শ্রী তারক ব্যানার্জ্জী দীর্ঘদিন ধরে একনিষ্ঠ ভাবে এই কাজ করে চলেছেন। তাঁর সংগঠন W.B.V.H.A কয়েকটি পুস্তিকাও এই বিষয়ে প্রকাশ করেছে। বর্তমান পুস্তকটি সেই সব প্রচেষ্টায় উন্নততর সংস্করণ। এই পুস্তকে বিপর্যয় বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা এবং তারজন্য করণীয় সমস্ত কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরা হ'য়েছে। এই প্রচেষ্টা প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। এই উদ্যোগ সকলের সাহায্যে সর্বজনীন হিতে ব্যবহৃত হ'বে এই বিশ্বাসেই এই প্রাক কথন নিবেদিত হ'লো।

১৫ই আগষ্ট, ২০০২ — ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

লেখকের কথা

ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে নূতন নূতন অঞ্চল ও মানুষ নূতন নূতন ধরণের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ছে। জন বিস্ফোরণ, পরিকাঠামো ও পরিকল্পনার অভাব অনুন্নত জীবন ধারনের মান, মানুষের বিপর্যয়ের ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় যেমন দাবানল, পথ দূর্ঘটনা, শিল্প দূর্ঘটনা অধিকতর মাত্রার জীবন ও সম্পদের হানি করে চলেছে। তাই সর্বস্তরের মানুষের বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করা দরকার। আমাদের এই বই "প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও তার মোকাবিলা" সাধারণ মানুষ, NGOs, CBOs, Panchyat and Govt Official দের বিপর্যয় প্রস্তুতির কাজকে সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা। আগামী দিনে এই বই দূর্যোগ মোকাবিলায় বিরাট সহায়ক হিসাবে পরিগণিত হবে বলে আমার আশা।

WBVHA রাজ্যস্তরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। স্বাস্থ্য ভাবনা ছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা ও প্রস্তুতির কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সেই অভিজ্ঞতার অনেক অংশ বইটিতে লেখা রইল সাধারণ মানুষের জন্য। আমার আশা যে এই বই সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে, যা আগামী দিনে বিপর্যয় মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে সংগঠিত ও অসংগঠিত মানুষকে পথ নির্দেশ করবে।

এই বই প্রস্তুতের জন্য আমি বহু মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে যে সব মানুষ, যারা দূর্যোগের সময় তাহাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ যারা তাদের অমূল্য তথ্য দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে যারা বিভিন্ন সময় আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন যেমন শ্রী অনিল সিন্হা—ডিরেক্টর, নেচারেল ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, ভারত সরকার, প্রফেসর বিনোদ কুমার শর্মা, এন. সি. ডি. এম., ভারত সরকার, শ্রী জন কোশী, ডিরেক্টর এ্যাডমিনিসট্রেটিভ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, কলকাতা, শ্রী নিখিলেশ দাস, সেক্রেটারী, রিলিফ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রীজুড হেনরিক্স, UNICEF কলকাতা ও আরও অগণিত মানুষ ও প্রতিষ্ঠান যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছেন। মিষ্টার ডি পি পোদ্দার, প্রশাসনিক অধিকর্তা, WBVHA-র কাছে আমাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য বইটির মান বৃদ্ধির কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। WBVHA সমস্ত সহকর্মী, প্রেসের মানুষ জন ও শ্রী অতীন সরকারের কাছে ঋণী বইটির প্রকাশনার কাজে সাহায্য করার জন্য। এই বই-য়ে বহু লেখকের মতামত দেওয়া আছে তা তাঁহাদের নিজস্ব মতামত, যার দায় লেখকের বা প্রকাশকের নহে। এই বইটির সাফল্য যা কিছু তা আমাদের সবারই আর যা দুর্বলতা আমার নিজের। বইটির মান উন্নয়নের যে কোনো সাহায্য আদরের সাথে গৃহীত হইবে। আশা করি এই প্রচেষ্টা জনগণের উপকারে আসবে।

তারক ব্যানার্জি
ডিরেক্টর
ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স সেল
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন

১৫ই আগষ্ট, ২০০২

সূচনা
(Introduction)

প্রকৃতির গর্ভেই জীবনের সৃষ্টি। প্রকৃতির কোলেই তার বাড়বাড়ন্ত। সদয় প্রকৃতি তারই বুকে আশ্রয় দিয়ে জড় ও জীবনকে আগলে রেখেছে। এই আগলে রাখা সন্তান সন্ততিদের সবার সেরা হল মানুষ। বুদ্ধিতে ও কর্মকুশলতায় সে প্রকৃতির কোলে আশ্রিত, লালিত সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। সদয় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে প্রাণী, ফসল ও খনিজ দ্রব্যের কল্যানে সবাই বেঁচে বর্তে থাকে। আবার সেই কল্যাণময়ী প্রকৃতিরই রুদ্ররোষে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। গাছপালা, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণী, এমন কী বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষকেও ঐ ধ্বংস লীলার শিকার হতে হয়। সেই ধ্বংস লীলায়, বুদ্ধিতে সবার সেরা হলেও ক্ষয়ক্ষতিটা হয় মানুষেরই বেশি। তার ক্ষতি হয় জীবনের, সম্পদের।

সভ্যতার আদিপর্বে মানুষের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতির কোলেই থাকত, জীবন ধারণের উপযোগী সম্পদ ও প্রকৃতির ধ্বংস লীলাকে সঙ্গী করে। এইভাবেই মরে, বেঁচে, বড় হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আজকের সভ্য দুনিয়া। তাই, মানুষ খুঁজে পেয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররূপ তথা প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সঙ্গী করেই বেঁচে থাকার মন্ত্র। এই মন্ত্রগুপ্তির আগে মানুষ প্রকৃতির রুদ্র অবস্থাকে মনে করত দেবতার রোষ, তাই সেই আদি কালে, সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ সৃষ্টি করে ছিল দেবদেবীদের। সব আদি সভ্যতাতেই এই ধ্যান ধারনা ছিল। আজকের যুগেও তারা অদৃশ্য নয়। তখনই সৃষ্টি হয় বৃষ্টির দেবতা, ঝড়ের দেবতা, আগুনের দেবতা এবং সর্বোপরি আলো ও তাপের দেবতা সূর্য। প্রকৃতির রুদ্ররূপ দেখলেতো বটেই, আগেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ঐ সব দেবতার আরাধনা করত, পূজা দিত। আজও সে প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় নি। তবে, কয়েক হাজার বছরের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এমন সব তথ্য আবিষ্কার করেছে যে, পূজা নয়, নয় কাউকে তুষ্ট করার জন্য উপঢৌকন দেওয়া। আসলে চাই প্রকৃতিকে জানা, চেনা ও মানিয়ে চলার পথ ধরে চলা। চলতে চলতে পাওয়া গেছে নিত্য নূতন পথ ও পদ্ধতি, এসবই আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধে না গিয়ে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সক্ষম করে তুলেছে।

প্রতিদিন সূর্য ওঠে, পৃথিবী হয়ে ওঠে আলোয় আলোময়। সূর্য সন্ধ্যায় অস্ত যায়। প্রাণীকূল বিশ্রাম করে, পরের দিনের জন্য নতুন কর্মোদ্দম ফিরে পায়। জল উপর থেকে নিচের দিকে বয়ে যায়, নিচু জায়গায় জমে বা বিশাল জল রাশির আধার সমুদ্রে মিশে যায়। ঋতু চক্রের নিয়মে শীত আসে, যায়। আর গরমে হাস ফাঁস করে সবাই। বর্ষার জল সবাইকে সজীব করে তোলে। আবার শরৎ ও বসন্তে পৃথিবী ভরে যায় প্রকৃতির নবরূপে। প্রকৃতি একদিকে তার কোমল সৃষ্টিতে পৃথিবীকে করে শস্য শ্যামল, অন্যদিকে সে-ই আবার ভয়ালরূপ ধারণ করে সব কিছুকে লয় করে দেয়।

মানুষ যতই বুদ্ধিমান প্রাণী হোক না কেন সে প্রকৃতির নিয়মকে বদল করতে পারে না, পারে সেই প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে থেকেই তাকে নিজের কাজে লাগাতে, কাজে লাগিয়ে, মানিয়ে নিয়ে বা লড়াই করেই গড়ে উঠেছে আজকের সভ্যতা।

এক সময় মানুষের সব সভ্যতাই ছিল নদী কেন্দ্রিক। কারণ, তখন মানুষ নির্ভর করত শুধুই নদীসেবিত অঞ্চলের ফসলের উপর। তাই ঝড়, বন্যা নিত্যসঙ্গী হলেও সভ্যতার বিকাশ ঘটে ছিল মিশরের নীল নদ, গ্রিসের তাইগ্রিস আর ভারতের সিন্ধু-গঙ্গার মত নদীগুলির উপকূলে। আজ অবশ্য তার বিস্তার ঘটেছে। তবে, তা প্রকৃতির রোষ থেকে নিস্তার পায় না, তাই বহু সংখ্যক প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এই সেদিন ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেল গুজরাটের কয়েকটি শহর ও জনপদ। তাই প্রকৃতিকে জানা, তাকে নিয়েই বাস করার কৌশল আয়ত্ব করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র। আসল কথা হল, প্রকৃতিকে চলতে দাও তার নিয়মে, আর নিজেরা বাঁচো তার নিয়ম মেনে, তাকে কাজে লাগিয়ে, নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে সতর্ক থেকে। এই সঙ্গে মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়, যেমন পরমাণু চুল্লি, পরমাণু বোমা, ভুল বাঁধ বা বাঁধ থেকে জল ছাড়া, নদীপথ আটকে মাছ চাষের ফলে নানা ভাবে বিপর্যয় ডেকে আনা। এসব ক্ষেত্রেও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার সদর্থক পরিবর্ত্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মনুষ্য সৃষ্ট কারণে বিপর্যয়ের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বা বিপদজ্জনক অবস্থায় শিশু ও মহিলা শ্রমিকের ব্যবহার। কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত দূষণ জনস্বাস্থ্যে বিপুল ক্ষতি করে চলেছে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতি

(Disastar Mitigation and National Policy)

ভারতে ১৯০০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে ৬০০ এর বেশি বিপর্যয় ঘটেছিল। ঐ সব বিপর্যয় মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি কাজ করেছে। সে সংস্থাগুলি হল, জল সম্পদ মন্ত্রক, ইনস্টিট্যুট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস প্রভৃতি। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় মূল সংগঠন হল— কৃষি ও সমবায় মন্ত্রক। এরা বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে মিলে এক সংগ্রামের উদ্যোগ নিয়েছিল। পরে CAPART (Council for Advancement of Peoples' Action in Rural Technology) সেই দায়িত্ব নেয় এবং ১৯৯৫ সালে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে। কাপার্টের (CAPART) ঐ সংগ্রাম ছিল বেসরকারি সংগঠনগুলি ও সাধারণ মানুষকে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় সমবেত করার ক্ষেত্রে এক সফল উদ্যোগ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হয়। লাতুর ভূমিকম্পের পরে বিশ্ব ব্যাঙ্ক পুনর্গঠনের জন্যই ব্যয় ধার্য করে ১০৫০ কোটি টাকা। এই সব সমস্যা ব্যবস্থাপনায় ভারত সরকার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইনষ্টিটিউশন স্থাপনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ছিল। কিন্তু, ২০০১ সালে গুজরাটের কচ্ছের ভূমিকম্পের সময় দেখা গেল প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি মন্ত্রিসভার সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিষয়টির দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রক যেমন — কৃষি এবং গ্রামীণ এলাকা ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, বিমান, রেল, পরমাণু গবেষণা, স্বরাষ্ট্র, মানব সম্পদ বিকাশ, জল সম্পদ, প্রতিরক্ষা, অর্থ, পরিকল্পনা কমিশন ও যোগাযোগ দপ্তরগুলিকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। জরুরী প্রয়োজনে সঙ্কটকালীন ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সব কাজ চালনার জন্য কয়েকটি বিশেষ তহবিল রয়েছে। যেমন ঃ প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল, ক্যালামিটি রিলিফ ফান্ড এবং রাজ্যস্তরে ও স্থানীয় ভাবে কিছুসংখ্যক তহবিল। এগুলির কাজে সমন্বয় সাধন করা হয়ে থাকে এবং এরা একে অপরের পরিপূরক। **বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয়নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ**

১। যে কোন বিপর্যয়ের সময় দ্রুত কাজ শুরু করা।

২। প্রতিবিধান মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। সংহত উদ্যোগ ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে মানুষের দুর্গতি কমানো।

৪। বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণে সামাজিক সামর্থ গড়ে তোলা।

৫। সমাজের দুর্বলতর অংশ ও ব্যক্তিবিশেষের অথবা কোম্পানির লোকদের সাহায্য এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দায় কমানোর জন্য বীমা চালু করা।

৬। বিপদ কমানোর জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৭। সারা বছর বিভিন্ন স্তরে, যে কোন ধরণের বিপর্যয় মোকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি থাকতে হবে।

জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নীতির অত্যাবশ্যক বৈশিষ্টগুলির মধ্যে আছে — জাতীয় দক্ষতা গড়ে তোলা, সহায়তা পরিষেবা হিসাবে জনগণের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানো, কাজকর্মের সমন্বয় সাধনে জাতীয় স্তরে একটি সর্বোচ্চ কমিটি গঠন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এসব করা হবে।

বিপর্যয়ে সাড়া দিয়ে দ্রততার সঙ্গে কাজ করা ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনার জন্য সরঞ্জাম, খাদ্য, ত্রাণ সামগ্রী, জরুরী ওষুধপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় আগে থেকে মজুদ করে রাখতে হবে। বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজে সংহতি আনার জন্য একটি আলাদা মন্ত্রক গঠন করা হবে এবং সেটি থাকবে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব তত্বাবধানে।

বিপর্যয় ও তার বৈশিষ্ট্য
(Disaster and its characteristic)

আমরা সবাই হামেশা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলে থাকি। কিন্তু, বিপর্যয় বলতে কী বোঝায় সব সময় তা বুঝে উঠতে পারি না। দীর্ঘকাল ধরে বাস করতে করতে আমরা একটা অবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকি। হঠাৎ কোন একটা পরিস্থিতি সেই স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ওলট পালট করে দিলে এবং প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, চিরায়ত ও আর্থিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিলে তাকেই বলা হয় বিপর্যয়। প্রকৃতির অসাধারণ কোন অবস্থা বা ধ্বংসলীলা অথবা মানুষের সৃষ্ট কোন বিপজ্জনক অবস্থা মানুষেরই জীবনকে করে দেয় দুর্বিসহ। তখন বাইরের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় না। একে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোকেই বলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। এখানে এখন বিপর্যয়ের অর্থ ও ধরণের বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

ফরাসী শব্দ "ডিজাষ্টার" তৈরি হয়েছিল সেই অতীতে। তখন 'ডেস' (Des) যার অর্থ হল মন্দ বা অশুভ এবং 'আস্টর' (Aster) মানে 'তারা' মিলে হয়েছিল 'ডিজাস্টার'। তখন মনে করা হত "অশুভ কোন তারার" প্রভাবেই বিপর্যয়। এখন অবশ্য ধারণাটা বদলে গেছে, তবে, শব্দটা রয়ে গেছে। **তাই, প্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরি যে কোন তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদী ঘটনা যা মানুষের দুর্গতির কারণ হয় এবং অপরের বা বাইরের সাহায্য ছাড়া যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না, তাকেই বলা হয় ডিজাস্টার বা বিপর্যয়।**

অন্যভাবে বললে, জীবন বা সম্পদ অথবা উভয়ের ক্ষয়ক্ষতিকেই বলা হয় বিপর্যয়। তবে তার কতগুলি বৈশিষ্ট রয়েছে। সেগুলি হল,

১। স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটা, তা হতে পারে গুরুতর ধরণের। আবার হঠাৎ, অপ্রত্যশিত ও ব্যাপকও হতে পারে।

২। মানুষের ক্ষেত্রে সেই ক্ষতি হতে পারে, জীবনের, জীবন যাত্রার ও সম্পদের। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তা আনতে পারে আঘাত বা জীবন ধারণে কঠোর অবস্থা।

৩। সামাজিক কাঠামো তথা ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি ঐ হঠাৎ নেমে আসা বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

৪। এই অবস্থায় সমাজের প্রয়োজন হয়ে পড়ে আশ্রয় ও সেনিটেশন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও সামাজিক পরিচর্যা। এই সময় বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

তাই, বিপর্যয়ের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হতে পারে "এমন কোন ঘটনা বা অবস্থা যা সময় ও স্থানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত। যার ফলে সমাজ বা তুলনামূলক ভাবে সংহত অঞ্চল অচল হয়ে যায়। অথচ এতকাল সেই অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ সচল ও সক্ষম।"

বিপজ্জনক অবস্থা ও বিপর্যয় (Hazard and Disaster) ঃ

"বিপজ্জনক অবস্থা ও বিপর্যয় প্রায় কাছাকাছি অবস্থান। ইংরাজিতে এদের বলা হয় যথাক্রমে হ্যাজার্ড (Hazard) ও ডিজাস্টার (Disaster)। বিপজ্জনক অবস্থাটা

সৃষ্টি হয় প্রকৃতিগতভাবে। আর বিপর্যয় হল তার পরিণতি। বিপজ্জনক অবস্থায় জীবন ও সম্পদহানির সম্ভাবনা থাকে। আর বিপর্যয়ে ঐ অবস্থার পরিণতি উপলব্ধ হয়।" — (John Whittow, Disaster, 1980)।

বিপজ্জনক অবস্থা কোন বিশেষ অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করলে তাকেই বলা হবে বিপর্যয়। কোন বিপজ্জনক অবস্থা (ধরা যাক ঘূর্ণীঝড় বা জলোচ্ছ্বাস) তা সে যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, কোন জনহীন উপকূলে আছড়ে পড়লে, তাকে বিপর্যয় বলা হবে না, তবে, যখনই তা কোন জনবসতিতে আঘাত করবে, জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করবে তখনই তাকে বিপর্যয় বলা যাবে। তাই বিপজ্জনক অবস্থা হল বিপর্যয়ের পূর্বাবস্থা, যাতে জীবন ও সম্পদহানির সম্ভাবনা থাকে। বস্তুত বিপর্যয়ে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েই থাকে। এই বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের দ্বারা, যেমন যানবাহন দুর্ঘটনা, শিল্প দুর্ঘটনা, অথবা ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। আর এই বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয় মানুষের সৃষ্টি, সম্পদ ও ঘরবাড়ি।

প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি বিপর্যয় ঃ

উৎস ও কার্যকারিতার বিচারে বিপর্যয় হতে পারে বিভিন্ন ধরণের। তবে, প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি, যে বিপর্যয়ই হোক না কেন, এতে জীবন ও সম্পদহানি ঘটবেই। প্রধানত ঐ বিপর্যয় গুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে— ১) প্রাকৃতিক ও ২) মনুষ্য সৃষ্ট।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Natural Disaster) ঃ

১। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ঃ ঝড়, সাইক্লোন, টর্ণেডো, হ্যারিকেন, জোয়ারের জল ও জলোচ্ছ্বাস।
২। জল সম্পর্কিত ঃ বন্যা, বজ্রপাত, জোয়ার, ভারি বৃষ্টি, জলস্তম্ভ ও খরা।
৩। ভূ সম্পর্কিত ঃ ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, আগ্নেয় গিরির উদগীরণ, ধস, হিমবাহ প্রভৃতি।
৪। দাবানল বা আগুন।

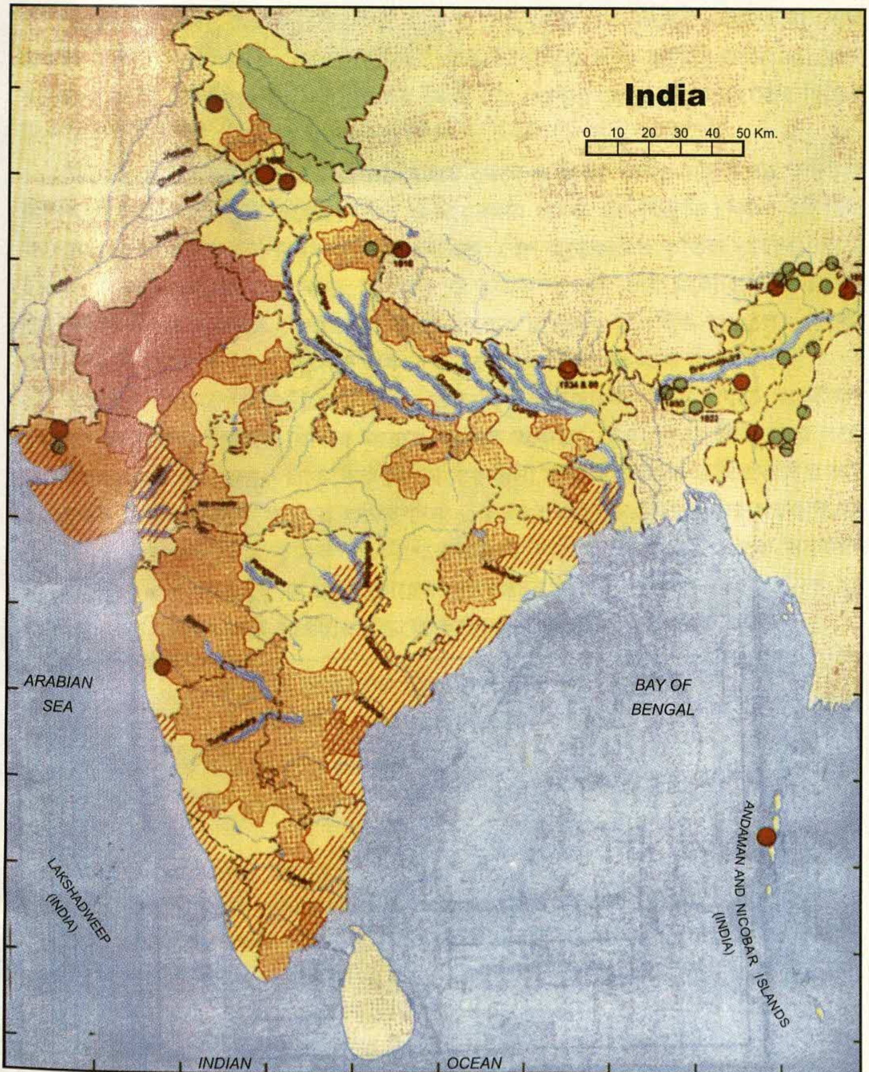
মানুষের তৈরি (Man Made Disaster) ঃ

১। যুদ্ধ, শত্রুতামূলক আচরণ।
২। হামলা, অন্তর্ঘাত, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দাঙ্গা।
৩। যানবাহন দুর্ঘটনা (মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, বিমান, জাহাজ)।
৪। শিল্পের দুর্ঘটনা (বয়লার বিস্ফোরণ, গ্যাস চেম্বার বিস্ফোরণ ও গ্যাস লিক)।
৫। আগুন ও দাবানল।
৬। পরমাণু বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনা, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ।
৭। বন নিধন, ভূমিক্ষয়, জল ও বায়ু দূষণ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরন (Type of Natural Disasters) ঃ

প্রাকৃতিক ও সমাজ বিজ্ঞানে নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব বা পরিবেশের উপর মানুষের প্রভূত্ব বদলে গেছে। তাই

Areas Vulnerable to Flood & Other Natural Disaster in India



- Drought prone area
- Hot desert
- Cold desert
- Flood prone area
- Areas affected by cyclonic storms

EARTHQUAKES (Magnitude)

- Above 8.0
- 7.5 - 8.0
- 7.0 - 7.5

Years on which important earthquakes occurred are mentioned against selected epicenters.

বিপর্যয়কে দেখতে হবে প্রাকৃতিক বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সংস্থার সাহায্য নিয়ে মানিয়ে চলার ধরনের নিরীখে।

মানুষের জ্ঞান ভান্ডার প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতেই বিপর্যয়কে দেখতে হবে ভৌগলিক, নৃবিদ্যা, সমাজ বিদ্যা, উন্নয়ন, ওষুধ ও মহামারী তত্ত্ব এবং প্রযুক্তি বিদ্যার দৃষ্টি নিয়ে। মূলত তিনভাবে দ্রুত, দ্রুত/ধীর এবং ধীরগতি সম্পন্ন দুর্যোগ ঘটে থাকে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় এক বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া। পৃথিবীর সব দেশেই কোনও না কোন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগে রয়েছে। আর ভারতেও প্রতি বছরই কোন না কোন রাজ্যে এক বা একাধিক ধরনের বিপর্যয় দেখা যায়। এবার দেখা যাক ভারতের বিভিন্ন বিপর্যয়ের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা।

ভারত এক বিশাল দেশ উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও মায়নমার পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। ফলে এই উপ মহাদেশের অর্ধেকের বেশি অঞ্চল সমুদ্র বেষ্টিত। বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানে হামেশাই ঘটে থাকে। খরা, বন্যা, ঘূর্ণীঝড় ও ভূমিকম্প হল তার মধ্যে প্রধান। এছাড়া ধস, ভূমিক্ষয় ও দাবানল দেখা যায় উত্তর দিকের হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে। দেশের মোট ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২৫টিই প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ।

দেশের বৈচিত্রপূর্ণ ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থানের জন্য প্রকৃত অর্থে সব ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিভিন্ন মাত্রায়, বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। প্রতি বছর গড়ে এদেশে ৪৮৮৮ জন লোক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য মারা যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৬ কোটি লোক। (রাষ্ট্র সংঘের প্রতিবেদন, ১৯৯৪) এখানে একথা বলা দরকার যে ২০০১ সালে গুজরাটে ভূমিকম্প নিশ্চিতভাবেই ব্যতিক্রমী ঘটনা। যাতে সরকারি মতে প্রায় ১৮ হাজার লোক মারা গেছেন। সম্পদের ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ২১ হাজার কোটি টাকা আর রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৯।

ভারতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলতে কী বোঝায়
(What is Natural Disaster In India)

ভারতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে—

- প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার ছয় শতাংশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে থাকে প্রত্যক্ষভাবে।
- দেশের বড় অংশই প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ।
- ৫৭ শতাংশ অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ।
- ১১.২ শতাংশ অঞ্চল বন্যাপ্রবণ (১৯৭৮ সালে ৩৬ শতাংশ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল)
- ২৮ শতাংশ অঞ্চল খরাপ্রবণ।
- জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং পরিবেশের অবনমন।
- দারিদ্র ও অশিক্ষার জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়।
- দেশের চাষযোগ্য জমির ৬৮% খরাপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত।

(Source NCDM - New Delhi)

বিপর্যয় ঃ ঝুঁকি ও বিপন্নতা

(Disaster : Hazard and Risk)

বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে 'ঝুঁকি' বলতে প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝানো হয়। প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাকে কমিয়ে নিয়ে আসা বিপর্যয় মোকাবিলায় অন্যতম অঙ্গ।

কোন বিশেষ ঘটনা বিপর্যয়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই 'ঝুঁকি'র উদ্ভব হয়। ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে গেলে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা এবং তার ফলে আক্রান্ত মানুষের বিপন্নতার পরিমাপ করা দরকার। একটি ঘটনা থেকে অনেক সময় আবার নূতন কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে—সেই সম্ভাবনার কথাও মাথায় রাখতে হবে।

এইসব কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই-এর পরে সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে হবে। গোটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকির মাত্রা হয় কমবে না হলে একেবারে নির্মূল হবে এই প্রত্যয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি করা জরুরী। মানুষের যাচাই-এর জন্য ভৌগলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রোজগারের অনিশ্চয়তা, গোষ্ঠীর একতা, যোগাযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় যথাযোগ্য গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

ঝুঁকির পরিমাপ করবার সময় নীচের সমস্যাগুলি আসতে পারে।

- স্বল্পকালীন অথবা দীর্ঘস্থায়ী—কোন ভিত্তিতে ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে— এ ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত নেবেন ?
- ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতার পরিমাপ কী?
- ঝুঁকি কমানোর ফলে লাভের পরিমাণ — অর্থাৎ আর্থিক বিশ্লেষণ কে করবেন?
- বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকির সমষ্টিগত পরিমাণ বিবেচিত হবে অথবা আলাদাভাবে প্রতিটি ঝুঁকি নিবারণ করা প্রয়োজন?

উল্লিখিত বিষয়গুলি এবং ঝুঁকির মোকাবিলার জন্য একাদিক্রমে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিপর্যয়প্রবণ এলাকার উন্নয়ণ পরিকল্পনা সব সময় সেখানকার ঝুঁকি কমানোর একটি পদক্ষেপ হিসাবে দেখা দরকার। কারণ বিপর্যয় এবং উন্নয়ণের মধ্যে একটি সদর্থক যোগাযোগ হল ঝুঁকি নিবারণ। অর্থের যোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঝুঁকি কমানোর কোন প্রচেষ্টা বেশি সংখ্যায় বিপন্ন মানুষের উপকারে আসবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে—এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বারবার আলোচনা করে, ঘষে-মেজে গ্রহণযোগ্য করতে হবে। কোনও দুর্যোগপূর্ণ এলাকার ঝুঁকির পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে গেলে সেই এলাকা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ হবে প্রথম পদক্ষেপ। সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান ও নির্ভরতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। দুর্যোগ ঘটনার সম্ভাবনা সংগৃহীত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথাযথ সংমিশ্রণের মাধ্যমে ইঙ্গিতপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন এলাকা কী কী ধরণের দুর্যোগের

ঝুঁকির মধ্যে আছে প্রাথমিকভাবে তা নির্ণয় করা সম্ভব। পরবর্ত্তী কাজ হবে দুর্যোগ অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষেত্র ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা। ধরা যাক, কোন একটি বিশেষ এলাকা বন্যাপ্রবণ। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ এবং আপাত নির্দেশক ও পুনরাবর্তন-কাল হিসাব করে একটি আগাম সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ঝুঁকি মোকাবিলার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে—

১। বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে কোন কোন জীবিকা ঝুঁকিগ্রস্ত হচ্ছে, ইত্যাদি।

২। এলাকার ভৌগলিক অবস্থানের জন্য এবং আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে জনগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বিপন্ন মানুষদের ক্রম করে রাখা।

৩। সেই এলাকার মধ্যে অবস্থিত পরিষেবাগুলির কোনগুলি ঝুঁকির মধ্যে আছে তার চিহ্নিতকরণ।

পাশাপাশি প্রশ্ন হওয়া দরকার উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি এবং জনগোষ্ঠীর অংশ কেন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ঝুঁকির আওতায় 'কী' এবং 'কেন' এই প্রশ্নদুটির জবাবের মধ্যেই আছে বিপন্নতার পরিমাপ। এইবার ঝুঁকির মোকাবিলা করতে গেলে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং সেই এলাকার সম্পদ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সম্পদ বলতে এই ক্ষেত্রে বোঝানো হয় 'এলাকায় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান এমন কিছু যা আসন্ন বিপর্যয়কে প্রতিহত, মোকাবিলা বা তার মাত্রা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে'। কোন বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। আবার এলাকার মধ্যে একটি পাকা দ্বিতল / ত্রিতল বাড়ি বা স্কুলবাড়ি বা পানীয় জলের উৎস সবই সম্পদ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে যদি সেই এলাকার সন্তান সম্ভবা মহিলা, শিশুদের প্রয়োজনীয় টিকাকরণ হয়ে থাকে। তা হবে জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের পরিচায়ক।

চিহ্নিত পরিকাঠামোগত, পরিষেবাগত, ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের ঝুঁকি কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমানো যায়—সেটি হবে পরবর্তী মূল পদক্ষেপ। ধরা যাক—একটি বিশেষ শ্রেণীর বিপর্যয়কালীন রোজগারের অনিশ্চয়তা, একটি চিহ্নিত ঝুঁকির ক্ষেত্র। এই ঝুঁকির মোকাবিলা বা কমানোর দিকে এগোতে গেলে সেই শ্রেণীর জীবিকা নির্বাহের অন্য পদ্ধতির সন্ধান দেওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করা দরকার। যদি পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই বিপন্ন গোষ্ঠী অন্য একটি জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সামিল হয় তাহলে আমরা সেই জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কমানোর দিকে অগ্রসর হয়েছি বলা যেতে পারে। পরোক্ষে এই প্রক্রিয়াটিকে অনেকে জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের বিকাশ (Capacity building) হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। এই সামর্থ্য বিকাশ ব্যাপারটি নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। ধরা যাক, কোন একটি বিশেষ দুর্যোগ, যার জন্য প্রায়শঃই ফসল নষ্ট হয় এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়—যদি সেই এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞাতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে রাজি করানো যায় অন্য কোন ফসল ফলানোর যা কিনা দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নষ্ট হয় না বা ক্ষতির পরিমাণ কম, সেক্ষেত্রে আমরা জনগোষ্ঠীর বা ঐ এলাকার ঝুঁকি কমিয়ে আনতে সাহায্য করলাম। পরোক্ষে এটাই সামর্থ্য বিকাশ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

ঝুঁকির পরিমাপ দিতে গেলে বিপন্নতা বিশ্লেষণ হবে তারা সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিপন্নতা আমরা বোঝাই কোনও জনগোষ্ঠীর অসহায়তার মাত্রা নিয়ে। অসহায়তার মাত্রা আবার ঝুঁকির পরিমাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বিপন্নতার মাত্রা আমরা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত অসহায়তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পেতে পারি। জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান, প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুর্যোগের ফলে যে অসহায়তার সৃষ্টি হয়, এই নিয়ামকগুলিও সাহায্য করবে তাদের বিপন্নতার মাত্রা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করতে।

এইভাবে জনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্থাৎ বিপর্যয় বা দুর্যোগ প্রতিহত বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে যেগুলি সাহায্য করবে সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকি কমানোর জন্য আবশ্যিক।

সুতরাং সরলভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করব সেই উপাদানগুলিকে খুঁজে বার করতে যা — i) জনগোষ্ঠীকে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা এবং বিপর্যয়জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিকে জটিল করে ঝুঁকি বাড়াবে এবং অন্য দিকে ii) প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলি যা ঝুঁকি কমানোর দিকে বা সামর্থ্য বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেগুলির চিহ্নিতকরণ। এই দুই-এর সামগ্রিক যোগফল আমাদের সার্বিকভাবে ঝুঁকি মোকাবিলা বা পরোক্ষে বিপর্যয় মোকাবিলার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। খেয়াল রাখা দরকার যে যখন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকির পরিমাপ তার সামর্থ্য বিকাশের পরিমাপের থেকে বেশী হয় তখন সেই জনগোষ্ঠী দুর্যোগপ্রবণ হিসাবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। বিপর্যয় নিবারণ বা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে ঝুঁকি কমিয়ে নিয়ে আসা বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে নিয়ে আসা। এই আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে সমস্ত উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের সময় জনগোষ্ঠীর বিপর্যয়ের প্রতি আপন্নতা/বিপন্নতা কমিয়ে নিয়ে আসার প্রেক্ষিতটি যাতে সংযোজিত হয়। ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের দুর্যোগের প্রতি আপন্নতা কমিয়ে নিয়ে আসে। এইভাবেই ঝুঁকি মোকাবিলার দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব এবং পরোক্ষে ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর সামর্থ্য বিকাশের মাধ্যমে দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের মোকাবিলার অসহায়তা কাটিয়ে উঠবার শক্তি যোগান দিতে পারব।

ঝুঁকি (Risk) ঃ

১। স্বাভাবিক জীবন যাপনের মধ্যেও অনেক সময় ঝুঁকি আমদের নিত্যসঙ্গী। যেমন রাস্তাঘাট চলা এবং পারাপার করা, যানবাহন চড়া, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ইত্যাদির মধ্যেও যথেষ্টভাবে অনিচ্ছাকৃত ঝুঁকি মানুষকে নিতে হয়। আবার দুর্গম পাহাড়ে চড়া, বিভিন্ন রকমের খেলাধূলার মধ্যে নিহিত ঝুঁকি মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবেই নেয়। আমরা মূলতঃ দুর্যোগ ঘটার প্রেক্ষিতে মানুষের অসহায়তার ফলে সৃষ্ট অনিচ্ছাকৃত ঝুঁকির কথা আলোচনা করব।

২। কোন আপদ জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত অংশের বেশী ক্ষতি সাধন করবে সেই অনুযায়ী ঝুঁকি পর পর সাজাতে হবে। আমরা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বিশেষ দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার ফলে সেই এলাকার মানুষকে সে সব ঝুঁকির মোকাবিলা করতে হয়। অতঃপর সেই জনগোষ্ঠী সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক ঝুঁকি এতদিন কিভাবে সামাল দিয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা পুনরায় যাচাই করবেন এবং তা আরও কিভাবে কমানো যায় স্থির করবেন। এই প্রক্রিয়ার জন্য গ্রহণীয়

ব্যবস্থাগুলি আর্থিকভাবে বাস্তবসম্মত কিনা এবং তার জন্য কোনও বিশেষ জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ দরকার কিনা তাও দেখা দরকার।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় মালদা জেলা প্রায় মাসাধিককাল জলমগ্ন ছিল। চারিপাশে পানীয় জলের অভাব প্রকট হওয়াতে পেটের রোগ ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এক পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর গ্রামের মানুষদের সাথে আলোচনা করে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সেই এলাকায় জলবাহিত রোগ প্রায় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। নদীর বাঁধ থেকে গ্রামটি এমন দূরে সে বন্যার জল পৌঁছতে কয়েকঘন্টা সময় লাগে। যখন তিনি বুঝলেন সে বন্যা আসন্ন এবং তাঁর গ্রামের পানীয় জলের উৎসগুলি নিরাপদ নয়, তিনি ব্যাঙ্ক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার টাকা বিকালে তুলে নেন। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করে বিকাল থেকে সারারাত কয়েকশো শ্রমিক লাগিয়ে তিনি একটি ছোট পুকুরের পাড় চারিপাশে মাটি ফেলে কয়েক ফুট উঁচু করে দেন। তখনও সমস্ত দোকান-পাট ভেসে যায়নি। PHE expert কয়েক বস্তা চুন এবং এক বস্তা ব্লিচিং পাউডার সেই পুকুরের জলে গুলে দেয়। পরের দিন বন্যার জল গ্রামে চলে আসে এবং সে সেখানে পরে উঁচু জায়গায় আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যায়। পরবর্তী একমাস প্রায় গ্রামটি জলমগ্ন থাকলেও উঁচু পাড়ের জন্য সেই পুকুরে বন্যার জল প্রবেশ করেনি। ঐ গ্রাম এবং আশেপাশের লাগোয়া আরও কয়েকটিগ্রামের লোক একান্ত নিরুপায় হয়ে সেই পুকুরটি থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে। যে কারণেই হোক ঐ জনগোষ্ঠীর কেউ পেটের রোগে মারা যাননি। যদিও সেই গ্রামটিতে বেশ কিছু গবাদি পশু মারা গিয়েছিল এবং শস্য হানি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিও যথেষ্ট পরিমানে হয়েছিল। একই সঙ্গে কয়েকদিন পরে সরকারীভাবে পানীয় জল পৌঁছে ছিল।

উপরের বলা ঘটনাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বন্যার সময় কোন রকমে প্রাণে বাঁচলেই হল না—অন্যান্য প্রাণঘাতী ঝুঁকিগুলির মোকাবিলার কথা মাথায় রাখা দরকার। আজকাল গ্রামের উঁচু জায়গা যা সচরাচর জলে ডোবে না সেরকম স্থানে টিউবওয়েল বসানোর দিকে অনেক পঞ্চায়েত উদ্যোগী হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বন্যার আগে একটি পাইপ লাগিয়ে টিউবওয়েল উঁচু করে নেওয়া হয়। সবগুলি ব্যবস্থা আপৎকালীন সময়ে ঝুঁকি কমানোয় সাহায্য করবে। পরিকাঠামোগত, পরিষেবাগত, ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের ঝুঁকি কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমানো যায়—সেগুলি হবে ঝুঁকি মোকাবিলার পদক্ষেপ। প্রায়শঃই যে সমস্ত এলাকা বন্যা কবলিত হয় সেখানে কাঠামো সমেত ঘর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এমন ঘর তৈরী করার জন্য উৎসাহ প্রদান, স্কুলবাড়িগুলি অস্থায়ী ত্রাণশিবির হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক গঠন, বিপর্যয়কালীন অনিশ্চিত রোজগেরে মানুষদের স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহদান; পরিবারের মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে কিছুটা স্বাবলম্বী করে তোলা বা চাষের ধরণ পরিবর্তনে রাজী করানো এ সমস্তই ঝুঁকি কমানো বা মোকাবিলার অঙ্গ। উপরোক্ত প্রায় সমস্ত প্রক্রিয়া বিভিন্ন সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচীর বা পরিষেবার অন্তর্গত এবং জনগোষ্ঠীর সামর্থ বিকাশে সাহায্য করে।

সৌজন্যে পিনাকী হালদার
এ. টি. আই., পঃ বঃ সরকার

ভারতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরন ও বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চল

(Disaster prone areas & Types of Disaster in India)

প্রকৃতি	বিপর্যয়ের ধরন	অঞ্চল/রাজ্য
দ্রুত	ঘূর্ণীঝড়	অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িষা, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট।
	ঝড়	কেরালা, ওড়িষা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ত্রিপুরা।
	বন্যা	অসম, বিহার, গুজরাট, ওড়িষা, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, রাজস্থান, মিজোরাম
	ভূমিকম্প	মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, বিহার ও উত্তর প্রদেশ।
	শিল্প	যে কোন স্থানে হতে পারে।
	আগুন	যে কোন শিল্প কেন্দ্রে।
	ধস	হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ, অসম, সিকিম, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও হিমালয় সন্নিহিত পঃ বঃ।
	যুদ্ধ	প্রতিবেশী দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি।
	গণ অসন্তোষ	উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, অসম, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য।
মন্থর	খরা	অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অসম, ওড়িষা, মধ্যপ্রদেশ, পঃ বঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্য।
	দুর্ভিক্ষ	অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ওড়িষা, অসম, মধ্যপ্রদেশ, অন্যান্য রাজ্য।
দ্রুত	ভূমিকম্প, ঘূর্ণীঝড়, বন্যা	গুজরাট থেকে ব্রহ্মদেশ সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারত, গুজরাট, কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, ওড়িষা, পশ্চিমবঙ্গ, অসম সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল।

বিপর্যয় প্রস্তুতিকরণ কাঠামো
(Disaster Preparedness Frame Work)

কোন মানুষ ও গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে বিপর্যয়মুক্ত নয়, যেমন একটা বিপর্যয় আগে হয়েছে আরও বিপর্যয় আগামীদিনে আসবে। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিপর্যয় প্রস্তুতিকরণ বিশেষ প্রয়োজন। (যা বইয়ের অন্যান্য অংশে আলোচনা করা হয়েছে।) কিন্তু কি ভাবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তা করা যায় তা দেখা উচিত। নীচে তা বিষদভাবে আলোচনা করা হল।

বিপর্যয় প্রস্তুতিকরণ বিধি

বিপন্নতার স্বরূপ ও মূল্যায়ণ (১)	পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো (২)	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (৩)
তথ্য আদান প্রদান পদ্ধতি (৪)	সম্পদের তালিকাকরণ (৫)	সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (৬)
দুর্যোগে সামাল দেওয়ার পদ্ধতি (৭)	জনচেতনা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ (৮)	মহড়া (৯)

(১) বিপন্নতার মূল্যায়ণ (Risk Assessment) ঃ

কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কী কী ধরণের ঝুঁকি পূর্ণতা আছে, তার সাম্ভাব্য কারণ, প্রতিকার কী আছে তার মূল্যায়ণ অত্যন্ত জরুরী। ঝুঁকি পূর্ণতার কারণ বিশ্লেষণ করা এবং তা লঘু করার পদ্ধতি কী আছে তা আগেভাগে দেখা আর মোকাবিলার পদ্ধতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা কী আছে তাহা দেখা।

(২) পরিকল্পনা (Planning) ঃ

যদি নির্দিষ্ট এলাকার ঝুঁকিপূর্ণতা, তার সাম্ভাব্য কারণ, সময় ও ব্যপকতা জানা যায় তা হলে অতি সহজেই তার মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে PLA - পদ্ধতিতে গ্রাম বা পাড়া ভিত্তিক পরিকল্পনা বা অন্যান্য পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। পরিকল্পনা সর্বস্তরের মানুষ, গোষ্ঠী বা বিভাগের মধ্যে সমভাবে বন্টন অত্যন্ত জরুরী। প্রতিটি গৃহ বা ব্যক্তি তাদেরও দুর্যোগ প্রস্তুতির পরিকল্পনা আগে ভাগে চিন্তা করে রাখা উচিত এবং সমগ্র পরিবারকে তা জানানো

দরকার। যেমন হঠাৎ ভূমিকম্প হলে করণীয় কর্তব্য, বাড়ির রাত্রিকালীন নির্গমন পথ কী আছে। স্কুল, কলেজ, বড় বড় বাড়ির ও অফিসের আপাৎকালীন নির্গমন ব্যবস্থা কী ইত্যাদি। যদি মূল পথ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে জরুরীকালীন পথ কী আছে জানা।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো (Institutional Frame Work) **ঃ**

দূর্যোগ ও প্রস্তুতি পর্বে ও মোকাবিলায় যেমন সাধারণ মানুষের অবদান আছে তেমনই প্রতিষ্ঠানগত প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পেশাদারী প্রতিষ্ঠান যেমন সেনাবাহিনী, আবহাওয়া দপ্তর, পুলিশ বাহিনী, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যেমন সেচ ও জলপথ, পূর্তদপ্তর, দমকল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, অসামরিক প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তর ও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়, তথ্যের আদান-প্রদান, অত্যন্ত জরুরী। দেখা যায় যে বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরণের CBO, NGO -দের গুরুত্ব অপরিসীম। একে অপরের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান ও একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা একটা আলাদা মাত্র সংযোজিত করেছে।

(৪) তথ্য আদান-প্রদান পদ্ধতি (Information System) **ঃ**

বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন সময়ে (বিপর্যয়ের পূর্বে, মধ্যে ও পরে) সঠিক তথ্যের আদান-প্রদান একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অনেক সময় সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে পরিবেশনের অভাবে বিপর্যয়ের প্রভাব কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাছাড়া সঠিক তথ্য বিপর্যয় কালে সঠিক জায়গায় পৌঁছনোর অভাবে বিপর্যয়ের প্রভাব অনেক বেড়ে যায়। অনেক সময় তথ্যের বিশ্লেষণের অভাবে অনেক বড় ঝুকির সৃষ্টি হয়ে থাকে, বিশেষ করে পূর্বাভাস সম্বন্ধে সতর্কীকরণ তথ্য। অনেক সময় মানুষ আবহাওয়া সম্বন্ধে সতর্কীকরণকে প্রকৃত আবহাওয়া ঘোষণা বলে মনে করায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

(৫) সম্পদের তালিকাকরণ (Resource Base) **ঃ**

নির্দিষ্ট এলাকার বিপর্যয় প্রস্তুতিকরণের কাজের জন্য সম্পদের মানচিত্র, "তালিকা প্রস্তুতিকরণ খুবই যুক্তিযুক্ত। যাতে প্রয়োজনের সময় তা হাতের কাছে থাকে ও ব্যবহার করা সহজ সাধ্য হয়ে থাকে। গ্রাম, শহর, মহকুমা, জেলা ও রাজ্যভিত্তিক সম্পদের তালিকা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় যা হাতের কাছেই থাকে ও প্রয়োজনে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মানব সম্পদ একটা প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে।

(৬) সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Warning System) **ঃ**

বিপর্যয়ের লক্ষণ অনুসারে সতর্কীকরণ হয়ে থাকে। যেমন কোন কোন বিপর্যয়ে সতর্ক করার কোন অবকাশ থাকে না যেমন ভূমিকম্প, আবার বন্যা, খরা ও সাইক্লোনের ক্ষেত্রে সময় পাওয়া যায়। তাই সতর্কীকরণ এমন একটা কাজ যা সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে সঠিক জায়গায় জানানো অত্যন্ত জরুরী। কে কোন কোন বিষয় সতর্কীকরণ করবে তা আগে ভাগে দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ। গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনায় কে এই কাজ

করবে তা গ্রামের মানুষের জানা দরকার। সবাই এক সঙ্গে সতর্ক করার কাজ করলে তা সঠিকভাবে নাও হতে পারে।

(৭) দুর্যোগ সামাল দেবার পদ্ধতি (Response Mechanism) ঃ

বিপর্যয় প্রস্তুতিকরণ কাজের মধ্যে জরুরী সময় মোকাবিলার পদ্ধতি কী হবে, কে কোন কাজের দায়িত্বে থাকলে কী কী জিনিসের কখন কোথায় প্রয়োজন তা আগে ভাগে জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী। দায়িত্ব ভাগ করা না থাকলে জরুরীকালীন অবস্থায় তার কার্যকারিতা অনেক কমে যায় বা তাতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(৮) জনশিক্ষা (Public Education) ঃ

প্রতিটি স্তরে মানুষের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি করা এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় দায়িত্বশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরী কাজ।

(৯) মহড়া (Rehearsals) ঃ

প্রস্তুতির মহড়া অত্যন্ত জরুরী, তা বিভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে। বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি পর্বের মহড়া প্রস্তুতির সঠিক মান নিদ্ধারণ করে বা পরিকল্পনার মূল্যায়ণ করতে শেখায়।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা চক্র
(Disaster Management Cycle)

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা চক্রের মধ্যে যে সব বিষয় আছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল ঃ



১। বিপর্যয়ের ঘটনা (Disaster) ঃ

দুর্গতির ঘটনা ও তার প্রভাবে যে ঝুঁকি থাকে সেটাই হল "প্রকৃত সময়"। বিপদের ধরণের ওপরই সময়কাল নির্ভর করে। কারণ, ভূমিকম্প হয় কয়েক সেকেন্ডের জন্য। আবার বন্যা ঘটে বেশি সময় ধরে।

২। সাড়া দেওয়া ও ত্রাণ (Relief) ঃ

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক উদ্যোগটাই হল সাড়া দেওয়া। এর মধ্যে পড়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন, কাজে কী কী লাগবে তা ঠিক করা, হুশিয়ারি জানানো। উদ্ধারে করণীয়, লোকদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া, প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। একই সঙ্গে গৃহহারাদের আশ্রয়, খাদ্য পানীয়, পোশাক যোগানো এবং নগদে বা বস্তুতে সহায়তা দান এবং যোগাযোগ স্থাপন।

৩। পুনরুদ্ধার বলতে বোঝায় জরুরী ত্রাণের ব্যবস্থা, পুণর্বাসন ও পুনর্গঠন (Rescue & Rehabilitation) ঃ

জরুরী ত্রাণ ঃ

বিপর্যয়ের সময়ে ও সঙ্গে সঙ্গে যে সব কাজ করতে হয় সেগুলি হল ঃ ত্রাণ, উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ ও ধ্বংসস্তুপ অপসারণ।

পুণর্বাসন ঃ

অস্থায়ীভাবে বাসস্থান ও সাধারণের ব্যবহার যোগ্য ব্যবস্থাগুলি তৈরি করা। এটা বেশিদিন প্রয়োজন হতে পারে।

পুণর্গঠন ঃ

এর অর্থ হল মানুষের বিপর্যয় পূর্ব-অবস্থায় ফিরে যাবার জন্য ব্যবস্থাগুলির উন্নতি সাধন। এর মধ্যে রয়েছে, ঘরবাড়ি মেরামত এবং পরিকাঠামো এমনভাবে পুনরুদ্ধার করা যাতে সেই বাড়ি বা পরিকাঠামো যেন আর বিপর্যয়প্রবণ হয়ে না পড়ে।

বিকাশ / উন্নয়ন (Development) ঃ

বিকাশমান অর্থ ব্যবস্থায় উন্নয়ণ প্রক্রিয়া এক চলমান কার্যক্রম। দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা যাতে বিপর্যয় বারবার না ঘটে তেমন ভাবে পুনর্গঠন, যেমন বন্যা ঠেকাতে বাঁধ তৈরি, খরা ঠেকাতে সেচের ব্যবস্থা, ধস কমাতে বন সৃজন, জমি ব্যবহার পদ্ধতি উন্নয়ন, প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় সহনশীল বাড়ি তৈরি, ভূমিকম্প সহনশীল বাড়ি, প্রভৃতি ঐ উন্নয়ণ পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে।

নিবারণ (Prevention) ঃ

যে সব কাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে সেগুলি বন্ধ করা বা কমিয়ে আনা। এর ফলে বিপর্যয় বন্ধ হতে পারে অথবা তার ঝুঁকি কমতে পারে।

নিবারণ বলতে অনেক সময় বোঝায়—এমন এক ব্যাপকতর ব্যবস্থা যার ফলে মানুষ ও সম্পদ রক্ষা পাবে। বস্তুত তা পুরোপুরি সম্ভব নয়? তাই, নিবারণের বদলে 'কমানো' বলা ভাল। কারণ, এমন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব যাতে ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের মাত্রা কমতে পারে।

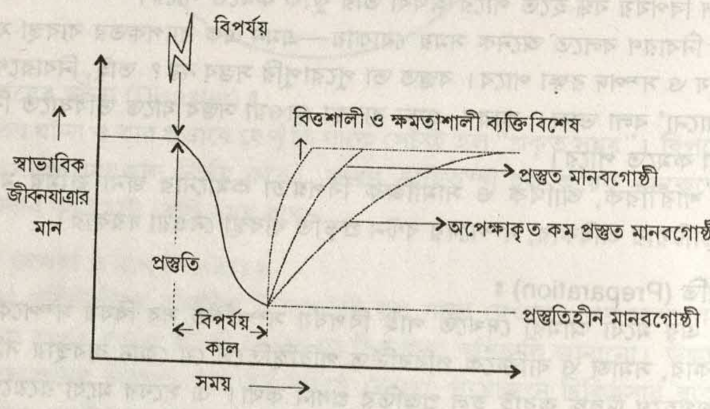
শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক বিপন্নতা কমানোর জন্য জমির মালিকানা, ভাড়াটিয়ার অধিকার, সম্পদের বন্টন প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

প্রস্তুতি (Preparation) ঃ

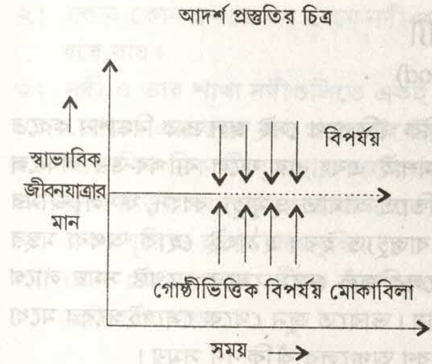
এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই বিপর্যয় সম্পর্কিত সব বিষয় সম্পর্কে প্রস্তুতি। সরকার, সমাজ ও ব্যক্তিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে কোন ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই হল প্রস্তুতির প্রধান কথা। এ সবের মধ্যে রয়েছে, জরুরী পরিকল্পনা, সাবধানতার জন্য হুশিয়ারী ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মী প্রশিক্ষণ। তাছাড়া উদ্ধার, ত্রাণ, আশ্রয়, ও পুনর্বাসন প্রভৃতি কাজের জন্য অর্থ সংস্থান ও দায়িত্ব বন্টন।

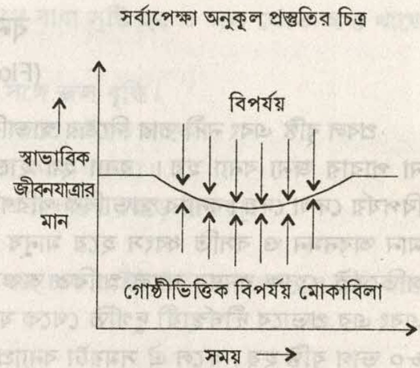
গোষ্ঠীভিত্তিক বিপর্যয় মোকাবিলা — যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

গোষ্ঠীভিত্তিক বিপর্যয় মোকাবিলা একটি বিশেষ কর্মকান্ড যা যে কোন গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মূল্যায়ন ও একত্রিকরণের জন্য অপরিহার্য. গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দায়িত্ব শুধুমাত্র বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কালে ত্রাণ সংগ্রহ করা নয়। উন্নয়নের মূলে যদি তথাকথিত বিপন্ন ও অসহায় মানুষের কোনো ভূমিকা না থাকে তাহলে তাদের জীবনে কোনো ইতিবাচক বা দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বিপর্যয়কালে সাধারণ মানুষের অসহায়তা কাটাবার জন্য তাদের আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়াটাই হচ্ছে একমাত্র উপায় বা তাদের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে পারে। আন্তর্জাতিক স্তরের অভিজ্ঞতা বলছে একটি প্রস্তুত গোষ্ঠীর বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষমতা একটি প্রস্তুতি বিহীন গোষ্ঠীর চেয়ে অনেকগুণ বেশি। উদাহরণ স্বরূপ ৬.৯ রিঃ স্কেলের লাতুরের ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ১০,০০০ অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসের একই মাত্রার ভূমিকম্পে মাত্র ৫১ জন নিহত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রেও 'হ্যারিকেন এন্ড্রু ও বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে তুলনীয়। তাহলে বিপর্যয় প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য বিপর্যয়কালীন ক্ষয়ক্ষতি কমানো। ব্যাপারটাকে আরও ভালভাবে বুঝতে আসুন আমরা নিচের ছবিগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি।



বিপর্যয় আক্রান্ত হলে মানবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান খুবই কম সময়ের মধ্যে অধঃপতিত হয়। যারা বিত্তশালী বা ক্ষমতাশালী সেরকম কিছু ব্যক্তিবিশেষ নিজেদের অর্থের জোরে সেই মানকে খুব শিঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। যদি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীই প্রস্তুত থাকে তাহলে পুরো গোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান খুব শিঘ্রই পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। একটি প্রস্তুতিহীন গোষ্ঠী কিন্তু পড়ে থাকে সেই গহ্বরে যেখানে সে বিপর্যয়কালে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। আসুন এইবার দেখা যাক একটি গোষ্ঠীর জন্য আদর্শ ও সর্বাপেক্ষা অনুকূল প্রস্তুতির চিত্রটা কেমন হবে।





স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য ঃ

এই উদ্দেশ্যের স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্য হল একটি গোষ্ঠীভিত্তিক বিপর্যয় মোকাবিলার খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করতে গোষ্ঠীকে সাহায্য করা। পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে গোষ্ঠীর বিপর্যয় মোকাবিলা করার ক্ষমতাকে দৃঢ়বদ্ধ করা ও বিপর্যয়কালীন প্রাণ ও সম্পদ হানির হারকে কমিয়ে আনা।

যাইহোক, এই উদ্যোগের সঙ্গে অনেক এমন সব বিষয় জড়িত যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। সেরকম কয়েকটি বিষয় হ'ল কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন, বন্যা প্রতিরোধকারী ঘরবাড়ি, বিকল্প জীবিকার্জ্জন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনাবোধ গড়ে তোলা সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রকল্পটির কয়েকটি মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ

1. বিপর্যয় প্রস্তুতি পরিকল্পনা রূপায়নে গোষ্ঠীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।
2. প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটিকে সরকারী কার্যপদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করানো।
3. সামগ্রিক ব্যাপারটা নথিভুক্ত করা।

সৌজন্যে ঃ সাস্বত বোস/WBVHA

বন্যা
(Flood)

প্রবল বৃষ্টি এবং নদী তার নিজের স্বাভাবিক গতিপথে সেই জল দ্রুত নিষ্কাশন করতে না পারার জন্য বন্যা হয়। বন্যা হয় হামেশাই এবং এর ফলে ব্যাপকতর অঞ্চলে বিপর্যয় দেখা দেয়। বন্যার স্বাভাবিক পরিণতিতে আঘাত ও মৃত্যু, ধ্বংস, ফসলী জমির মান অবনমন ও বসতি ধ্বংস হয়ে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। হঠাৎই হোক অথবা মন্থর গতিতেই হোক বন্যার ফলে প্লাবিত অঞ্চলের জল নেমে যেতে যথেষ্ট সময় লাগে এবং এর প্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী দুর্গতি থেকে যায়। ভারতে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৮০ ভাগ বৃষ্টি হয়। ফলে ঐ সময়টা বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ সময়।



ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় প্রধান বন্যাকবলিত দেশ। এটা এদেশে এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রায় সব রাজ্যেই এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে থাকে। এছাড়া বাঁধের উদ্বৃত্ত জল ছেড়ে দেবার ফলেও বন্যা দেখা দেয়।

বন্যার কারণসমূহ (Causes of Flood) ঃ

বন্যার জল ফসলের খেত, মানুষের বসতি এমনকি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলও প্লাবিত করে থাকে। ফলে নষ্ট হয় জীবন ও সম্পদ, ভেঙ্গে যায় কাঁচা বাড়িও। এই বন্যার কারণগুলি হল —

১। নদী খাত দিয়ে জল নিষ্কাশন করা অপর্যাপ্ত স্থানের জন্য সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তলানী পড়ে নদী খাত উঁচু হয়ে যায়। ফলে পাড় উঁচু করলেও জল বহন ক্ষমতা বাড়ে না। সেই চাপে নদী বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং জল উপকূলবর্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করে দেয়।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে ধস নেমে নদী পথে বাধা সৃষ্টি হয় ও জল স্রোত অন্য খাতে বয়ে যায়।
৩। নদী ও তার শাখা নদীগুলিতে একই সঙ্গে জল বৃদ্ধি।
৪। জোয়ার এর ফলে জল প্রবাহ উল্টো খাতে বইতে থাকে।
৫। স্বাভাবিক নিকাশী ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া।
৬। ঘূর্ণী ঝড়ের ফলে সমুদ্রের জলস্রোত ও জলস্তর বেড়ে যাওয়া।
৭। প্রবল বৃষ্টি ও হঠাৎ জল বৃদ্ধি।
৮। কোন কোন ক্ষেত্রে নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ ও ইটভাঁটা করার ফলে নদী খাত ছোট হয়ে যায়।

বন্যাজনিত বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপনা (Management of Flood Disaster) :

প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক আর মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়ই হোক তার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি দরকার সবসময়। অর্থাৎ বিপদাবস্থা বা বিপর্যয়ের আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা দরকার।

সাধারণভাবে জানা আছে যে, কোন কোন অঞ্চল প্রাকৃতিক বন্যাপ্রবণ আর কোন কোন অঞ্চল বাঁধমুক্ত জলে ডুবে যায়। এই সব অঞ্চলে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা দরকার। বন্যা হবার সম্ভাবনা আছে এমন সব অঞ্চলে লোক সংখ্যা অনুপাতে নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। সেখানে বিপদ আসবার আগে থেকেই মজুদ রাখতে হবে - চাল, ডাল, আটা, নুন, পানীয় জলের বিকল্প সংস্থান, কেরোসিন, মোমবাতি, দেশলাই, অত্যাবশ্যক ওষুধ। উদ্ধারের জন্য নৌকা, গাড়ি, হাসপাতালে রোগী পাঠাবার জন্য গাড়ি/অ্যামবুলেন্স প্রভৃতি এবং সর্বোপরি প্রস্তুত রাখতে হবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে খাল, নালা ও নদীর নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে নিয়মিত আবহাওয়ায় পূর্বাভাস শুনতে হবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংবাদভাষ্যে। এছাড়া টেলিফোন, মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেটকেও কাজে লাগাতে হবে। সাবধান বাণী শুনেই নিচু এলাকার লোকদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হবে। তখন সমুদ্র উপকূলের মানুষ নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন না।

যাঁরা আগে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেননি, তাদের উদ্ধারের জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। সবার আগে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হবে। আগে থেকে গুছানো থাকলে নতুন ও সাময়িক আশ্রয়স্থলগুলিতে পরবর্তী কাজ সুরু করা যাবে। সেখানে সেনিটেশন, পানীয় জল ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। দেখতে হবে যাতে সেখানে কোন সংক্রামক ব্যধি ও অসামাজিক কাজকর্মের সম্ভাবনা ও সুযোগ না থাকে। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আলাদা অধ্যায়ে থাকবে। বন্যার জল কমে গেলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি প্রতি স্তরেই সরকারি দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

ভারতের নদনদী ও বিপন্নতা

(Rivers of India and Vulnerability)

বন্যাপ্রবণ অঞ্চল সমূহ (Flood prone areas) ঃ

বন্যার প্রকৃতি অঞ্চল ভিত্তিতে বা নদনদী ভিত্তিতে ভিন্ন রকম। দেশের নদ নদীগুলিকে ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল -

১। ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল
২।. গাঙ্গেয় অঞ্চল
৩। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল
৪। মধ্য ভারত ও দক্ষিণাঞ্চল

এখন সংক্ষেপে এই অঞ্চল গুলি নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

ব্রহ্মপুত্র নদ অঞ্চল ঃ

এই অঞ্চলে বন্যার প্রধান কারণগুলি হল - নদীর জল দুপারের বাঁধ উপচে প্লাবিত হওয়া, জল প্রবাহ খাতে নানা বাধা ও নদীগুলির পথ হামেশা বদলে যাওয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্রহ্মপুত্রের পাড় ভাঙ্গা এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির অবস্থা আলাদা করে বিচার করলে দেখা যায় অসমে ব্রহ্মপুত্র, বরাক এবং এদের শাখা বা উপনদীগুলির পাড় ছাপিয়ে বা উপচে জল লোকালয় প্লাবিত করে। পাড়ে ভাঙ্গন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা, ও মহানন্দা নদীগুলি প্রতি বছর প্লাবন ঘটায়। এই সব নদী প্রচুর পলি বহন করে এবং হামেশাই গতিপথ বদল করতে চায়। প্রতি বছর বর্ষাকালে এরা বন্যার কারণ হয়। আর ত্রিপুরার নদীগুলিরও পাড় ভাঙ্গে এবং দুপাড়ই জল প্লাবিত হয় প্রতি বছর।

গঙ্গানদী অববাহিকা ঃ

গাঙ্গেয় অববাহিকায় বন্যা বা জল প্লাবন মূলত সীমিত থাকে এর উত্তর দিকের অঞ্চলে। এর প্রধান কারণ হল উত্তর দিক থেকে গঙ্গায় মিলিত হওয়া উপনদীগুলির জল পাড় উপচে প্লাবিত হওয়া। অন্য দিকে এরা হামেশাই গতি বদল করে। গঙ্গা এক বিশাল নদী সুদীর্ঘ পথ ধরে বিপুল পরিমান জলরাশি এই নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। তবে, বন্যা ও ভাঙ্গন এই নদীর উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অববাহিকাতেই সীমিত রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রধানত রাপ্তি, শারদা, ঘাঙড়া ও গন্ডক নদীর উপচে পড়া জলই বন্যার কারণ। আগ্রা, মথুরা ও মিরাট জেলায় নিকাশি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। সেই সঙ্গে গঙ্গার বাঁ পাড়, ঘাঙড়ার দক্ষিণ পাড় ও গন্ডকের দক্ষিণ পাড় হামেশাই ভাঙ্গে।

বিহারে বন্যা মূলত উত্তর বিহারের নদীগুলির জন্যই প্রতি বছর হয়ে থাকে। বুড়ি গন্ডক, বাগমতি ও কমলা বালান নদী ছাড়া অন্য নদীর জন্যও বন্যা হয়ে থাকে। কোশি নদীর নিচের দিকে ও মহানন্দার পূর্ব দিকে বার্ষিক বন্যার জন্য বিপুল পরিমান ফসল নষ্ট হয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে মহানন্দা, ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাশাই, শিলাবতী প্রভৃতি নদী খাতের জলবহন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই

বন্যা হয়ে থাকে। এছাড়া কয়েকটি নদী এবং বিশেষভাবে গঙ্গার দুপাড়েই ভাঙ্গার প্রবণতা রয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের উপর দিকে বাঁ পাড় ও নিচের দিকে ডান পাড় ভাঙ্গছে প্রতিনিয়ত।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ঃ

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী অঞ্চলের তুলনায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যার সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম। তবু প্রধান সমস্যা হল, নিকাশি ব্যবস্থা খারাপ ও অপর্যাপ্ত থাকায় বন্যা হয় বা জল জমে থাকে এবং তার ফলে বিরাট অঞ্চল প্লাবিত হয়ে থাকে।

এখন পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত। রাজস্থানে বন্যা এতদিন ছিল না বললেই চলে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা পাড় হয়ে ঘাগড়া নদী রাজস্থানের বালিতে বিলিন হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য মাঝে মাঝে সেখানে বন্যা দেখা দিচ্ছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলম ও শাখা নদীর জন্য বন্যা দেখা যায়। উল্লার হ্রদের বাড়তি জলে উপকূল প্লাবিত হয়ে যায়। এছাড়া চেনাব নদীর জলেও কোন কোন সময় উপকূলে বন্যা দেখা দেয় এবং ঘন বসতিপূর্ণ জম্মু, আঁখনুর প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত হয়।

মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চল ঃ

এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে সমগ্র দক্ষিন ভারতের রাজ্যগুলি। সেগুলি হল, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালা, ওড়িষা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের একাংশ। এই সমগ্র অঞ্চলে বন্যার সমস্যা প্রকট নয়। তবে, ওড়িষায় কয়েকটি নদীতে বন্যা দেখা দিয়ে থাকে।

অন্ধ্রপ্রদেশে কয়েকটি ছোট নদী জল উপচে উপকূল প্লাবিত করে দেয়। এছাড়া কোল্লেরু হ্রদের জলে পাশের অঞ্চলগুলি প্লাবিত হয়। আর সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যাও রয়েছে।

তাপ্তি ও নর্মদা নদীর জলস্ফীতির ফলে গুজরাটের নিম্নাঞ্চল মাঝে মধ্যে প্লাবিত হয়ে যায়।

ওড়িষায় মহানদী, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী একই বদ্বীপ পথে সমুদ্রে মিলিত হয়। ফলে জলস্ফীতি ঘটে একই সঙ্গে তিনটি নদীতেই বন্যা দেখা দেয়। আর জোয়ারের দিনগুলিতে, বিশেষভাবে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় ঐ বন্যা প্রবল আকার ধারন করে। নদীগুলিতে তলানী জমার ফলে জল দুকূল ডুবিয়ে দেয় এবং অনেক সময় নদীগুলি নতুন গতিপথে প্রবাহিত হবার ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটি এবং বাড়তি জলের জন্য সুবর্ণরেখা উপকূলবর্তী নিচু অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়।

পূর্ব উপকূলে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীতে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে। সমুদ্রে ঘূর্ণীঝড় ও জল বেশি বৃদ্ধি এক সঙ্গে যুক্ত হলে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তারফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

বৃষ্টি, বন্যা ও জোয়ারের মিলিত প্রভাবে বন্যা ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এক বার্ষিক ঘটনা। এছাড়া জলাধার থেকে বাড়তি জল ছেড়ে দেবার জন্যও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, দামোদর বাঁধের জলে হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বার্ষিক বন্যা। এই সব দিক বিবেচনা করেই বন্যাজনিত বিপর্যয় বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কর্মসূচি নির্দ্দিষ্ট করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী ও বিপন্নতা
(Rivers of West Bengal and Vulnerability)

১. ভূমিকা ঃ

মানুষের যাযাবর বৃত্তির শেষ ও প্রগতির সূচনা হয়, নদী উপত্যকায় মানুষের বসতি গড়ে ওঠার মধ্যদিয়ে। অন্যদিকে নগর ও শহরের গৌরবোজ্জ্বল দিন বন্যার ধ্বংসলীলায় লুপ্ত হয়েছে এমন অনেক করুণ কাহিনী ও পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দর্শক আছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'বন্যার' প্রধান ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা-আসাম ও পশ্চিমবাংলার ইতিহাস গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের গঠন ও সেখানে মানব সমাজের পত্তন ও উত্থানের ইতিহাস। এই উপত্যকায়ও নদীভিত্তিক সভ্যতার উত্থানের সাথে পতনের ইতিহাসও অনেক আছে। যেমন পদ্মার আর এক নাম "কীর্তিনাশা" হয়েছে। অধুনা বন্যাকে কেন্দ্র করে যে আলাপচারিতা হয় তাতে প্রকৃতির খেয়ালিপনার অন্যতম নির্দশন বন্যা এটাই ভুলে যাওয়া হয়।

২. পশ্চিমবাংলার বন্যা ঃ

পশ্চিমবাংলার ভৌগলিক আয়তন 88,752 বর্গ কিমি। মোট আয়তনের 32,738 বর্গকিমি এলাকা বন্যা সম্ভাবনাময় বলে চিহ্নিত। গত 41 বৎসরে কেবলমাত্র 6 বৎসর (2001 সালকে ধরে নিয়ে) পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কোনই বন্যা হয়নি (500 বর্গকিমির নিচে বন্যা কবলিত এলাকা)। অন্যদিকে এই সময়ে মোট চারবার 1978, '84, '91, ও 2000 সালে মোট 20,000 বর্গকিমির ওপর এলাকা বন্যায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসমুদ্র হিমাচল ব্যপৃত পশ্চিমবঙ্গে ভৌগলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক গঠনের ওপরই মূলতঃ বন্যার সমস্ত কারণ নিহিত। আমরা এই লেখায় এরাজ্যের নদীগুলির খুব ছোট্ট বিবরণ ও এলাকাগত ভাবে বন্যার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলকে একটা ধারণা দিতে সচেষ্ট হব।

৩. উত্তরের নদীগুলি ঃ

৩.১. উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার জেলার মধ্যদিয়ে মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক ইত্যাদি নদীগুলি বয়ে গেছে। সব নদীর উৎপত্তিস্থল আমাদের রাজ্য সীমানার বাইরে। কিছু নদী সিকিমে আর অন্যরা হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন উচ্চতল থেকে নেমে এসে পশ্চিমবাংলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় মিলিত হয়েছে। দার্জিলিং জেলার মূলনদী মহানন্দা নেপালের হিমালয় পর্বতমালায় উৎপত্তির পর শিলিগুড়ির কাছে বাংলাদেশের সাথে কিছুটা অংশে সীমানা তৈরী করে বিহারে প্রবেশ করেছে। বিহারে বাগডোব বলে একটি জায়গায় এই নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে। তার একটি অংশ

ফুলাহার নাম নিয়ে ফরাক্কার ওপরে অন্য অংশটি মহানন্দা নামেই মালদা জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে গোদাগারি ঘাটে পদ্মায় মিশেছে।

৩.২ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে বা তাদের ঘিরে যে নদীগুলি আছে সেগুলি হ'ল ডাউক, নাগর ইত্যাদি কুলিক, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা। এ নদীগুলির উৎপত্তি স্থল হ'ল বাংলাদেশের নানা এলাকায়। কিছু আবার পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। তবে এই নদীগুলির অধিকাংশ অববাহিকা অঞ্চল বাংলাদেশের মধ্যেই। ওই নদীগুলি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে বা তাদের ঘিরে প্রবাহিত হয়ে কিছু নদী বাংলাদেশের ফরাক্কার নীচে মহানন্দায় আবার কিছু ফরাক্কার উপরে ফুলাহার নদীতে মিশেছে।

৩.৩ মালদা জেলাকে ঘিরে আছে একদিকে পুনর্ভবা অন্যদিকে গঙ্গা আর মধ্যদিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা। পশ্চিমে গঙ্গা তার উপর অববাহিকার প্রায় এগারোটা রাজ্যের জল ও পলিমাটি বয়ে নিয়ে মালদাকে ঘিরে ফরাক্কা ব্যারেজের মধ্যদিয়ে বয়ে চলে যায়। পূর্বদিকে পুনর্ভবা নদী মালদা জেলার সাথে বাংলাদেশের সীমানা তৈরী করে আছে।

৩.৪ এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের গড় হিসাব নিলে দেখা যাবে তোর্ষা নদী উপত্যকায় ৩৬০০ মিমি থেকে দক্ষিণে আত্রেয়ী নদী উপত্যকায় ১৪৫০ মিমি পর্যন্ত কমে আসে।

৪. উত্তরের নদীগুলির বন্যার কারণ ঃ

৪.১ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলি মূলতঃ হিমালয়ের গভীরখাত থেকে এসে তার পাদদেশ এলাকায় অগভীর খাতে প্রবাহিত হয়। এই অবস্থায় এদের জলবহন ক্ষমতা থাকে অত্যন্ত সীমিত। আবার নদীর উপর অববাহিকা অঞ্চলে বিশেষ করে হিমালয় পার্বত্য এলাকায় অরণ্যের বিনাশ ও আকরিক ডলোমাইটের আহরণে (ভূটান রাষ্ট্রে) ব্যাপক ধ্বস নামে। ওই আবর্জনা নদীগুলি বয়ে এনে অগভীর নদীখাতগুলিকে আরও ভরাট করে দেয়। বিশেষ করে যে সব নদীতে নদী বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকানো হয়েছে সে সমস্ত এলাকায় নদীতল দ্রুততার সাথে উচ্চতর তলে (Level) উঠে আসে। তাই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় যে কোন নদী অববাহিকায় ক্রমাগত 48 ঘন্টা থেকে 72 ঘন্টা একনাগাড়ে 300 মিমি-এর (24 ঘন্টায়) বেশী বৃষ্টি হ'লে নদীগুলিতে বন্যার সম্ভাবনা প্রবল হয়। এই নদীগুলির উপর অববাহিকার এক বড় অংশ যেহেতু রাজ্যের বাইরে তাই রাজ্যের অভ্যন্তরে বৃষ্টিপাত বেশী না হ'লেও এখানে বন্যা সম্ভাবনা তৈরী হ'তে পারে।

৪.২ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলির কেবলমাত্র মধ্যভাগটুকু জেলায় রয়েছে। জেলার বাইরের উপর অববাহিকার বৃষ্টিপাতের ফলের সাথে জেলার স্থানীয় বৃষ্টিপাতের প্রবাহ মিলিত হয়ে এখানকার বন্যা পরিস্থিতি প্রাথমিকভাবে তৈরী হয়। তবে এই বন্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে যখন জেলার বাইরের নদীগুলির নিম্ন অববাহিকার উচ্চতর নদীতলের জন্য উপর অববাহিকায় নিকাশী অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

৪.৩ মালদা জেলার পশ্চিমের এক বড় এলাকার বন্যা পরিস্থিতি মূলতঃ নির্ভর করে গঙ্গানদীর উপর অববাহিকার নানা উপ/শাখা নদীগুলির জলস্ফীতি ও সেই এলাকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর। মালদা জেলার মধ্যবর্তী এলাকার বন্যা পরিস্থিতি ফুলাহার ও মহানন্দা নদীর জলস্ফীতির ওপর নির্ভর করে। এই জেলায় একটা বিশাল এলাকা মহানন্দার ফুলাহার শাখার বন্যা মুক্ত করতে নদী বাঁধ দিয়ে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই সংরক্ষিত এলাকা বর্ষার সময় স্থানীয় বৃষ্টিপাতেই জলমগ্ন হয় কারণ ওই জল গঙ্গা ফুলাহার ও মহানন্দার উচ্চ জলতলের দরুণ নিকাশী পথ পায় না।

৫. মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলি ঃ

৫.১ দক্ষিণবঙ্গের মানচিত্রে ভাগীরথী-হুগলী নদী এই ভূ-ভাগটিকে প্রায় দু'টুকরো করে গঙ্গা থেকে বয়ে এসে সাগরদ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। বহুদিন হ'ল ভাগীরথীর প্রাকৃতিক উৎস মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরী করে গঙ্গার জল একটা খালের সাহায্যে জঙ্গীপুরের কাছে নদীর প্রচলিত খাতে বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। মূলতঃ এই প্রবাহের দরকার হয় শুখা মরশুমে। বর্ষায় এই জলের প্রয়োজন হয় কখনো কখনো। এই নদীটিই দক্ষিণবাংলার মূল নিকাশী ধমনী। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার এক বড় অংশের সমস্ত নদীনালার জল ভাগীরথী-হুগলী নদী পথেই বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

৫.২ পাগলা, বাঁশুই, দ্বারকা-ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী-বাবলা-কুঁয়ে-উত্তরাসন এই নদীগুলি বীরভূম জেলা ও মুর্শিদাবাদের পশ্চিম (ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ের) অংশের নিকাশী নালা হিসাবে কাজ করে। এরা সবাই ভাগীরথীতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে। এই নদীগুলির উৎস ও অববাহিকার একটা অংশ ঝাড়খন্ডের মালভূমিতে আছে

৫.৩ মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বে (ভাগীরথীর পূর্বদিকে) গঙ্গা-পদ্মার পার থেকে ভৈরব-জলঙ্গী-শিয়ালমারী গোষ্ঠীর নদীগুলি বৃষ্টির জল বয়ে এনে জলঙ্গী নদী দিয়ে নদীয়ায় নবদ্বীপের উল্টোদিকে (স্বরূপগঞ্জ) ভাগীরথীতে মিশেছে। ভৈরব-জলঙ্গীর উৎসমুখ পদ্মায় যুক্ত। এই নদী মূলতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পূর্ব অংশের ও নদীয়া জেলার একটা বড় অংশের নিকাশী নালা হিসাবে কাজ করে।

৫.৪ ভাগীরথীতে জলঙ্গী নদীর মোহনার প্রায় 45 কিমি উত্তরে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে অজয়নদী এসে মিশেছে। এই নদী পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম ও বর্ধমানের জেলার সীমানা। এই নদীর উৎস হ'ল ঝাড়খন্ডের মালভূমিতে এবং অববাহিকার একটা বড় অংশ ওই রাজ্যের আওতায়। তবে বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিছু অঞ্চলের বৃষ্টির জলধারা এই নদী বহন করে আনে।

৫.৫ নদীয়া জেলায় জলঙ্গী অববাহিকার বাইরে একটা অঞ্চল মাথাভাঙ্গা-চুর্ণী-ইছামতী অববাহিকার অংশ। মাথাভাঙ্গা নদীর বাংলাদেশে পদ্মা থেকে উৎপত্তি। নদীয়ার মাঝদিয়াতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। এই নদীর একটা ধারা চুর্ণী নাম নিয়ে রানাঘাটে হুগলীতে মিশেছে। অন্যধারা ইছামতী হয়ে নদীয়ার কিছুটা পরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের ভেতরে প্রবাহিত হয়ে ইছামতী বনগাঁর উত্তরে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করে উত্তর চব্বিশ পরগণার সীমানা (আন্তর্জাতিক) হয়ে রায়মঙ্গল খাঁড়িতে মিশেছে।

৫.৬ দামোদর-বরাকর ও তার শাখানদীগুলির ঝাড়খন্ড এলাকায় উৎপত্তি। মাইথনের নীচে দামোদর-বরাকরের মিলিত শাখা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে বর্ধমান জেলার মধ্যদিয়ে বয়ে এসে হুগলীর সীমান্তে পৌঁছে দামোদর নামে হুগলী-বর্ধমান সীমানায় (বেগুয়াহানা) দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি খাত (খুবই কম জল আসে) নিম্ন দামোদর নামে হাওড়া জেলার মধ্যদিয়ে উলুবেড়িয়াতে হুগলী নদীতে মিশেছে। অন্যটি হুগলী জেলার মধ্যদিয়ে মুন্ডেশ্বরী নাম নিয়ে রূপনারায়ণ নদীতে মিশেছে।

৫.৭ পশ্চিমবাংলার একেবারে পশ্চিমে এবং উড়িষ্যা ও বিহারের লাগোয়া জেলা পুরুলিয়ার মধ্যদিয়ে মূলতঃ কংসাবতী ও কুমারী নদীর নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত আছে। উত্তরের কিছু এলাকা দামোদর উপত্যকার অংশ। দক্ষিণের একাংশ সুবর্ণরেখার জলবিভাজিকার অন্তর্গত। পুরুলিয়া জেলার গড় বাৎসরিক বৃষ্টি ১৩০০ মিমি থেকে ১৪০০ মিমির মধ্যে।

৫.৮ বাঁকুড়া জেলার উত্তরপ্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে দামোদর নদী। মধ্যদিয়ে বাঁকুড়ার নিজস্ব নদী (উৎপত্তি) দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী। শীলাবতী নদীর বাঁকুড়ায় উৎপত্তি, বয়ে গেছে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের সীমানা হয়ে মেদিনীপুরে। আর আছে পুরুলিয়া জেলা থেকে নেমে আসা কুমারী-কংসাবতী যার মিলিত ধারা মেদিনীপুরে চলে গেছে কসাই নাম নিয়ে।

৫.৮.১ বাঁকুড়া জেলায় মুকুটমণিপুরে কংসাবতী ও কুমারী নদীর মিলিত ধারার ওপর একটি ড্যাম তৈরী হয়েছে। এই ড্যাম মূলতঃ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার চাষের জমিতে জল দেয়। তবে এই ড্যামে অল্প করে বন্যার জলধরায় কিছু জায়গা রাখা আছে। কংসাবতী মূল অববাহিকা অঞ্চলের মোট আয়তন 8369 বর্গ কিমি। ড্যামের অববাহিকার এলাকার আয়তন 3625 বর্গ কিমি। ড্যামে বন্যার জলধারার জন্য 29,170 হেক্টর মি জায়গা রাখা আছে যেটা ড্যামের বিশাল অববাহিকা অঞ্চলের সার্বিক বন্যা আয়তনের পক্ষে খুবই ছোট্ট। ফলে যে কোন বড় বন্যায় ড্যাম থেকে জল ছাড়তে হয়।

৫.৯ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা ছিল মেদিনীপুর। সম্প্রতি এটা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর নামে বিভক্ত হয়েছে। শীলাবতী নদী বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সীমানা তৈরী করে ঘাটাল শহরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে (বন্দর) মিশেছে। বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর নদীর সাথে গন্ধেশ্বরী নদী মিলিত হয়ে দ্বারকেশ্বর নাম নিয়ে শিলাবতীর সাথে মিশে রূপনারায়ণ নাম নিয়ে মেদিনীপুর-হুগলী, মেদিনীপুর-হাওড়া জেলার সীমান্ত ধরে বয়ে এসে হুগলী নদীতে মিশেছে (গেঁয়োখালী)। বাঁকুড়া জেলার পর কংসাবতী নদী মেদিনীপুরের মধ্যে কেশপুরের নীচে (কলমিজোল) দু'ভাগে ভাগ হয়েছে। একভাগ পুরানো কাঁসাই নামে দক্ষিণমুখী হয়ে কেলেঘাই-কপালেশ্বরীর মিলিত ধারার সাথে মিলে হলদি নদী নাম নিয়ে হলদিয়ার কাছে হুগলী নদীতে মিশেছে। অন্যধারাটি নতুন কসাই নামে পূর্বগামী হয়ে রূপনারায়ণ নদীতে মিশেছে। মেদিনীপুর জেলার একটা অংশ সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকার অন্তর্ভূক্ত। সুবর্ণরেখা ঝাড়খন্ডে উৎপন্ন হয়ে উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ ও সবশেষে উড়িষ্যার মধ্যদিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

৫.১০ উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটা বড় এলাকা সমুদ্র খাঁড়ির অঙ্গ। এই দুই জেলার মূলনদী হুগলী ও তার সাথে যুক্ত কিছু নিকাশী নালা। উত্তর চব্বিশ পরগণার ইছামতী নদী কিছু জল রায় মঙ্গল খাড়ি দিয়ে নিকাশী করে। আগেই বলা হয়েছে হুগলী ও হাওড়া জেলার একটা এলাকা নিম্ন দামোদর নদী অববাহিকার অংশ। হাওড়া ও হুগলীর কিছুটা এলাকা রূপনারায়ণ নদীর অববাহিকার অংশ। তবে দুটি জেলার বেশ কিছু নিকাশী নালা হুগলীতে মিশেছে।

৬. মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গে বন্যার কারণ ঃ

৬.১ মধ্যবঙ্গ অর্থাৎ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার নদীগুলির বর্ণনা আমরা ৫.২ ও ৫.৩ অনুচ্ছেদে দিয়েছি। পাগলা-বাঁশুই থেকে শুরু করে অজয় নদী পর্যন্ত মোট অববাহিকা এলাকার বৈশিষ্ট্য হ'ল ঝাড়খন্ডের শুরু থেকে বীরভূম মুর্শিদাবাদের সীমানার কাছ পর্যন্ত অববাহিকার মোট ঢাল খুবই বেশী (বাদশাহী সড়কের পশ্চিম) আর তারপর জমির ঢালটা কমে এসে ভাগীরথী পশ্চিম পাড় বরাবর প্রায় সমতল। নদীগুলি ভাগীরথীতে মিশেছে উত্তরাসন থেকে কাটোয়া পর্যন্ত তিনটি জায়গায় (সব মিলিয়ে মোট দূরত্ব 40 কিমি হবে) খুবই কম দূরত্বে। আর ব্রাহ্মণী থেকে অজয় পর্য্যন্ত অববাহিকা এলাকায় মোট আয়তন হ'ল প্রায় ১৪,৫০০ বর্গ কিমি। এই বিশাল অববাহিকা এলাকার যদি একই সাথে বৃষ্টি হয় (মাঝারি আকারের) তবে সমস্ত নদীর জল একের পর এক যুক্ত হয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী করে। জঙ্গীপুর থেকে স্বরূপগঞ্জ পর্যন্ত (যেখানে জলঙ্গী মিশেছে) ভাগীরথী স্বাভাবিক জলনিকাশী ক্ষমতা (১.১ লক্ষ কিউসেফ)। স্বরূপগঞ্জের দক্ষিণে কালনার পর থেকে বঙ্গোপসাগরে হুগলী-মোহনার যত নিকটে যাওয়া যাবে ততই জোয়ার ভাঁটার জন্য ভাগীরথী-হুগলীর নিকাশী সময়টা সংক্রামিত হবে। বর্ষার সময় পশ্চিমের এই নদীগুলি যদি সবাই পরপর তাদের স্বাভাবিক

জলধারার বেশী জল প্রায় একই সময় বয়ে আনে তবে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় কারণ শীর্ণা ভাগীরথী অসহায়। তবে প্রাকৃতিক বদান্যতায় এমনটি খুব দেখা যায় না। আর 2000 সালে পাগলা বাঁশলই থেকে অজয় পর্যন্ত সমস্ত অববাহিকায় (বিশেষ করে ঝাড়খন্ডের মালভূমিতে) প্রায় 72 ঘন্টা ধরে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির ওই জলধারা যথেষ্ট দ্রুততার সাথে নেমে এসে ভাগীরথীর পশ্চিমে নিকাশী অবরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় ও সাময়িক কালের এক অভূতপূর্ব বন্যা সৃষ্টি করে। মধ্যবঙ্গের এই অঞ্চলের বন্যার ইতিহাস সুপ্রাচীন আর এর হাত থেকে রেহাই পেতে নদীগুলিতে বাঁধ দিয়েছে। কিছু নদীতে নদীর দু'দিকে কিছু ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বাদ দিয়ে নদীর একদিকে বাঁধ আছে। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতিতে যখন ভাগীরথীতে সমস্ত জল নিকাশী অবরুদ্ধ হয়। তখন বাঁধ দিয়ে আটকানো হল ক্রমাগত স্ফীত হয়ে বাঁধ টপকে বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। বাঁধ মেরামতির অভাবে দুর্বল থাকলেও ভেঙ্গে যায় ও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

৬.১ প্রসঙ্গতঃ ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেচ দপ্তরের যে ড্যাম আছে তার ভূমিকা একটু বলা দরকার। ড্যামটি আকারে ছোট। এর জলধারণ ক্ষমতাও ছোট, 4 লক্ষ 18 হাজার একর ফুট (পলিতে ভরাট অংশ বাদ দিয়ে)। এটি চাষের জমিতে সেচের জন্য তৈরী। তাই অববাহিকা এলাকায় বৃষ্টি হ'লে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ড্যামের অনেকটাই জলে পরিপূর্ণ থাকে) সেই সময় উপর অববাহিকায় যে কোন বৃষ্টিপাত হ'লে যে জল নামে তার যতটা সম্ভব ড্যামের খালি অংশে ধরে বাকিটা ছেড়ে দিতে হয়। অনেক সময় যত জল নামে তার সবটাই ছেড়ে দেয়। ড্যাম থেকে এই জল ছাড়া নিয়ে অনেক বিতর্ক হয় এবং এখনও আছে। বিষয়টা নিয়ে সকলেরই তথ্য নির্ভর ও সচেতন ভাবনা দরকার। ময়ূরাক্ষী অজয় অববাহিকায় বন্যার মূল কারণ (সাধারণভাবে) অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক এলাকা জুড়ে অত্যাধিক বৃষ্টির বিশাল জলরাশিকে ভাগীরথী দ্রুততার সাথে বয়ে নেওয়ার ব্যর্থতা।

৬.২ ভাগীরথীর পূর্বদিকে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অনেকটাই ভৈরব-জলঙ্গী-শিয়ালমারীর অববাহিকা অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ এলাকার ভু-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হল এটা একদিকে গঙ্গা-পদ্মা ও অন্যদিকে ভাগীরথী-হুগলীর বন্যার স্বাভাবিক বিচরণভূমি। কিন্তু ওই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বন্যার পলিতে এলাকাটি সঠিক ভাবে গড়ে ওঠার আগেই গঙ্গার বাঁধ ও ভাগীরথী বাঁধ দিয়ে উর্বর এই এলাকাগুলিতে জনবসতি গড়ে তুলেছিল। এই এলাকার নদীগুলির উৎপত্তি পদ্মা থেকে। স্থানীয় বৃষ্টিপাতে এখানে বন্যার আশঙ্কা খুব থাকে না। যদি সমস্ত অববাহিকা এলাকায় একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে বর্ষণ না হয় (অববাহিকা এলাকার আয়তন 4300 বর্গকিমি)। অবস্থা সবচেয়ে ভয়াল রূপ ধরে যখন পদ্মার বন্যা এই নদীগুলিতে জলস্ফীতি ঘটায়। সমস্ত বিপজ্জনক ঘটনাগুলিই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে হয়। মূল নিকাশী নালা ভাগীরথী-হুগলীও তখন খুবই সঙ্গীন অবস্থায় থাকে।

৬.২.১ মাথাভাঙ্গা-চুর্ণী-ইছামতীর বন্যা সম্ভাবনা একই কারণে হয়ে থাকে। এই অববাহিকায় নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় বহু নীচু জলাভূমি আছে যেগুলি ভাগীরথী ও গঙ্গা-পদ্মার পরিত্যক্ত নদীপথ। বর্ষায় এগুলিতেও জলস্ফীত ঘটে।

৬.৩ দক্ষিণের নদীগুলির মধ্যে প্রথমেই বন্যা সম্ভাবনায় যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি করে সে হল দামোদর। দামোদর নদীর বর্ণনা আমরা সংক্ষেপে ৫-৬ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছি। দামোদরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলা। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাওড়া জেলার একটা বিস্তীর্ণ এলাকা। দামোদর-বরাকর নদীর অববাহিকা অ্ঞ্চলের আকার হ'চ্ছে একটা ফানেলের মত। দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপর বিস্তৃত এলাকার আয়তন হ'ল 18,200 বর্গ কিমির মত আর এর নীচে হুগলী ও রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত অববাহিকার আয়তন হ'ল 4000 বর্গ কিমি ওই ছোট্ট এলাকা দিয়ে অববাহিকার সব জলটাই বয়ে যেতে চায় আর সেই সময় হুগলী ও রূপনারায়ণে যদি ভরা কোটালের জল থাকে তবে দুর্গতিটা অবর্ণনীয় হয়। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র দামোদর উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দামোদর বরাকর নদীর উপর অববাহিকায় ডি ভি সি চারটি ড্যাম তৈরী করেছে। বিহার সরকার (অধুনা ঝাড়খন্ড) আরও একটি ড্যাম তৈরী করেছে, তবে এই জলাধারে ডিভিসির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ডিভিসির তৈরী ড্যামগুলিতে পরিকল্পনা মাফিক আয়তনের জলাধার তৈরী করা যায়নি (জমি অধিগ্রহণের অসুবিধার জন্য)। বর্তমানে ডিভিসি জলাধারগুলিতে যে জলধারণ ক্ষমতা আছে তাতে ব্যাপক অববাহিকা অঞ্চলে তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাত না হ'লে নিম্ন অববাহিকার বন্যা সম্ভাবনা কমানো সম্ভব হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জলাধারগুলিতে যখন খরিপ ও রবি/ বোরোর জল ধরা থাকে তখন হঠাৎ কোন তীক্ষ্ণ বা ব্যাপক বৃষ্টিপাত দামোদরে বন্যা আনে। জনপদ বাঁচাতে বহুদিন আগেই দামোদরের বাঁ পাড়ে নদীবাঁধ দেওয়া হয়েছে। এখন ডানদিকে দ্রুত জনপদ বাড়ছে। পঞ্চায়েত সে সব জায়গায় নদীবাঁধ দিচ্ছে। এতে করে এলাকাগত ভাবে বন্যা পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে।

৬.৪ দক্ষিণবঙ্গে দামোদরের পরেই শিলাই, কাঁসাই ও কেলেঘাই নদীগুলির ভয়ালরূপে সবাই তটস্থ থাকে। ওই নদীপথগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা ৫.৭ থেকে ৫.৯ অনুচ্ছেদে দিয়েছি। শিলাই বা শিলাবতী পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও দাসপুর এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদীর সাথে মিলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী করে। এই নদীগুলির ওপর অববাহিকা অঞ্চলের অনেকটাই পাথুরে ও যথেষ্ট খাড়াই। আর রূপনারায়ণ নদীতে এরা যেখানে মিশেছে সেই এলাকাটা তুলনামূলক ভাবে নীচু ও সমতল। ওই এলাকা মূলতঃ বন্যাভূমি বলে চিহ্নিত হলেও এলাকার অনেকটা ঘের বাঁধ দিয়ে নদীর প্রচলিত বিচরণভূমি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই বর্ষার ভরা কোটালে যখন উপর অববাহিকার এক ব্যাপক এলাকার তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাতের জল এসব এলাকায় নেমে আসে তখনই বন্যা পরিস্থিতি সুচিত হয়। রূপনারায়ণের ভরা কোটালে অবস্থাটা আরও সঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

৬.৪.১ একই কারণে কাঁসাই, কেলেঘাই নদীতে বন্যার সূচনা হয়। এই নদী উপত্যকাগুলিতেও একটা বিশাল বন্যাপ্রবণ ও অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চল বহুদিন আগে

থেকেই ঘের বাঁধ দিয়ে বসবাসের জন্য নদীর কাছ থেকে কেড়ে পাড় নেওয়া হয়েছে। এইসব ঘের বাঁধ এলাকায় বেশকিছু জমি নদীতল থেকেও নীচুতে আছে। তাই বন্যায় ওইসব এলাকায় নদীবাঁধ ভাঙ্গলে বন্যাপরিস্থিতি ভয়ালরূপ নেয়।

৭. বন্যাপ্রবণ এলাকা ঃ

৭.১ আমরা আগেই বলেছি পশ্চিমবাংলার এক ব্যাপক এলাকা বন্যাপ্রবণ। আগের অনুচ্ছেদগুলিতে তার কারণগুলি চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছি। মূল বিষয়টা হ'ল ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভৌগলিক কারণে বন্যা পশ্চিমবঙ্গের নিত্যসঙ্গী। বন্যার সময়টাও সাধারণভাবে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর। সারণী—১ এ জেলা ওয়ারী বন্যাপ্রবণ এলাকার আয়তন ও সারণী—২ তে জেলা ওয়ারী যে ব্লকগুলি এখন পর্যন্ত বন্যাপ্রবণ বলে ধরা হয় তা দেওয়া হ'ল। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও বন্যাপ্রবণ এলাকার সীমানা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী—১ : জেলাভিত্তিক বন্যাপ্রবণ এলাকা

	জেলার নাম	ভৌগোলিক আয়তন (বর্গকিমি)	জেলার বন্যাপ্রবণ এলাকা (বর্গকিমি)
১.	কোচবিহার	3387	2150
২.	জলপাইগুড়ি	6227	3250
৩.	দার্জিলিং	3149	127
৪.	উত্তরদিনাজপুর }	5358	3458
৫.	দক্ষিণ দিনাজপুর		
৬.	মালদা	3733	3150
৭.	মুর্শিদাবাদ	5324	2158
৮.	বীরভূম	4545	3182
৯.	বাঁকুড়া	6882	118
১০.	হুগলী	3149	912
১১.	হাওড়া	1467	750
১২.	মেদিনীপুরপূর্ব }	14081	4823
১৩.	মেদিনীপুর পশ্চিম		
১৪.	বর্ধমান	7024	2458
১৫.	নদীয়া	3927	3731
১৬.	পুরুলিয়া	6259	65
১৭,	উঃ দবি্বশ পরগণা }	14136	2406
১৮.	দঃ চবি্বশ পরগণা		
১৯.	কলকাতা শহর	104	–
	মোট	88752	32,738

সারণী—২ : জেলাভিত্তিক বন্যাপ্রবণ ব্লক

ক্রম	জেলার নাম	জেলার বন্যা ঃ প্রবণ ব্লক
১.	কুচবিহার	দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, খোকসা ডাঙ্গা, সিতাই, শীতলকুচি, হলদিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ কোতোয়ালী ও অন্যান্য ব্লক।
২.	জলপাইগুড়ি	আলিপুর দুয়ার, কালচিনি, কুমারগ্রাম (I/II), জয়গাঁও, বানারহাট, বীরপাড়া, মাদারিহাট, ফালাকাটা জলপাইগুড়ি
৩.	দার্জিলিং	বিধান নগর।
৪.	উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর	বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, হিলি, ইটাহার, কুশমাণ্ডি, তপন, বংশীহারি
৫.	মালদা	ইংলিশবাজার, কালিয়াচক (I/II/III) বামনগোলা, হবিবপুর, মালদা, চাঁচল (I/III), রতুয়া, হরিশচন্দ্রপুর (I/II), হবিবপুর
৬.	মুর্শিদাবাদ	কান্দি, ভরতপুর (I/II), পাঁচথুপী, বরঞা, রাণীনগর, সুতী, খেজুরী, রঘুনাথগঞ্জ, বেলডাঙ্গা (II), ডোমকল, জলঙ্গী।
৭.	বীরভূম	রামপুরহাট (I/II), নান্নুর, মহম্মদ বাজার, সাঁইথিয়া, লাভপুর
৮.	নদীয়া	করিমপুর (I/II), কালিগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, তেহট্ট (I/II), রাণাঘাট, কল্যাণী।
৯.	হুগলী	বলাগড়, চুঁচড়া, পোলবা, দাদপুর, মগরা, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা (I/II), জাঙ্গীপাড়া, তারকেশ্বর, শ্রীরামপুর, হরিপাল, ধনিয়াখালি, গোঘাট (I/II), খানাকুল (I/II), আরামবাগ ও পুড়শুড়া।
১০.	বর্ধমান	পূর্বস্থলী (I/II), মঙ্গলকোট, কালনা, আউসগ্রাম।
১১.	মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)	ঘাটাল, দাসপুর (I/II), মেদিনীপুর, পাঁশকুড়া, ডেবরা, কেশপুর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, ভগবানপুর (I), নন্দীগ্রাম, তমলুক, পটাশপুর, ময়না।
১২.	হাওড়া	উদয় নারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুর, বাগনান (I/II), আমতা
১৩.	উত্তর চব্বিশ পরগণা	বনগাঁ, স্বরূপনগর, হাবড়া, বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল।
১৪.	দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা	নামখানা, মথুরাপুর (I/II), কুলতলী ও অন্যান্য অঞ্চল।

বিঃ দ্রঃ (১) সুন্দরবন এলাকার সব দ্বীপ সামুদ্রিক ঝড় ও তুফানের শিকার, বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যখন বিভিন্ন খাঁড়িতে জোয়ারের উচ্চতা সর্বাধিক হয়।

(২) বন্যা প্রবণ ব্লকগুলিরও অত্যাধিক মাঝারি ও কম প্রবণতার ভিত্তিতে সাজান সম্ভব। সেটা স্থানীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা হলে সঠিক হবে।

৮. বন্যার আগাম সতর্কীকরণ ঃ

৮.১ আমরা পশ্চিমবাংলায় বন্যার কারণ ও পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছি, বন্যা পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আর বলাবাহুল্য যে তাকে সচেতনভাবে মোকাবিলা করার জন্য সমস্তরকম পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আগাম সতর্কতার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

৮.২ স্বাভাবিকের থেকে বেশী বৃষ্টি, বন্যার অন্যতম উপাদান। তাই বৃষ্টি নিয়ে যতবেশী আগাম সতর্কবার্তা পাওয়া যাবে ততই আমাদের সুবিধা। বর্ষাকালে আবহাওয়া দপ্তর মাঝে মাঝে আগাম সতর্ককতা দিয়ে থাকে। ওই সতর্কবার্তা যত্ন-সহকারে অনুধাবন ও বিভিন্ন নদী অববাহিকাতে তার প্রভাব কী হ'বে তারও একটা বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। তবে এটা বিশেষজ্ঞদের কাজ।

৮.৩ হুগলী নদীর জোয়ার ভাঁটার দিনক্ষণ বৎসরের প্রথমেই কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসাব করে বই আকারে সকলের সুবিধার জন্য ছাপিয়ে দেয়। এটা সবাই কিনতেও পারেন। এই বইটা থেকে যে তথ্য জানা যায় তাতে জোয়ারের দরুণ অবরুদ্ধ বন্যার জল কী গতিতে বা কত সময় ধরে সমুদ্রে নেমে যাবে তা জানা যায়।

৮.৪ কেন্দ্রীয় জল আয়োগ আর পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরের তরফে নদী উপত্যাকা ভিত্তিক কিছু আগাম সতর্কবার্তা ও কিছু বন্যাপ্রবণ নদীর প্রতিদিনের অবস্থান বুলেটিন আকারে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পাঠান হয়। সেচ দপ্তর বর্তমানে একটা ওয়েবসাইট খুলেছে—www.iwd.com– সমস্ত তথ্য বর্ষাকালে প্রতিদিনই ওখানে দেওয়া হবে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে কিছু সতর্কবার্তা দেওয়ার রীতি আছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এখানে দিচ্ছি।

৯. উত্তরবঙ্গের বন্যা সতর্কীকরণ ঃ

৯.১ উত্তরবঙ্গে বন্যার সময়টা সাধারণভাবে ১লা জুন থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত ধরা হয়। হিমালয়ে বর্ষা আগে শুরু হয় এবং আগে শেষ হয়। উত্তরবঙ্গে বন্যাগুলির মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির দিকে ১৯৬৮ সালে তিস্তার বিধ্বংসী বন্যা সতর্কীকরণের বিষয়টাতেও পরিবর্তন এনে দেয়। ওই বন্যার অভিজ্ঞতাতে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির বিপদসীমা, নদীর জলতলের পূর্বাভাষ সবই ঢেলে সাজানো হয়। এই পূর্বাভাষের মূল দায়িত্বে কেন্দ্রীয় জল আয়োগ আছেন। তাঁদের বর্তমানে ছয়টি বন্যা পূর্বাভাষ কেন্দ্র আছে। তিস্তা নদীর ওপর দোমোহানী ও মেখলিগঞ্জ, জলঢাকা নদীতে ৩১ নং জাতীয় সড়ক ও মাথাভাঙ্গার ওপর, তোর্ষা নদীর ওপর ঘুঘুমারীতে, এবং তুফানগঞ্জে রায়ডাক নদীর ওপর। এই কেন্দ্রগুলি থেকে উপর অববাহিকার বৃষ্টিপাত ও নদীর জলতলের উচ্চতার উপর নির্ভর করে নদীগুলি কতটা উচ্চতায় প্রবাহিত হবে নির্দ্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক তার একটি পূর্বাভাষ দেওয়া হয়। এই পূর্বাভাষ কেন্দ্রীয় জল আয়োগ বিভিন্ন সরকারী সংস্থা বিশেষ করে সেচ দপ্তর ও জেলা কর্তৃপক্ষকে পৌঁছে দেয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে বন্যা সংক্রান্ত সমস্ত সাবধানতা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সতর্কবার্তার জন্য বন্যাপ্রবণ এলাকার দুটি প্রধান ভাগ। (১) সংরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ যে সব জায়গায় নদীবাঁধ দিয়ে বন্যার জলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। (২) অসংরক্ষিত

বা যে সব এলাকায় নদী আপনগতিতে প্রবাহিত হ'তে পারে। এবার সেচ দপ্তর কেন্দ্রীয় জল আয়োগের ও নিজস্ব সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আগাম বিপদ সংকেত জারি করে। সংরক্ষিত এলাকার জন্য তিনটি সংকেত যথা হলুদ, অ্যাম্বার ও লাল। আর সংরক্ষিত এলাকার জন্য দুটি সংকেত হলুদ ও লাল। জমির গঠনের প্রাকৃতিক কারণে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির বন্যা অত্যন্ত খরস্রোতা ও ক্ষণস্থায়ী হয়। হঠাৎ করে পাহাড় থেকে ছুটে এসে সবকিছু লন্ডভন্ড করে দেয়। এদের প্রভাব বড়জোর ২ থেকে ৩ দিন স্থায়ী হ'তে দেখা যায়। কখনও এই স্রোতের বেগ এতই প্রবল হয় যে ১ (এক) টন ওজনের কংক্রীট চাঙরকে হেলায় তুলে বহুদূরে নিয়ে যায়। তাই দ্রুততার সঙ্গে আগাম খবর করতে সিগন্যাল বা সংকেত পদ্ধতির চলন। এলাকাগত ভাবে সাধারণ মানুষ এই সংকেতগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন। সমস্ত ক্ষেত্রে হলুদ সংকেতের অর্থ হ'ল বন্যা পরিস্থিতি যে কোন সময়ে তৈরী হ'তে পারে। তাই সবাইকে সেই ভাবে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাতে হবে। এাম্বার সংকেত (সংরক্ষিত এলাকার জন্য) সেচ দপ্তরের কর্মীদের বন্যা সম্বন্ধে আগাম সতর্ক করে দেওয়া। লাল সংকেত হল প্রশাসনের জন্য এলাকা ও পরিস্থিতি নির্ভর জনপদ সরানো বা মানুষকে মহল্লা মহল্লায় (ঘোষণার মাধ্যমে) আগাম সতর্ক করে দেওয়া। লাল সংকেতের সময় সেচ কর্মীদের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমস্ত রকম প্রস্তুতি নিয়ে থাকার নির্দেশ।

৯.২ উত্তরবঙ্গে নদীর জলতল ও বন্যার আগাম সতর্কবার্তা সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করার জন্য কেন্দ্রীয় জল আয়োগ ও সেচ দপ্তর তাঁদের নিজ নিজ বেতার তরঙ্গে আর. টি. মারফৎ নিজ নিজ কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে বা জেলার সভাধিপতি ও জেলাশাসককে টেলিফোনের মাধ্যমে খবরাখবর দেন। টেলিফোন ব্যবস্থার বিপর্যয় হ'লে অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ হয়।

১০. মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গে বন্যা সতর্কীকরণ ঃ

১০.১ ঝাড়খন্ডের মালভূমি থেকে নেমে আসা নদীগুলির দৈর্ঘ্যে বেশ কিছুটাতে তীক্ষ্ণ ঢাল আছে। বন্যার ঢল তাই দ্রুততার সঙ্গে নামে তবে তা হুগলী নদীতে পৌঁছে দাঁড়িয়ে যায়, যদি হুগলী নদীতে সেই ঢল তখনই বয়ে নেওয়ার ক্ষমতা না থাকে। মূলতঃ এই কারণেই মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গে বন্যা সতর্কবার্তা সিগন্যাল বা সংকেতের বদলে নদী কতটা উঁচুতে বন্যার সময় বয়ে চলে তার সাহায্যে প্রচার করা হয়। বহুদিন পর্যবেক্ষণে প্রতিটি নদীর বন্যাপ্রবণ এলাকার সঙ্গে বর্ষায় নদী জলতল উচ্চতার একটা যোগসূত্র আছে। তাই ওই সময় একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাপকাঠির সাহায্যে প্রতিদিন একটা নির্বাচিত সময়ে নদী প্রবাহের উচ্চতা নিরীক্ষণ করা হয়। ওই উচ্চতার ওপর ভিত্তি করে সতর্কবার্তা প্রচারিত হয়। নদীর জলতলের সতর্ক সীমা তিনটি। প্রথম হ'ল প্রারম্ভিক বিপদসীমা। দ্বিতীয় হল বিপদসীমা ও সবশেষে চরম বিপদসীমা। প্রারম্ভিক বিপদসীমায় নদীজলতল তার তীর সংলগ্ন জমি থেকে নীচুতেই থাকে। নদীর বিপদসীমা তখনই ছুঁয়ে যায় যখন নদী তার দুকূল ছাপিয়ে তার তীরের জমির ওপর দিয়ে বইতে থাকে। ওই বিপদসীমা প্রারম্ভিক বিপদসীমা থেকে দুই ফুট উঁচুতে রাখা হয়। আর চরম বিপদসীমা হ'ল নদী বিপদসীমা থেকেও দুই ফুট উঁচুতে

বইতে থাকে। বন্যা প্রতিরোধে যে সব এলাকায় নদীবাঁধ দেওয়া হয়েছে সে সব এলাকায় নদী বাঁধগুলির সঙ্গে নদীর বিপদসীমা রেখার একটা সম্পর্ক আছে। ওই সব জায়গায় চরম বিপদ সীমায় নদী তার বাঁধের সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে সাধারণভাবে তিনফুট নীচুতে থাকে। তবে তিনফুট মাপটা কমবেশি হয় এবং তার একটা নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক বর্ষায় নদীর জলপ্রবাহের পরিমাপের সঙ্গে যুক্ত। সেচ দপ্তর প্রতিদিন সকাল আটটার মধ্যে বিভিন্ন নদীর জলতলের অবস্থা নিরীক্ষণ করে। সেই তথ্য বিকালের মধ্যে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে সংবাদ বুলেটিনের মধ্যদিয়ে জানানো হয়। উত্তরবঙ্গের মতই আর. টি. তে নিজেদের মধ্যে (সেচ দপ্তর) খবর আদান-প্রদান ও টেলিফোনে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

১০.২. আমরা ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার নদী উপত্যকাগুলিতে কোথায় কটা জলাধার বা ড্যাম তৈরী হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছি। ওই জলাধারগুলি থেকে বর্ষাকালে কিভাবে ও কেন জলছাড়া হয় তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ড্যাম আছে ডি ভি সি তে। ওই ড্যামগুলির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় জল আয়োগের হাতে। বর্ষায় ওই ড্যামগুলি থেকে জল ছাড়ার আগে ওই সংস্থা সংশ্লিষ্ট সকলকে আগাম সংবাদ দেয়। দুর্গাপুর ব্যারেজ দিয়ে সাধারণত পঞ্চাশ হাজার কিউসেকের বেশী জল প্রবাহিত হলে তা সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ করে দূরদর্শন ও রেডিওতে সম্প্রচার করা হয়। একইভাবে কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী ড্যাম থেকে জল ছাড়া হলে প্রশাসনিক স্তরে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো হয়। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওই সংবাদ দূরদর্শন ও রেডিও মারফত প্রচারেরও ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত খবর প্রতিদিন বিকালে সেচদপ্তরে নিজস্ব ওয়েবসাইটে www.iwd.com পাওয়া যাবে (বর্ষাকালে)।

১১. উপসংহার ঃ

সাম্প্রতিক বন্যা ভাবনা আগাম প্রচারে এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিবরণের মধ্যেই যেন সমাধান সূত্রের খোঁজ পাওয়া যাবে। আরও একটা ধারণার জন্ম হচ্ছে যেন পশ্চিমবাংলার বন্যা সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। কিন্তু এই দুটি ধারণাই আংশিক সত্য। তবে এরই মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের ও শুভদিকটা হল আজকাল অনেকগুলি বেসরকারী সংস্থা বন্যার বিষয়টা নিয়ে এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁরা বন্যা সমস্যা মোকাবিলায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের কর্মসূচীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বদলে বন্যাজনিত দুর্গতি দূর করা ও ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করার ওপরই জোর দেওয়া হ'চ্ছে। সরকারী ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারী প্রয়াস যদি একে অপরের পরিপূরক ও সাযুজ্য থাকে তবে পশ্চিমবাংলায় বন্যাজনিত সমস্যার সঠিক সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে।

সূত্র ঃ চন্দন রায়

চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সেচ দপ্তর, পঃ বঃ সরকার)/(৩১.৩.২০০২)

পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক বিবরণ						
ক্রমিক নং	জেলা	আয়তন কিমি	জনসংখ্যা-২০০১			জন ঘনত্ব
			মোট	পুরুষ	নারী	
	পঃ বঙ্গ	৮৮৭৫২	৮০২২১১৭২	৪১৪৮৭৬৯৪	৩৮৭৩৩৪৭৭	৯০৪ বর্গ কিমি
১।	দার্জিলিং	৩১৪৯	১৬০৫৯০০	৮২৬৩৩৪	৭৭৯৫৬৬	৫১০ বর্গ কিমি
২।	জলপাইগুড়ি*	৬১২৭	৩৪০৩২০৪	১৭৫৩২৭৮	১৬৪৯৯২৬	৫৪৭ বর্গ কিমি
৩।	কোচবিহার*	৩৩৮৭	২৪৭২২৮০	১২৭১৭১৫	১২০০৫৩৫	৭৩২ বর্গ কিমি
৪।	উত্তর দিনাজপুর*	৩১৪০	১২৬০৭৪৭	১১৮১০৭৭	৩৪০০	৭৭৮ বর্গ কিমি
৫।	দক্ষিণ দিনাজপুর*	২২১৯	১৫০২৬৪৭	৭৭০৪৪৩	৭৩২০৪	৬৭৭ বর্গ কিমি
৬।	মালদহ*	৩৭৩৩	৩২৯০১৬০	১৬৮৯৪০৯	১৬০০৭৫১	৮৮১ বর্গ কিমি
৭।	মুর্শিদাবাদ*	৫৩২৪	৫৮৬৩৭১৭	৩০০৪৩৮৫	২৮৫৯৩৩২	১১০১ বর্গ কিমি
৮।	বীরভূম*	৪৫৪৫	৩০১২৫৪৬	১৫৪৫৭৬৫	১৪৬৬৭৮১	৬৬৩ বর্গ কিমি
৯।	বর্দ্ধমান*	৭০২৪	৬৯১৯৬৯৮	৩৬০২৬৭৫	৩৩১৭০২৩	৯৩৫ বর্গ কিমি
১০।	নদীয়া*	৩৯২৭	৪৬০৩৭৫৬	২৩৬৫০৫৪	২২৩৮৭০২	১১৭২ বর্গ কিমি
১১।	উত্তর ২৪পরগণা*	৪০৯৪	৮৯৩০২৯৫	৪৬৩৫২৬২	৪২৯৫০৩৩	২১৪১ বর্গ কিমি
১২।	হুগলী*	৩১৪৯	৫০৪০০৪৭	২৫৮৮৩২২	২৪৫১৭২৫	১৬০১ বর্গ কিমি
১৩।	বাঁকুড়া	৬৮৮২	৩১৯৪৮২২	১৬৩৪৬৬১	১৫৫৭২৬১	৪৬৪ বর্গ কিমি
১৪।	পুরুলিয়া	৬২৫৯	২৫৩৫২৩৩	১২৯৮০৭৯	১২৩৭১৫৪	৪০৫ বর্গ কিমি
১৫।	মেদিনীপুর*	১৪০৮১	৯৬৩৮৪৭৩	৪৯২৯০০০	৪৭০৯৪৭৩	৬৮৫ বর্গ কিমি
১৬।	হাওড়া*	১৪৬৭	৪২৭৪০১০	২২৪২৩৯৫	২০৩১৬১৫	২৯১৬ বর্গ কিমি
১৭।	কলকাতা	১৮৫	৪৫৮০৫৪৪	২৫২০৬০২৯	২০৭৪৫১৫	২৪৭৬০ বর্গ কিমি
১৮।	দক্ষিণ ২৪পরগণা*	৯৯৬০	৬৯০৯০১৫	৩৫৬৪২৪১	৩৩৪৪৭৭৪	৬৯৪ বর্গ কিমি

*বন্যাপ্রবণ জেলা।

খরা
(Drought)

কোন অঞ্চলের জল অথবা আর্দ্রতা সাময়িক ভাবে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কমে গেলে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাত কম হলে বা সেচের জলের যোগান না থাকলেও ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফসল বা ঘাস জন্মাবার প্রয়োজনীয় জল না থাকলেও তেমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তেমনি নির্দিষ্ট অঞ্চলে গাছপালা সৃষ্টি হলে বা সৃষ্টি করলে আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটে এবং আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত জলাভাবের জন্যই খরার সৃষ্টি হয়।

খরা প্রধানতঃ তিন ধরণের। সেগুলি হল ঃ **আবহাওয়া ঘটিত, জল সংক্রান্ত ও কৃষি সংশ্লিষ্ট।**

আবহাওয়া ঘটিত ঃ কোন অঞ্চলে সেখানকার বহুদিনের গড় বৃষ্টিপাত যথেষ্ট পরিমাণে বেশ কিছুদিন (মাস, ঋতু বা বছর) না হলে খরা সৃষ্টি হয়।

জল সংক্রান্ত ঃ নির্দিষ্ট সময়ে জলের উৎসে (নদী, ঝর্ণা, জলাশয় বা ভূগর্ভ) জলের পরিমাণ কমে যাওয়া।

কৃষি সংশ্লিষ্ট ঃ আবহাওয়া ঘটিত/জল সংক্রান্ত কারণে ফসলের উপরের প্রভাব।

তিন ধরণের খরাই কার্যত আলাদা।

বৃষ্টিপাত ঃ ভারতীয় উপ-মহাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০০ মি মি ও এই জল অন্য দেশের তুলনায় পরিমাণে যথেষ্ট ভাল। কিন্তু সমস্যাটা হল তার বন্টনের। কারণ সর্বত্র সে বৃষ্টি সমান ভাবে পড়ে না। চেরাপুঞ্জিতে বার্ষিক ১০ হাজার মিমি। পশ্চিমঘাট অঞ্চলে ৮৫০০ মিমি। আবার পশ্চিম রাজস্থান ও গুজরাট তার পরিমাণ মাত্র ২০০ থেকে ২৫০ মিমি।

যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় তার ১ শতাংশ মাটিতে শুষে যায়। ৯৯ ভাগ বয়ে যায় নিচের দিকে। তবে, এর কিছুটা আবার বাষ্পিভূত হয় বা গাছপালা শুষে নেয়। দেশের ৩৩ শতাংশ অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত (৭৫০ মিমি) হয়। মধ্যম মানে (৭৫১ থেকে ১১২৫ মিমি) হয় ৩৫% জায়গায়। বেশি বৃষ্টিপাত (১১২৫-২০০০ মিমি) হয় ২৪% জায়গায়। আর খুব বেশি বৃষ্টিপাত (২০০০ মিমির বেশি) হয় মাত্র ৮% জায়গায়।

এইভাবে অসম বৃষ্টিপাতের ফলে ৬৮% জায়গায় কোন না কোন অংশে কোন না কোন সময় খরা দেখা দেয়। ফলে অধিকাংশ রাজ্যই খরা এবং বন্যা দুরকম অবস্থার মধ্যেই পড়ে। যেমন ১৯৯৩ সালে নেপাল থেকে আসা বন্যার জলে বিহারে বন্যা দেখা দেয়। আর স্থানীয় ভাবে বৃষ্টি কম হওয়ায় সেখানেই খরাও দেখা দেয়। আবার ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমিবায়ু না আসায় ভারতের বিরাট অঞ্চলে খরা দেখা দেয়।

খরা ব্যবস্থাপনা (Drought Management) : খরা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথমেই কী কী অবস্থার জন্য খরা হতে পারে সে বিষয়ে ধারণা করা দরকার। আর তারপরে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার রণকৌশল মূলত ত্রিস্তরের।

১। নিবিড়ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে খরা হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, এ বিষয়ে আগাম জানবার ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে।

২। খরা দেখা দিতেই ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে গরু-মোষগুলিকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে এ ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিতে হবে।

৩। বিকল্প ফসল চাষের জন্য সুদূর প্রসারী ব্যবস্থা নিতে হবে। দেখতে হবে কী করলে বিধ্বস্ত খরিফ ফসলের বিকল্প হিসবে রবি ফসল কতটা বেশি উৎপন্ন করা যায়।

খরার সম্ভাবনা অনুমান করার বিষয়টি একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। তাই আমাদের নির্ভর করতে হয় বর্ষার হালচালের ওপর। এ বিষয়ে ১৯৮৮ সালে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে আবহাওয়া ও সমুদ্রের অবস্থা নিয়ে পূর্বাভাসের চেষ্টা করা হয়েছে। এই দুটি দিকের ওপরই বর্ষা নির্ভর করে।

আগে থেকে হুসিয়ারি জানানো এবং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার অর্থাৎ খরা মোকাবিলার জন্য কৃষি দপ্তর একটি "ওয়েদার-ওয়াচ-গ্রুপ" গঠন করেছে। তাছাড়া কৃষি ও সমবায় দপ্তরের জন্য মহাকাশ দপ্তর ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচারাল ড্রাট অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (NADAMS) স্থাপন করেছে।

গুজরাট একটি খরাপ্রবণ রাজ্য। সেখানে আবহাওয়া দপ্তরের সহযোগিতায় সারা রাজ্যের দৈনিক আবহাওয়ার খবর নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে বৃষ্টির সম্ভাবনা বা সম্ভাব্যতা বিচার করা হয়ে থাকে এবং সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিকল্প ফসল (Alternative Crops) : খরা খারিফ মরশুমের বর্ষা নির্ভর ফসল নষ্ট হবার পরে সবদিক থেকে চেষ্টা করতে হবে যাতে রবি মরশুমের ফসলের ভাল ফলন হয়। চাষের প্রয়োজনীয় জল যতটা বেশি দেওয়া যায় তার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বাঁধ ও ভূগর্ভের জল যাতে বেশি পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে উন্নত বীজ ও সারের ব্যবস্থা করতে হবে। জল, সার ও বীজের জন্য কৃষকরা যাতে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার সে বিষয়ে একটি জাতীয়নীতিও ঘোষনা করেছে।

কর্ম সংস্থান সৃষ্টি (Employment generation) : খরা পরিস্থিতিতে আরও তিনটি বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। সেগুলি হল কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি, পানীয় জল ও গবাদি পশুর খাদ্য। খরায় এই তিনটি বিষয়ই যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। খরার জন্য সরকারি বরাদ্দ অর্থের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ শুধু এই জন্যই ব্যয় করা হত। খরার জন্য চাষ বন্ধ থাকায় কর্মহীনতা ভীষণ ভাবে বেড়ে যায়। রাজীব গান্ধী ন্যাশান্যাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মিশনের হিসাব অনুসারে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে থাকে। এই জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। আর খরার সময় শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হতে হবে। কারণ, ঐ সময় তারা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়েন।

খরা চলার সময় এবং তার পরে গবাদি পশুর খাদ্যের খুবই অভাব সৃষ্টি হয়। ১৯৮৭ সালে দেশের ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খরা দেখা দিয়েছিল। তখনকার ২১ কোটি ৪০ লক্ষ গবাদি পশুর ১২ কোটি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। একথা মনে রেখেই পশুখাদ্যের যোগান বাড়ানো, ঘাসের চাষ বাড়ানো এবং অন্য জায়গা থেকে যোগান বাড়ানোর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সূত্র ঃ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের ম্যানুয়াল

আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি ঃ (Moonsoon behaviour) ঃ খরার প্রধান কারণ হ'ল বৃষ্টিপাত হীনতা, তাই মনসুন কেমন হচ্ছে তা জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে লক্ষ্যরাখা জরুরী। তাছাড়া অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির "সাহায্যে আকাশে মেঘের বা বৃষ্টির অবস্থান জানা যায়। সুসংহত পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মধ্যে দিয়া যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিরাময়ে যথেষ্ট উপযোগী। তাছাড়া উপগ্রহ ব্যবস্থার মাধ্যমে রিজার্ভ হিসাবে সঞ্চিত জলের অবস্থান জানা, জানানো ও তার সঠিক ব্যবহার খরা মোকাবিলায় বিশেষ উপযোগী।

জল সংরক্ষণ (Water Conservation) ঃ জল ব্যবহারে সঠিক সিদ্ধান্ত যেমন খরার সময় চাষের ধরণ নির্দ্ধারণ, সঠিক ব্যবহার (যাতে বাস্প হয়ে যাবার সম্ভাবনা কম), কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও প্রয়োজনে মানুষ ও প্রাণীদের জন্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

জল ও খাদ্য সরবরাহ (Water & Food Supply) ঃ খরা মোকাবিলায় সবক্ষেত্রে খরাকে আগে চিহ্নিতকরণ বিশেষ জরুরী। অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত খরার মাপকাঠি না থাকার খরা ঘোষণাতে দেরি হয়। তাই সঠিক মাপকাঠি নিরুপণ ও ঘোষণা বিশেষ জরুরী। খরার সময় জল ও খাদ্যের অভাব কি ভাবে মোকাবিলা করা যায় তা সবার আগে দেখা উচিত। তাতে মানুষ ও প্রাণীর প্রাণ বাঁচে ও সম্পদহানী কম হয়।

পুষ্টির যোগান (Nutritional Security) ঃ ভারত সরকরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ICDS প্রকল্পের মাধ্যমে বা অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যের যোগান খরা কবলগ্রস্থ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যায় তা সুনিশ্চিত করা। তাছাড়া জেলাস্তরে ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই ব্যবস্থা করার সুবিধা আছে কিনা দেখা। তাছাড়া স্বাভাবিক সময়ে মানুষের 'পুষ্টির মান কিভাবে বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা।

প্রাণী সম্পদের রক্ষা (Cattle Protection) ঃ খরার কবলে মানুষ পশু আক্রান্ত হয়। মানুষ কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে গেলেও গৃহপালিত পশুর পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই সর্বত্র গৃহপালিত পশুকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদের খাদ্য, পানীয় ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। পরবর্তীকালে তারাও সম্পদ সৃষ্টির কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে।

পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ ঃ খরা প্রবণ অঞ্চলে জমিতে ঘাস বা ছোট ছোট গাছ-পালা কম থাকে। গ্রীষ্মকালে তার পরিমাণ আরও কমে। এই মাঠে যদি অধিক পরিমাণে পশুচারণ

করা হয় তা হলে মাটিতে ঘাস বা গাছপালার সংখ্যা ভীষণ ভাবে কমে যাবে বা লুপ্ত হয়ে যাবে। ফল স্বরূপ বৃষ্টির জলে অধিক পরিমাণে মাটি ধুয়ে নিয়ে যাবে যা খরা পরিস্থিতিকে বাড়িয়ে দেবে।

জলের গতি নিয়ন্ত্রণ (Run off management) ঃ বৃষ্টির জল যাতে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ধরে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। তারজন্য পুকুর বা খাল বিল খনন ও মরুরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী কাজ হইতে দেওয়া। বিশেষ করে খরার সময় পুকুর খনন নির্দিষ্ট এলাকার মানুষদের মধ্যে কাজের সুযোগ করে দেয় যা খরা মোকাবিলায় বিশেষ সহায়ক।

জলবিভাজিকা প্রকল্প (Water Shade) ঃ স্বাভাবিক নিয়মে জল উপর থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয় এবং নীচের দিকে গিয়ে জমা হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় নির্দিষ্ট ড্রেনের মাধ্যমে। জলবিভাজিকার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবাহে জল কে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা এবং বিজ্ঞান সম্মত ভাবে জলকে উন্নয়ণমুখী ও সম্পদ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা যেমন চাষের কাজ, শস্য সৃষ্টি, খরার জলের ব্যবহার মাটির নীচে জলের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

যে সকল অঞ্চল খরাপ্রবণ সেখানে এই ধরণের জল বিভাজিকা বিশেষ উপকারী কারণ তার ফলে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যায়।

১) মাটিতে জলের ভাগ বৃদ্ধি করা যা চাষের বা গাছপালা জন্মাতে বিশেষ কাজে লাগে।

২) বৃষ্টি জলের সর্বাধিক ব্যবহার যা মাটির জলের ভাগ বৃদ্ধি করে ও জলস্তর ধরে রাখে।

৩) অনাবাদী জমিকে চাষ যোগ্য করে তোলা যায়। যা গাছ পালা, বনসৃজন পক্ষপালন করার কাজকে উৎসাহিত করে।

৪) স্থানীয় মানব সম্পদের উন্নয়ণ বা স্থানীয় ভাবে SHG গঠন করার সুবিধা হয়ে থাকে।

৫) স্থানীয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা।

জনচেতনা বৃদ্ধি (Awareness) ঃ খরা মোকাবিলায় সর্বস্তরে সমন্বয় ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিভিন্ন ভাবে মানুষ, গোষ্ঠী, NGO, CBOs দের খরা মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ মানুষকে খরা পরিস্থিতি কি ভাবে মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে।

গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত ভারত সারা বিশ্বের খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলির অন্যতম। খরা হল, ভূমিতে জলাভাব। মিশরের নীলনদ প্রবাহিত হয়েছে মরুপ্রবণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। তাই তার অববাহিকা খরা প্রবণ নয়। তেমনি ভারতের রাজস্থানের মরুভূমিরও একাংশ বিগত কয়েক বছরে হয়েছে শস্য শ্যামলা। তার প্রধান কারণ হল ঐ অঞ্চলে খাল কেটে জল আনা হয়েছে নদী ও বাঁধ থেকে এবং বিপুল সংখ্যক গাছ লাগিয়ে। তেমনি আবার বন নিধনের ফলে, এই ভারতেরই বহু অঞ্চল খরাপ্রবণ অঞ্চলে পর্যবসিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও বিপদের সম্ভাবনা ও বিপর্যয় স্তরে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারত মূলত বর্ষা নির্ভর দেশ। কাজেই কোন অঞ্চলে বেশ কিছুকাল ধরে বৃষ্টি কম হলে খরার সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা কমে গেলে বৃষ্টি

ততটা কম না হলেও খরা দেখা দেয়। তাছাড়া জল ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে বর্ষার বাড়তি জল ধরে রেখে ও পরে শুখা মরশুমে সরবরাহের ব্যবস্থা না করা, বন নিধন, বেহিসেবী শিল্প স্থাপন ও মাটির উপরে ও তলাকার জলের যথেচ্ছ অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে খরা দেখা দেয়। এর সূচনা ও অবদান এত ধীর গতিতে হয় যে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই কঠিন। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক বছর খরা হতে পারে এবং পরের বছর তার অবসান হতে পারে। আবার তা কয়েক বছর ধরেও চলতে পারে। যেমন ইথিওপিয়াসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে কয়েক বছর ধরে খরা চলতে থাকায় হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগ করেছে। অন্যদিকে এর প্রভাব চলতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে। মানুষ ও সমাজের জন্য ঐ খরা পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে।

খরা ভারতে এক নৈমিত্যিক ব্যাপার। দেশের অন্তত ২৮ ভাগ অঞ্চল খরাপ্রবণ। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে গড়ে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর খরা কবলিত হয়েছে।

ভারতে খরার কারণ (Causes of drought in India) ঃ

ভারতে খরার প্রধান কারণ হল দেরীতে বর্ষা অথবা গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভীষণ ভাবে কমে যাওয়া অথবা কোন নির্দিষ্ট বর্ষার সময়ে আদৌ বর্ষা না হওয়া। তাছাড়া বন নিধন, ভূমিক্ষয়, প্রান্তিক ও বনাঞ্চলে কৃষির বিস্তার, জলস্তর নেমে যাওয়া নির্দিষ্ট অঞ্চলে সরাসরি খরাকে সাহায্য করে থাকে।

দেশের চাষযোগ্য জমির ৬৮ শতাংশ খরাপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। ভারত সরকারের হিসাব অনুসারে ১৯৫১ থেকে ১৯৯০ এই ৩০ বছরে খরা উপদ্রুত বছরগুলির হিসেব নিচে দেওয়া হল।

অঞ্চল	১৯৫১-৬০	১৯৬১-৭০	১৯৭১-৮০	১৯৮১-৯০	মোট বছর
বিহার মালভূমি	০	১	১	৫	৭
বিহার সমতল	২	১	১	৪	৮
পশ্চিম রাজস্থান	১	৩	৩	৭	১৪
গুজরাট	৩	১	২	৫	১১
সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ	১	২	২	৫	১০
মারাঠাওয়াড়া	০	০	২	৩	৫
ওড়িষা	২	২	৫	৬	১৬

এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি খরা হয়েছে ওড়িষায় এবং তারপরেই রাজস্থান। ওড়িষার কালাহান্ডি জেলাতো ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের একাংশও খরা প্রবণ।

সূত্র ঃ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের ম্যানুয়্যাল

ভূমিক্ষয়/ধস
(Land Erosion/Slide)

জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংসকারী বিপজ্জনক প্রাকৃতিক অবস্থাগুলির মধ্যে ধস এক ব্যতিক্রমী ও ভয়ানক ঘটনা। হিমালয় পর্বত শৃঙ্গগুলি বিশ্বের তাবৎ পর্বত শৃঙ্গের মধ্যে তরুণতর। অর্থাৎ এই শিলাস্তুপের সৃষ্টি হয়েছে তুলনামূলকভাবে দেরীতে। অন্যদিকে এগুলি রয়েছে বিশাল অঞ্চল জুড়ে। এর দৈর্ঘ প্রায় ২৪০০ কিমি ও প্রস্থে ৩৪০ কিমি। এই অঞ্চলের পাথর ভঙ্গুর এবং ভূকম্পনপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে থাকায় বারবার কম্পন হওয়ায় সেখানকার পাথর শক্ত হবার সুযোগ পায়নি। এর ফলে পাথরগুলি উঁচু জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। ফলে ঐ অঞ্চলে ৪৫ হাজার কিমি সড়ক চালু রাখা এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এর প্রধান কারণ হল ধস নামার ফলে সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়া।

অন্যদিকে ধস নামার ফলে ঐ অঞ্চলের গাছপালা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে নিচু এলাকার জীবন ও সম্পদের হানি হয় ধস চাপা পড়ে। আর ঐ ভঙ্গুর শিলা ঐ অঞ্চল থেকে উৎপন্ন ঝর্ণা বাহিত হয়ে নদীগুলিতে পলি জমায় সহায়ক হয়। আর তার ফলে নদীগুলি নাব্যতা হারায় এবং নিম্ন অববাহিকায় বন্যার কারণ হয়ে পড়ে।

পর্বতাঞ্চলের ঐ ধরনের ধস ছাড়াও অন্য এক ধরনের ধস পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। তা হল রানীগঞ্জের কয়লা খানি অঞ্চলের ধস। মাটির তলা থেকে কয়লা তুলে নেবার পরে খনিগুলি বালি দিয়ে ভরাট করার বিধি থাকলেও তা সব সময় কার্যকর হয় না। ফলে ঐ অঞ্চলের বিশাল এলাকা ধসপ্রবণ হয়ে পড়েছে। মাঝে মধ্যেই সেখানে ফসলের ক্ষেত, বাড়িঘর এবং সড়ক সহ জনবহুল অঞ্চল হঠাৎ করে বসে যায়। এই ধরনের ধসে প্রাণহানির সম্ভাবনা কম থাকলেও সম্পদ হানি নৈমিত্তিক ঘটনা। এর ফলে ভবিষ্যতে ঐ সব অঞ্চলে ফসল বা আবাসনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যাবে।

হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতি বছরই ধসের ফলে সড়ক পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায় এবং পাহাড়ী ধসে ঢাল অঞ্চলের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়।

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে গুরুতর ধস দেখা গিয়েছিল ১৯৯৮ সালের ১১ ও ১৭ আগষ্ট। উত্তরাখন্ডের (উত্তর প্রদেশ) খালপা অঞ্চলের ঐ ধসে ৩৮০ জন লোক মারা যায় এবং সমগ্র গ্রামটি কার্যত লোপ পেয়ে যায়। তিব্বতের মানস সরোবরগামী তীর্থযাত্রীদের ৬০ জন মারা যায়।

হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ধস প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত।

ধসের কারণ (Causes of Land Slides) ঃ

ভূপৃষ্ঠের কারণ সমূহ ঃ

১। দুর্বল, অল্পেতেই পড়ে যায় অথবা ভঙ্গুর স্তর

২। প্রতিকূল ভূকাঠামো

৩। বাহ্যিক গঠনের ভিন্নতা

ভূগঠনগত কারণ সমূহ ঃ

১। ভূপৃষ্ঠের উর্দ্ধগমন - (আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ, ভূস্তরের কাঠামোগত বদল)

২। বাতাস বা জলস্রোতে ক্ষয়

৩। ব্যবহারে ক্ষয়

৪। ঢাল অঞ্চলের উপরে বেশি ভার চাপানো (বাড়ি বা বাঁধ তৈরি)

৫। বনাঞ্চলে গাছ-কাটা বা দাবানলে পুড়ে যাওয়া

বাহ্যিক কারণ সমূহ ঃ

১। দীর্ঘস্থায়ী পলি জমা,

২। দ্রুত ঢাল বেয়ে অবনমন

৩। ভূকম্পন

৪। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ

৫। বরফ গলে নেমে আসা জল

৬। সঙ্কোচন ও প্রসারণ

৭। প্রাকৃতিক জলাধারের চাপ

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ সমূহ ঃ

১। ঢালের নিচের দিকে খনন।

২। ঢালের উপরিভাগে ভারি বস্তু স্থাপন

৩। জলাধার

৪। বন নিধন

৫। সেচের ব্যবস্থা

৬। খনিজ উত্তোলন

৭। কৃত্রিম কম্পন সৃষ্টি

৮। জলাধার ও তা থেকে জল চুঁইয়ে পড়া

ধসপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে ধস নিবারণে সাবধানতা হিসাবে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সেগুলি হল ঃ

১। নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার

২। সঠিকভাবে ভূমি সদ্ব্যবহার

৩। ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চলে নতুন করে বনসৃজন

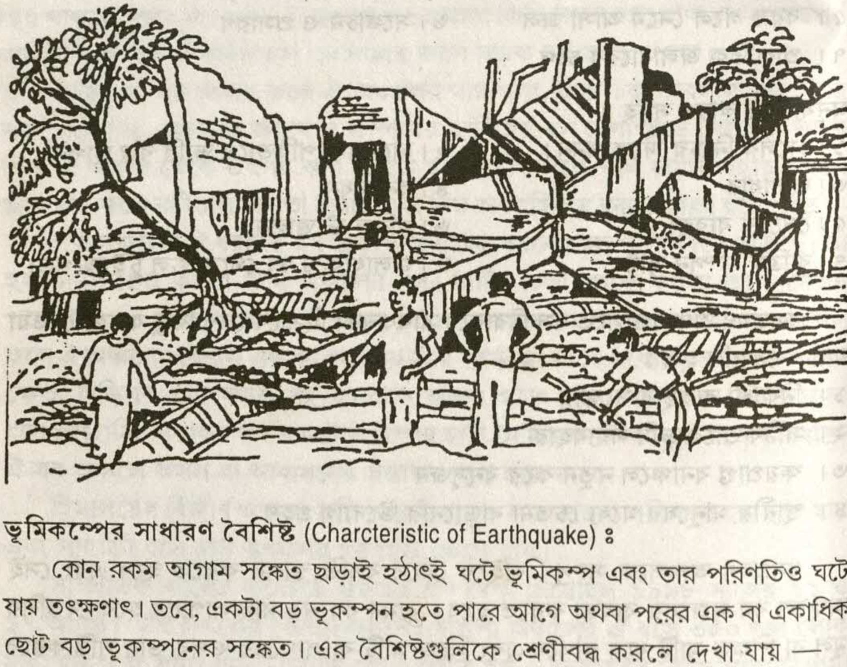
৪। স্থানীয় মানুষের মধ্যে চেতনা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ

ধসপ্রবণ অঞ্চলকে সম্পূর্ণ বাইরে রেখে বসতি স্থাপন করতে হবে এবং সেই অঞ্চলে বন সৃজনের ব্যবস্থা করতে হবে। এমন ধরনের গাছ লাগাতে হবে যেগুলির মূল বা শিকড় মাটি ধরে রাখবে এবং নিজে মাটি বা পাথরের ওপর ভার সৃষ্টি করবে না।

ভূমিকম্প
(Earth quake)

ভূমিকম্পনকে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। হঠাৎ অথবা কোন আগাম হুঁসিয়ারি না দিয়েই তার আবির্ভাব ঘটে এবং মুহূর্তেই তার পরিণতি ঘটে যায়। তার ফলে কার্যত এর কোন পূর্ব প্রস্তুতির অবকাশ থাকে না।

ভূমিকম্প হয়ে থাকে ভূস্তরের উপরের দিকে ও পাশাপাশি কম্পনের জন্য। এটা হয় ভূস্তরের স্থান চ্যুতি বা আগ্নেয়গিরির অগ্নিউৎপাতের ফলে।



ভূমিকম্পের সাধারণ বৈশিষ্ট (Charcteristic of Earthquake) ঃ

কোন রকম আগাম সঙ্কেত ছাড়াই হঠাৎই ঘটে ভূমিকম্প এবং তার পরিণতিও ঘটে যায় তৎক্ষণাৎ। তবে, একটা বড় ভূকম্পন হতে পারে আগে অথবা পরের এক বা একাধিক ছোট বড় ভূকম্পনের সঙ্কেত। এর বৈশিষ্টগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করলে দেখা যায় —

- এখন পর্যন্ত ভূমিকম্পের গভীরতা, সময় ও স্থান সম্পর্কে কোন পূর্বানুমান করা সম্ভব হয়নি।
- আঘাত হয় সাধারণত হঠাৎ।
- ভূস্তরের বৈশিষ্ট ও আগেকার ঘটনাবলীর ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা যায়।
- ভূস্তরের গতিবিধি ও ভাঙ্গন অথবা ভূগর্ভের শিলাস্তরের স্থান চ্যুতির জন্যই বড় ধরনের পরিণাম ঘটে। এর স্বাভাবিক পরিণতি হল উপরের বাড়িঘর ও কাঠামো ভেঙ্গে পড়া এবং তার ফলে প্রাণহানি।

- সারা পৃথিবীতে গড়ে প্রতিবছর ১৮০০০ লোকের মৃত্যু হয় ভূমিকম্পের জন্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০০১ সালে গুজরাটের ভূমিকম্পে সরকারি মতে প্রায় ১৮০০০ লোকের মৃত্যু হয়েছে।
- এক দশকে ২০০ এর মত বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকে। তার মাত্রা থাকে ৬ রিখটার স্কেল এর বেশি।
- সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা, বহুতল বাড়ি ও জনবহুল নগরী বৃদ্ধির জন্য ভূমিকম্পের সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে।
- ভূমিকম্পে ধ্বংসের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরিষেবা দ্রুত চালু করা যায় না।

ভূস্তরের নিচে যেখান থেকে ভূকম্পনের উৎপত্তি হয় তাকে বলে উৎস স্থল বা কেন্দ্রবিন্দু। উপর থেকে নিচের ঐ বিন্দুকে বলে "এপিসেন্টার"। ৫০ কিলো মিটার বা তার থেকে কম গভীরতার কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকম্পকে বলা হয় অগভীর উৎসের ভূমিকম্প। অন্যগুলিকে বলা হয় গভীর কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকম্প।

ভূকম্পনের ফলে যে শক্তি নিসৃত হয় তাকে পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেল দিয়ে। এতে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়। একে তুলনা করা হয় টি এন টি (ট্রাইনাইট্রোটলুইন) রিখটারের সঙ্গে। কত স্কেলে, কত বিস্ফোরক নিচের সারণিতে তা দেখানো হল।

সারণি

ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে)	আনুমানিক টি.এন.টি (তুলনামূলক বিস্ফোরণ ক্ষমতা)
১.০	১৭০ গ্রাম
৩.০	১৮০ কে জি
৬.০ (১৯৯৩ সালে লাত্তুর, ভারত)	৫৭০০ টন
৮.৫ (অসম ১৮৯৭ ও ১৯৫০)	২,৮৭,০০,০০০ টন

উপরের এই সারণি থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে, রিখটার স্কেলে মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের ক্ষমতাও গুণিতক হারে বেড়ে যায়। এটা ঘটে যে পরিমান শক্তি সংশ্লিষ্ট ভূকম্পন থেকে নির্গত হয় তার ওপর। ৮.৫ মাত্রার ভূকম্পন হিরোসিমায় যে বোমা ফেলা হয়েছিল তার ১০ হাজারটি পরমাণু বোমার সমান।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে দ্রাঘিমাংশে (উত্তর-দক্ষিণ) ধরে কম্পনের জন্য হয় প্রাথমিক তরঙ্গ। এই তরঙ্গের গতি হয় সেকেন্ডে কয়েক কিলোমিটার এবং তার ফলে ভূপৃষ্ঠে

প্রাথমিক কম্পন অনুভব করা যায়। এই তরঙ্গ ভূসমলয় টানে পরিণত হয় ও পরে উপরে ঠেলে দেয়। একে টানা-পোড়েনের তরঙ্গ বলা হয়। একে সোজা কথায় বলা যায় ঝাঁকুনি দেওয়া।

অন্যদিকে মধ্যবর্তী তরঙ্গ বেড়িয়ে আসে আনুভূমিক কম্পনের জন্য। এদের বলা হয় ভূপৃষ্ঠ বা মন্থর তরঙ্গ। অন্য তরঙ্গ থেকে বিস্তৃতি ও আকারে ছোট হলেও এদের ধ্বংস ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি। কারণ, এই তরঙ্গ উত্তর-দক্ষিণ গতিমুখী তরঙ্গ জনিত আভূমিক দোলনের বিপরীত দিকে গতিলাভ করে।

কোন ভূমিকম্পের মাত্রায় বোঝা যায় কম্পনের ফলে নিসৃত শক্তির পরিমান। আর তীব্রতা নির্ভর করে যেখানে কম্পন পরিমিত হয়ে থাকে তার ওপর। স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে স্থানের দূরত্বের সঙ্গে কম্পনের তীব্রতা হ্রাস পায়।

ভূমিকম্পকে শ্রেণীভেদ করা হয় দুভাবে -- ভূমিকম্পের মাত্রা অথবা তীব্রতার ভিত্তিতে। ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেলে। এর হিসেব করা হয় ভূমিকম্পের তরঙ্গের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে।

কোন নির্দিষ্ট স্থানের কম্পনের তীব্রতার হিসাব করা হয় কেন্দ্র বিন্দু থেকে দূরত্ব অনুসারে।

যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বাভাস ও প্রাকৃতিক পূর্বাভাস (Forecast) ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তা সত্বেও কোন কোন সময় এমন কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায় যা থেকে অনুমান করা যায় যে ভূমিকম্প হতে পারে। এই সব লক্ষণকেই বলা হয় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। এসব হতে পারে যন্ত্রের সহায়তায় অথবা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া, প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখে। বলা বাহুল্য যে প্রাকৃতিক পূর্বাভাস অনেক বেশি অনুমান নির্ভর।

নিচে সাধারণভাবে স্বীকৃত পূর্বাভাসগুলি নিচে দেওয়া হল।

যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বাভাস	প্রাকৃতিক পূর্বাভাস
ক) চলমান ও স্থানিক তরঙ্গের গতিবেগের পরিবর্তন।	ক) কুয়ো ও হ্রদে জলের স্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়া বা উপরে উঠে যাওয়া। ভারতের মত দেশে যেখানে অসংখ্য গ্রামে বহু কুয়ো আছে, সেখানে জলের স্তরের ওঠানামা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তেমনি হ্রদের জলের স্তরের ওঠানামাও দেখা সহজ।
খ) প্রাক অভিঘাত ও পরের অভিঘাত।	
গ) অভিঘাতের ধরণের তথ্য।	
ঘ) ভূমিপৃষ্ঠে স্ফীতি বা ধস।	খ) জলের উপরিভাগে কাদা বা মাটি ভেসে ওঠা।

ঙ) মাধ্যাকর্ষণের পরিবর্তন।

চ) মাটির স্থান চ্যুতি।

ছ) মাটির নিচের শিলা গঠনের ভঙ্গুরতা ও দাগ ধরা।

জ) শিলা খন্ডের দৃঢ়তায় পরিবর্তন।

ঝ) পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বদল।

ঞ) মাটির তলা থেকে র‍্যাডন গ্যাস নিঃসরণ।

ট) মাটির তলা থেকে অস্বাভাবিক শব্দ।

গ) প্রাকৃতিক ঝর্ণার গতি ধারা বদলে যায়।

ঘ) জলের লবণাক্ততা বেড়ে যায়।

ঙ) সমুদ্র এগিয়ে আসে বা পিছিয়ে যায়।

চ) প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ। বিশেষ করে মাটির নিচে বাস করা ইঁদুর, পিঁপড়ে প্রভৃতির অস্বাভাবিক আচরণ। অনেক সময় কুকুর বা গরু কেও ডাকতে দেখা গেছে।

এই সারণি থেকে এটা দেখা যায় যে কতগুলি পূর্বাভাস কোন না কোন সময় মিলে গেছে। তবে, এগুলির কোনটিই ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে নি। এখন সমস্যা হল, কোন পূর্বাভাসকে নির্ভর যোগ্য ভাবে গ্রহন করা যায় সে পদ্ধতিটি খুঁজে বের করা। নানা জনে, নানা সময়ে ঐ সব পূর্বাভাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তবে এখনও কোন নির্দিষ্ট বিষয় গ্রহন করা যায় নি। তাই এবিষয়ে আরও বেশি গবেষণা করা দরকার।

সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি (Probable losses) ঃ

বিপদের সম্ভাবনাময় অঞ্চলে বিপর্যয়ের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আছে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি।

প্রাকৃতিক বিপন্নতার বা বিপর্যয়ের মধ্যে আছে পাকা বাড়ি, পরিকাঠামো ও কৃষি। পাকাবাড়ি ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে কাঠামো, নকশা, আকার, ব্যবহৃত সরঞ্জাম, নির্মাণ পদ্ধতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির নৈকট্য। নির্দিষ্ট ভূমিকম্পের বৈশিষ্টের সঙ্গে ঐ সব বিষয়গুলি সম্পৃক্ত।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের তিনটি গোষ্ঠী রয়েছে। সেগুলি হল পরিবহন (সড়ক, রেল, সেতু, বিমানবন্দর, নদীবন্দর); উপযোগ (জল, নিকাশি ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ); টেলি যোগাযোগ; বাঁধ; ও বন্যা নিরোধী বাঁধ। এছাড়া ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে হাসপাতাল চিকিৎসা কেন্দ্রের মত অত্যাবশ্যক ক্ষেত্র এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমন্ডিত ও ঐতিহাসিক বাড়িঘর সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা।

সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে যে সব মানুষ গোষ্ঠীর ঝুঁকি রয়েছে সেগুলি হল --

- ছোট একক পরিবার।
- মহিলা, বিশেষভাবে গর্ভবতী ও প্রসূতি।
- মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধী।
- শিশু।
- বয়স্ক লোক।

গরীব মানুষদের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অর্থের নিরীক্ষে বেশি হবার সম্ভাবনা কম থাকলেও তাঁদের রুটি-রুজি বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে গরীবদের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়া টিকে থাকা কষ্টকর।

আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে সম্পদ ও প্রক্রিয়া দিয়েই পরিমান নির্দিষ্ট করা হয়। প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি হয় বাড়ি ঘর, কারখানা ভেঙ্গে, সে সব মেরামত করতেও অর্থ ব্যয় হয়। ফসলের ক্ষতিতো হয়ই, সেই সঙ্গে উৎপাদন ব্যাহত হয়। অপ্রত্যক্ষ ক্ষতি হল উৎপাদন না হওয়া ও অর্থ উপার্জনকারী কাজ বন্ধ থাকা। দ্বিতীয় স্তরের ক্ষতি হয় রোগ, মুদ্রাস্ফীতি। তাছাড়া ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যয় ও পরোক্ষ ক্ষতির মধ্যে পড়ে।

এখানে একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার যে জন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে ভূমিকম্প হলে, বিশেষভাবে বহুতল বাড়ি ও জনবহুল অঞ্চল হলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়। যেমন ঘটেছে সাম্প্রতিক গুজরাটের ভূমিকম্পের সময়।

ভূমিকম্পের ফলে আরও যে সব ক্ষয়ক্ষতি হয় বা পরিবর্তন ঘটে সেগুলি নিয়ে এ বার আলোচনা করা যাক।

ভূমিকম্পের ফলে জল সরবরাহের মেইন পাইপ (অর্থাৎ যা থেকে পাড়ায় পাড়ায় ও অলি গলিতে জল পৌঁছানোর মাঝারি নলগুলি ছড়িয়ে যায়) ফেটে বা ভেঙ্গে গিয়ে দুধরণের বিপর্যয় দেখা দেয়। একতো ব্যবহার্য জল পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত ঐ মোটা ধারার জল বিপর্যস্ত অঞ্চলকে প্লাবিত করে দেয়। ড্রেন ব্যবস্থা ওলট পালট হওয়ায় পরিশ্রুত জলের সঙ্গে ময়লা জল ময়লা জল একাকার হয়ে যায়। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়ে একদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আর অন্যদিকে সর্ট সার্কিটের জন্য আগুন ধরে যায় রান্নার গ্যাস ও জলন্ত উনুন থেকেও আগুন লাগতে পারে।

নর্দমা ও নিকাশি নালা ভেঙ্গে যাওয়ায় নোংরা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগ জীবাণুও ছড়িয়ে পড়ে। দেখা দেয় সংক্রামক রোগ ও মহামারি।

টেলিফোন তথা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তখন অবশ্য মোবাইল ফোন ও উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে যোগাযোগ অনেকটা দ্রুত পুনঃস্থাপন করা যায়।

ভূস্তরে ফাটল ও ধস নামার ফলে অনেক সময় শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে যায় না, ঐ সব ফাটল বা গর্তে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। রেল লাইন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন ব্যাহত হয়। তখন একমাত্র ভরসা হেলিকপ্টার।

বড়বড় জলাধার ভেঙ্গে পড়ায় শুধু জল প্লাবনই দেখা দেয় না সেই সঙ্গে ঘরবাড়ি জলস্রোতে ভেঙ্গে পড়ে। মাছ ধরা ও নৌযান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিভিন্ন সময়ে ভূমিকম্প ও জীবনহানির খতিয়ান			
বছর	অঞ্চল	মাত্রা (রিখটার স্কেল)	জীবনহানি
১৮৯৭	অসম	৮.৭	১৬০০
১৯০৫	কাংড়া	৮	২০০০০
১৯৩০	ধুবড়ি (মেঘালয়)	৭.১	(জানা যায় নি)
১৯৩৪	উত্তর বিহার	৮.৪	১১০০০
১৯৩৫	কোয়েটা, পাকিস্তান	৭.৫	২৫০০০
১৯৪১	আন্দামান দীপপুঞ্জ	৮.১	(জানা যায় নি)
১৯৫০	অসম	৮.৬	১৫০০
১৯৫২	পন্ডু ও টঙ্গু	৭.৫	(জানা যায় নি)
১৯৫৬	আনজার (গুজরাট)	৭	শতশত
১৯৫৬	বুলন্দশহর (ইউ পি)	৬.৭	(জানা যায় নি)
১৯৫৮	কাপকোট (ইউ পি)	৬.৩	ঐ
১৯৬৩	বাদগাম (জে কে)	৫.৩	শতশত
১৯৬৭	কয়ানা (মহারাষ্ট্র)	৬.৫	২০০
১৯৮৬	ধরমশালা (হি. প্র.)	৫.৭	(জানা যায় নি)
১৯৮৮	অসম	৭.২	(জানা যায় নি)
১৯৮৮	উত্তর বিহার	৬.৭	১৩০০
১৯৯১	উত্তর কাশি	৬.৬	৭৬৮
১৯৯৩	লাত্তুর(মহারাষ্ট্র)	৬.৪	১০০০০
২০০১	গুজরাট	৬.৯	১৮ হাজার

১৯৪৫ সালের ২৬ নভেম্বর মাকরান উপকুলের ভূমিকম্পে সমুদ্রে ৪টি নতুন দ্বীপ জেগে ওঠে। এগুলি গোলাকার এবং ১০০ থেকে ২০০ মিটার ব্যাসের। এগুলি সমুদ্রের জল স্তর থেকে ১০-২০ মিটার উঁচু হয়ে ছিল।

এই ভাবে দ্বীপ সৃষ্টি অবশ্য খুব কমই দেখা যায়। তাছাড়া কাদা ও বালির ঐ স্তুপ তথা দ্বীপ গুলি জল স্রোত ও জোয়ারের তোড়ে আবার অচিরেই বিলিন হয়ে যায়।

ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় করনীয় ঃ

১। ভূমিকম্পের সময় ঘরের ভিতরে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসবেন এবং পাকাবাড়ি, দেয়াল, সরুগলি, বড়গাছ ও বিদ্যুতের তার থেকে দূরে খোলা জায়গায় থাকবেন।

২। কোন গাড়ির মধ্যে থাকলে গাড়িটাকে রাস্তার পাশে থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আগের মত খোলা জায়গায় থাকবেন।

৩। ভূমিকম্পের সময় উপরের কোন তলে থাকলে দরজা বা জানালা দিয়ে লাফ দেবেন না। কোন খোলা দরজা বা স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে থাকুন। সময়মতো বাইরে আসুন। বাড়ির বাইরে থাকলে কখনো ঘরের মধ্যে ঢুকবেন না।

৪। কম্পন থামলেও বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না। কারণ একবারে কম্পন থামলেও কিছুক্ষণ পরেই সাধারণভাবে আবারও কম্পন হয়ে থাকে। প্রথম কম্পনে জীর্ণ বাড়ি তখনই ভেঙ্গে পড়ে। সেতু ও পাকা সড়কের ক্ষেত্রেও এই অবস্থা দেখা যায়।

৫। সাধারণভাবে ভূগর্ভস্থ জলের মজুদ ঠিক থাকলেও উপরের মজুদ ভেঙ্গে পড়ে। তাই, ভূগর্ভস্থ জলই ব্যবহার করতে হবে।

৬। ভূকম্পনের পরে উদ্ধার কাজও করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। ঘটনার পরেই উদ্ধার কার্য শুরু করা ঠিক নয়। আর গুরুতর আহত ছাড়া অন্যদের দূরে নেবার চেষ্টা করাও ঠিক নয়। তাতে মৃত্যু বাড়তে পারে। তবে সাধারণ চিকিৎসা স্থানীয়ভাবে করা উচিৎ। বিদ্যুৎ থেকে বিপদ প্রতিরোধ করুণ।

৭। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে প্রত্যেকের বাড়িতে জরুরী প্রয়োজন মেটাবার মত চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা উচিৎ। সেই সঙ্গে জল ও খাদ্য মজুদ রাখা দরকার।

৮। অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতই পরবর্তী ত্রাণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে হবে। তবে, ঘর তৈরির ক্ষেত্রে ভূকম্প নিরোধক বাড়ির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৯। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে উঁচুতে ফুলের টব বা ভারি জিনিসপত্র রাখা উচিত নয়। কারণ এগুলি সহজে পড়ে যেতে পারে এবং ক্ষতির পরিমাণ বেশি হতে পারে।

১০। মনে রাখবেন, কোন বাড়ি বাইরে থেকে সুন্দর দেখালেও তার ভিতরটা দুর্বল থাকতে পারে এবং ক্ষতি হতে পারে বেশি।

১১। অন্যকে সাহায্য করুন এবং নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখুন।

১২। গ্যাসের মুখ বন্ধ রাখুন। আগুন লাগতে পারে

১৩। ভারী ও কাঁচের জিনিসপত্র সেলফের নিচের দিকে রাখবেন।

১৪। সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য রেডিও এবং টিভি চালিয়ে রাখুন।

১৫। ভূমিকম্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক সুইচ বন্ধ রাখুন এবং মোমবাতি বা দেশলাই জ্বালাবেন না। গ্যাস লিক করছে কিনা দেখুন।

১৬। জরুরী ত্রাণের জন্য পরিকল্পনা নিন।

১৭। গুজবে কান দেবেন না বা গুজব ছড়াবেন না।

(সূত্র ঃ IGNOU পুস্তিকা)

ত্রাণ ও পুনর্বাসন (Relief and Rehabilitation) ঃ

ভূমিকম্পের জন্য প্রাণ হানি ঘটেনা, মানুষ মারা যায় ভেঙ্গে পড়া বাড়ি ও কাঠামো চাপা পড়ে। ফলে মুহূর্তে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই প্রথম প্রয়োজন হল উদ্ধার এবং যে কজন বাড়ি থেকে বাইরে জীবিত বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বা বাইরে ছিলেন তাঁদের সাময়িক আশ্রয় ও ত্রাণের ব্যবস্থা। অন্য সব ত্রাণ-শিবিরে খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা ও সেনিটেশনের যে ধরনের ব্যবস্থা থাকে এখানেও তা থাকবে।

ব্যতিক্রম হল উদ্ধার করা আহত মানুষদের চিকিৎসা। কারণ ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে রোগের চেয়েও কাটা ছেড়া বা হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসা দরকার হয় বেশি। সংক্রামক ব্যধির চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্যই চাই, অবশ্য কয়েক দিন পরে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সড়ক বা রেল পথে খাদ্য, পানীয় ও ওষুধ এবং আশ্রয় শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় তাঁবু পাঠানো কঠিন হয়ে পড়ে। সেইজন্য ছোট বিমান বা হেলিকপ্টারের সাহায্য নিতে হয়।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত জনপদে দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কারণ ধ্বংসস্তুপ পরিষ্কার করা ও তার পরে ভূমিকম্প নিরোধক তথা সহনশীল বাড়ি তৈরি করার জন্য যথেষ্ট সময় দরকার।

ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে সমাজ ও নাগরিক পরিষেবার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কবে, কোন সালে, কখন প্রয়োজন হবে, ভূমিকম্প কোথায় কত মাত্রায় হবে তা জানা না থাকায় প্রাক প্রস্তুতিতে ঢিলেমী আসতে পারে। তাই সচেতন নাগরিক পরিষেবাকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে সজাগ থাকতে হবে। অধিবাসীদের "অসামরিক প্রতিরক্ষা" ব্যবস্থার অণুরূপ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এর ফলে তাঁরা নিজেরাই ভূমিকম্প শুরু হলে বড় বাড়ি থেকে কিভাবে বের হবেন, বের হতে না পারলে কোথায় থেকে আত্মরক্ষা করবেন সে বিষয়ে সজাগ থাকতে পারবেন। তাছাড়া বাড়ি চাপা পড়ে আটকে থাকলে জীবন রক্ষার উপযোগী খাদ্য, পানীয় কি ধরনের জায়গায় রাখলে জরুরী প্রয়োজনে পাওয়া যাবে তা গুছিয়ে রাখতে পারবেন।

এছাড়াও নৈমিত্তিক অভ্যাস করতে হবে ঃ গ্যাস বন্ধ করা, বিদ্যুৎ সুইচে হাত না দেওয়া। বাইরের কেউ ভেতরে ঢুকবে না - আহতদের অবস্থা বুঝে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভূমিকম্প

খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সালের ভূমিকম্পে ক্রিট দ্বীপের মাইলোয়ার সভ্যতা লুপ্ত হয়ে যায়।

১৫৫৬ সালে চীনের মেনসি প্রদেশ	১৭৫৫ সালে লিসবন, পর্তুগাল
১৭০৩ সালে জাপানের টোকিও	১৯০৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
১৭৩৭ সালে কোলকাতা, ভারত	

ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের খতিয়ান

সাল	স্থান/দেশ	মৃত্যু
১৯৭৬	তাংসান, চীন	২ লক্ষ ৫৫ হাজার
	বেসরকারি মতে	৬ লক্ষ ৫৫ হাজার
১৯২০	সাংসু, চীন	২ লক্ষ
১৯২৩	কোয়াংতো, জাপান	১ লক্ষ ৪৩ হাজার
১৯৪৮	আসকাবাদ, ইউএসএসআর	১ লক্ষ ১০ হাজার
২০০১	গুজরাট, ভারত	১৮ হাজার

ভূমিকম্পজনিত কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সরল নির্দেশিকা

আমাদের মত একটি উন্নয়ণশীল দেশে ভূমিকম্পের সময়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ কাঠামো তৈরির প্রধান অসুবিধা হল অর্থ। বড় ধরণের ভূমিকম্পের সময়েও ১০০ বছর ধরে নিরাপদ থাকে তেমন বাড়ি তৈরির খরচপত্র আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই বহন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের এমন প্রযুক্তির বাড়ি বা কাঠামো তৈরি করতে হবে যা সাধারণ মানের ভূমিকম্পে অক্ষত থাকবে এবং বড় ধরণের ভূমিকম্পে বাড়িটির আংশিক ক্ষতি হলেও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাবে না, তার কাঠামোটি অক্ষত থেকেই যাবে।

কয়েকটি সাধারণ প্রযুক্তি প্রয়োগ করেই বাড়ি ও কাঠামো ভেঙ্গে পড়া ও জীবন হানি কমানো যাবে। এর জন্য খুববেশি অর্থব্যয় করতে হবে না। সেই নির্দেশিকা সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল ঃ

● বাড়ি বা কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি মানিয়ে নেবার ক্ষমতার পরিমাপ করা হয় নমনীয়তা (Ductility) দিয়ে। এটা হল—

$$\text{নমনীয়তা} = \frac{\text{সম্পূর্ণ ভেঙ্গেপড়া}}{\text{স্থিতিস্থাপক ভেঙ্গেপড়া}} \qquad \text{Ductility} = \frac{\text{Total Deformation}}{\text{Elastic Deformation}}$$

কোন কাঠামোর উপকরণগুলির শক্তি বা ক্ষমতা ভুমিকম্পের আঘাতের চেয়ে বেশি হলে কাঠামোটি অক্ষত থাকে। কিন্তু অনুরূপ নক্সার আর্থিক ব্যয়ভারের কথা মনে রেখে আমাদের ব্যয় ও নির্মাণ সরঞ্জামের শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়। প্রতিরোধী উপকরণগুলিকে হতে হবে নমনীয় ও অভঙ্গুর। কারণ সেই নির্দিষ্ট উপকরণ যেন বিকৃতি ও ক্ষয়ক্ষতিকে মানিয়ে নিতে পারে, বাড়তি বোঝাকে অবশিষ্ট উপকরণের মধ্যে স্থানান্তর করতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়া এড়াতে হলে প্রয়োজনীয় নমনীয়তার সঠিক মূল্য নির্ণয়ে নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন। বর্তমান বিদ্যার ওপর নির্ভর করে নির্মাণে প্রয়োজনীয় কংক্রিটের ঢালাইকে হতে হবে আই এস—৪৩২৬ (IS-4326) এর সম মানের। এই বিধির (Code) সর্বশেষ নির্দেশিকা কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি মানিয়ে নিতে পারে কোন রকম ব্যর্থতা ও ধ্বংস ছাড়াই।

● গুজরাটের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের সময় বহুসংখ্যক বাড়ির একদিকের অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে একই বাড়ির ভাঙ্গা দিকের ক্ষতি হয়েছে অন্যদিকের চেয়ে বেশি। এটা হতে পারে কাঠামো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে এবং একই সময়ে ঘূর্ণীয়মান ও রূপান্তরিত কম্পন একই সঙ্গে ঘটে থাকে। এটা এড়াতে হলে কাঠামোটি হবে জ্যামিতিক সূত্রবদ্ধ এবং কাঠিন্য ও 'ভড়' এর বন্টনের ক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভূমিকম্পের সময় সংশ্লিষ্ট ভার (ওজন) অনুসারে ঢালাই এর শক্তি ও দৃঢ়তা কমে

যায়। গবেষণায় দেখা যায়, সুসামঞ্জস্য কাঠামোর নমনীয়তা দ্বিগুণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সড়কের পাশে বা রাস্তার মোড়ের বাড়িগুলিতে গ্যারেজ, দোকান, অন্য কারণে একতলায় অনেকটা জায়গা উন্মুক্ত রাখতে হয় বলে তার কাঠামোতে অসামঞ্জস্যতা এড়ানো যায় না। ঐ অসামঞ্জস্যতা কমাতে বড় বড় উন্মুক্ত অংশে বিশেষ "টাইবিম" দেওয়া দরকার। তাছাড়া নকসা কঠোর ভাবে "ইন্ডিয়া কোড ফর আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইন অব 'ট্রাকচারস (আই এস আই—১৮৯৩) "এর জটিল সংস্থানের বিষয়গুলি মেনে নিয়ে। দরজা, জানালা প্রভৃতি খোলা পথ কাঠামোতে রাখতে হবে যতটা সম্ভব আভূমিক দুটি প্রধান যাতায়াতের সুবিধাজনক অবস্থানে।

● বাড়ি (বিল্ডিং) বাক্সাকৃতি আয়তক্ষেত্রের আকারে তৈরী হলে তা হবে ভূকম্পনরোধী। এগুলি L (এল), Y (ওয়াই) বা U (ইউ) আকৃতির চেয়ে অনেক বেশি ভূকম্পরোধী। সাম্প্রতিক গুজরাট ভূমিকম্পের সময় L (এল) আকৃতির বাড়িগুলির ক্ষতি হয়েছে বেশি। বাড়ির সুসামঞ্জস্যতার জন্য সিঁড়ি ও ছাদের ওপরের জলাধার (ট্যাঙ্ক) করা দরকার মধ্যস্থলে। কোন কারণে বাড়ির নকশা ঐভাবে করা না সম্ভব হলে কাঠামোকে দুটি আলাদা আয়তাকার অংশে ভাগ করে দিতে হবে এং তার মধ্যে বিভাজিকা রাখতে হবে।

● সাধারণভাবে যে সব বাড়ির লম্বা দেওয়াল আনুভূমিক (হরাইজেন্টাল) এবং বড় দরজা থাকে উলম্ব (পারপেনডিকুলার), ঠিক কোল্ড স্টোরেজ বা স্থাপত্যের মত থাকলে ভূমিকম্পের সময় ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা বেশি থাকে। এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে গুজরাট ভূমিকম্পে বহু সংখ্যক বাড়ি ভেঙ্গে পড়া দেখে। তাই পারস্পরিক উলম্ব বাড়িগুলির কিছু পরিমাণে ভূমিকম্প সহনশীল হওয়া উচিত। বর্গাকার কলাম (Columns) এটা নিশ্চিত করতে পারে।

● বহুসংখ্যক বহুতল বাড়িতে দেওয়াল থাকে না এবং সম্পূর্ণভাবে তা একতলা স্তরে কলামের উপরই নির্ভরশীল থাকে। এই ধরণের বাড়ি সাধারণ মানের ভূমিকম্পেও ভেঙ্গে পড়তে পারে। এই সবক্ষেত্রে একতলায় যতবেশি সংখ্যক সম্ভব ব্র্যাস (Brace) বা লিন্টেল (lintel) বিম দেওয়া উচিত। এতে একতলায় পার্শ্বীয় দৃঢ়তা ও শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়বে।

● "শিয়ার ওয়াল" (Sheer Walls) নামে পরিচিত ঢালাই করা দেওয়াল সাধারণত লিফট (Lift) এর দেওয়াল বা কাঠামোর জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে। এই সব দেওয়াল খুবই সহশীল ও ভেঙ্গে পড়ে না। এই সব দেওয়াল বাড়ির অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত।

● বহুতল বাড়ির উল্টে পড়ে যাওয়া বন্ধ করতে মাটির তলায় বেসমেন্ট থেকে কাঠামো তৈরি করতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে ঢালাই দিয়ে। তাই, ভীতের গভীরতা বাড়াতে হবে অথবা গভীরে প্রোথিত "ভিত্তি স্তম্ভ" তৈরি করতে হবে।

● ভূমিকম্পের জন্য "স্পেকট্রাল অ্যাকসেলেরাশন" নামে পরিচিত সর্বাধিক গতিশীলতা পরিমাপ করার সময় বাড়ির স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল এবং ইঁটের দেওয়াল ও ভীতের নিচের মাটির নমনীয়তা বিবেচনা করতে হবে।

● ভূমিকম্পের ফলে উপরের জলাধার নষ্ট হয়ে পড়লে পরবর্তীকালে জল সরবরাহ ব্যাহত হয়ে যায়। এর পরিণতিতে মহামারি দেখা দিতে পারে বা ত্রাণের কাজে গুরুতর ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই জলাধারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করতে হবে। তা না হলে একটি মাত্র উপরের জলাধারের জন্য সমগ্র অঞ্চলের জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হল, তুলনামূলক ভাবে দুর্বল কাঠামোর ওপরে বিশাল ভর বিশিষ্ট জলাধারের ভেঙ্গেপড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

বিগত ১০ বছর ধরে ডঃ শেখর চন্দ্র দত্ত ভূকম্পন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বিপদ সম্ভাবনা এড়াতে বেশ কিছু সংখ্যক নির্দেশিকা তৈরি করেছে। এগুলি রূপায়ণ করলে ভূমিকম্পের ফলে কাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে কমানো যাবে। আমেদাবাদের মতই পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের এক বিরাট অংশ ভূমিকম্পের সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল। এই প্রেক্ষিতে পৌরবিধিতে কাঠামো তৈরির জন্য ঐ নির্দেশিকা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

● **ভূকম্পন সহনশীল কাঠামো তৈরির জন্য দুটি প্রধান পদ্ধতি ঃ**

১। ভিত বিচ্ছিন্ন রাখা পদ্ধতি

মাটি থেকে কাঠামোর ভিতকে রবার বা অন্য কোন বস্তু দিয়ে আলাদা করা। এর ফলে ভয়ঙ্কর কম্পনের সময়েও বাড়ি বা কাঠামো পিছলে যেতে পারবে এবং কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে কম শক্তি প্রবাহিত হবে।

২। শ্রাট স্ট্রাকচার

বাড়ির উপরিভাগে কাঠামোর সি জি (C G) ভারী চলমান ভর দিয়ে ভিন্নতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

উভয় পদ্ধতিতেই প্রাথমিক উচ্চবিনিয়োগ ও বিপুল পরিমাণ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় প্রয়োজন।

● বাঁধ হল আর এক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশাল নির্মাণ কান্ড। সাধারণত এগুলি তৈরি হয় মাটির সরঞ্জাম অথবা ঢালাই দিয়ে। সোজা কথায় এগুলি হল নদী বা জলধারায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য বাঁধ দেওয়া। তাই, প্রাথমিকভাবে এগুলি তৈরি হয় সেচের জন্য জল ধরে রাখার উপযোগী কাজে ব্যবহার করতে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজেও সেই জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাঁধ তৈরিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। তাই, এর ব্যর্থতায় শুধু বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয় না। দেশের আর্থব্যবস্থার ও বিপুল ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই কাঠামোর নিরাপত্তাও স্থায়িত্বের জন্য সবচেয়ে ভাল যত্ন নেওয়া দরকার। সাম্প্রতিক গুজরাট ভূমিকম্পে মাটির বাঁধগুলিতে

লম্বালম্বী ফাটল দেখা দেয়। এটা দেখা যায় জলধারার উপরের দিকে। তাই, আধুনিক বাঁধ তৈরি করা হয় স্থিতিশীল ভার সমন্বিত অবস্থায় সসীম দুই ও ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণের পরে। এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের সময় সম্ভাব্য প্রসারিত চাপ ও বিভাজিত টানে উৎসগুলি বিবেচনা করা হয়।

● প্রতি বছরই আমাদের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘূর্ণীঝড় দেখা দেয়। এর ফলে কম ব্যয়ে স্থানীয় সম্পদে ও প্রযুক্তিতে তৈরি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এই সমস্যা দূর করতে দরকার ঘরবাড়ি, দেওয়াল ভাঙ্গা ও চালা উড়িয়ে নেওয়া ঝড়ের আচার আচরণ ও গতি গভীরভাবে অনুধাবন করা। ছাদ বা চালায় সংযোগকে কাঠামোগত প্রযুক্তিতে যুক্ত রাখার ব্যবস্থা করলে এর অনেকটাই কমানো যায়। এর জন্য ১০ থেকে ২০ শতাংশের বেশি খরচ হবে না। বর্তমান প্রস্তাব সেই সাফল্য অর্জনের জন্যই দেওয়া হয়েছে।

সূত্র ঃ ডঃ শেখর চন্দ্র দত্ত, অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর অব অ্যাপলায়েড মেকানিক্স, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপলায়েড মেকানিক্যাল অ্যান্ড ড্রইংস, বি. ই. কলেজ, হাওড়া।

ঘূর্ণীঝড়
(Cyclone)

ক্রান্তীয় অঞ্চলে, একক হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। ঘূর্ণীঝড়ের সঙ্গে থাকে প্রচন্ড বাতাস, প্রবল বৃষ্টি ও জোয়ারের জল। এর ফলে ঘরবাড়ি, গাছপালা ভেঙ্গে যায় ও জলে ডুবে যায়, বন্যা দেখা দেয়। ঘটে প্রাণ ও সম্পদ হানি।

সমুদ্রে পৃথিবীর ৩০ ডিগ্রি উত্তর থেকে ৩০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা মধ্যবর্তী অঞ্চলে জলের উপরিভাগের তাপমাত্রা ২৬ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সেখানে ঘূর্ণীবায়ুর সৃষ্টি হয়। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগর উপরে উল্লেখ করা অক্ষরেখার মধ্যে পড়ে। সেখানেই সৃষ্টি হয় ঘূর্ণীঝড়। ক্রমে তা বঙ্গোপসাগরের ক্ষেত্রে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে ছুটে এসে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ে। এই ঝড় কোন কোন সময় বাংলাদেশের উপকূলকে ধ্বংস করে দেয়। আর আরব সাগরের ক্ষেত্রে তা কোন কোন সময় গুজরাট উপকূলে আছড়ে পড়ে।



এই ধরনের ঘূর্ণীঝড়ে ১৫০ থেকে ১০০০ কিমি পর্যন্ত ধেয়ে যেতে পারে। এদের উচ্চতা হয়ে থাকে ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার। ২৪ ঘন্টায় সাধারণ ভাবে ৩০০ থেকে ৫০০ কিমি বেগে চলে। এই ঘূর্ণীঝড় ঘন্টায় ১১৫ বা তার বেশি গতিবেগ অর্জন করে উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে।

এদের শ্রেণী বিভাগ ছটি। সেগুলি হল --

১। নিম্ন চাপ অঞ্চলে ঝড়ের গতি থাকে ঘন্টায় ৩০ কিমির কম।

২। নিম্নচাপে ৩০ থেকে ৫৫ কিমি প্রতি ঘন্টায়।

৩। গভীর নিম্নচাপে ৬০ থেকে ৬৫ কিমি প্রতি ঘন্টায়।
৪। ঘূর্ণীঝড় ৬৬ থেকে ৯০ কিমি প্রতি ঘন্টায়।
৫। গুরুতর ঘূর্ণীঝড় ৯০ থেকে ১১৫ কিমি প্রতি ঘন্টায়।
৬। প্রচন্ড ঘূর্ণীঝড় ঘন্টায় ১১৫ কিমির বেশি গতিবেগ।

একটি পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণীঝড়ের থাকে একটি কেন্দ্রবিন্দু বা অক্ষিগোলক। এর গড় ব্যাস হয়ে থাকে ২০ থেকে ৩০ কিমি। কোন কোন সময় ঐ ব্যাস ৪০-৫০ কিমিও হতে পারে। এই গোলকে কোন মেঘ থাকে না। আর তার ঠিক বাইরেই বাতাসের গতিবেগ থাকে ৩০ থেকে ৫০ কিমি প্রতি ঘন্টায়। ক্রমেই তা গতি সঞ্চার করে সরে আসে।

বছরে বঙ্গোপসাগরে ৫-৬টি ঘূর্ণীঝড়ের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে ২-৩টি গুরুতর হতে পারে বা হয়ে থাকে। তবে আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণীঝড় হয়ে থাকে বেশি। এই ঘূর্ণীঝড়ের দুটি প্রধান মরসুম। হল মে-জুন এবং অন্যটি সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। সাধারণত ঐ সময়ে প্রবল ঘূর্ণীঝড় হয়ে থাকে।

পূর্বাভাস (Forecast) ঃ

কিছুকাল আগেও উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। তখন আবহাওয়া পূর্বাভাস সব সময় ঠিকভাবে মিলত না। একটা সময় ছিল যখন মানুষের অভিজ্ঞতাই ছিল একমাত্র ভরসা। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার আত্মজীবনী মূলক উপন্যাসে সে সম্পর্কে ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার) গামী জাহাজে যাত্রী হিসাবে ছিলেন, তখন একজন নাবিক যাত্রীদের বলেছিলেন, "কাপ্তান কইছে ছাইকোলোন হতি পারে।" (কাপ্টেন বলেছেন, সাইক্লোন হতে পারে)। বস্তুত সেই ঘূর্ণীঝড় হয়েছিল প্রবল ভাবেই এবং লেখক ছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী।

আজকাল অনেক উন্নত ব্যবস্থায় সে ভবিষ্যদ্বানী বা পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। এই জন্য ভারতে ছটি কেন্দ্র রয়েছে সেগুলি হল, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, ভিজাগাপত্তনম, চেন্নাই, মুম্বাই ও আমেদাবাদ। প্রথম ৪টি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ও অন্যদুটি আরব সাগরের কাছে। এই সব কেন্দ্রে উপগ্রহ মাধ্যমে সংগৃহীত পূর্বাভাস আকাশবানী, টেলিভিশন, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংবাদপত্রগুলিকে জানান হয়ে থাকে। এছাড়াও ঘূর্ণীঝড় নির্ণয়ে রেডার স্থাপন করা হয়েছে কলকাতা, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম, মছলিপত্তনম, চেন্নাই, কডাইকানাল, গোয়া, কোচিন, মুম্বাই ও ভুজ-এ।

ঘূর্ণীঝড়ের হুঁসিয়ারী সাধারণ ভাবে দুটি স্তরের হয়ে থাকে। এটা সাধারণত ৪৮ ঘন্টা আগে জানান হয়। এর পরে আবার ২৪ ঘন্টা আগে বন্দর ও মাছধরা নৌকা বা জাহাজগুলির জন্য ঐ হুঁসিয়ারীতে সম্ভাব্য বিপদের কথা বলা হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে ঘূর্ণী ঝড়ের সৃষ্টি হলেই তা রেডার ও উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তা দূরদর্শন ও আকাশবানীর মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। সংবাদপত্রে পাঠানো হয়। এছাড়া টেলি যোগাযোগ দপ্তর, উপকূলবর্তী রেডিও স্টেশন ও জাহাজের নিজস্ব বেতার তরঙ্গ মাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। সেগুলি রাজ্যের ঘূর্ণীঝড় প্রবণ অঞ্চলে

বসানো হবে। প্রতিটি অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্ব হল ঐ সঙ্কেত পাওয়ার পরেই মানুষকে হুঁসিয়ার করা।

ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি (Mitigation Process) ঃ

বিপর্যয় উপস্থিত হলে যাতে উপযুক্ত ভাবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা যায় তার জন্য স্বাভাবিক অবস্থাকালেই প্রস্তুত থাকতে হবে। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষকে ঘূর্ণীঝড়প্রবণ অঞ্চলে বসবাস করতে হয়। তবে, আসন্ন ঘূর্ণীঝড়ের সঙ্কেত পাবার পরেই তাঁরা যাতে নিরাপদ স্থানে অস্থাবর সম্পদ নিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন তার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখতে হবে। সেই শিবিরে যাতে বেঁচে থাকার মত খাদ্য, নিরাপদ পানীয় ও রোগের সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে তা ঠিক করে রাখতে হবে। ঘূর্ণীঝড় হঠাৎ এলেও তার প্রভাব থাকে অনেক দিন। তাই প্রস্তুতি তেমন ভাবেই নিয়ে রাখতে হবে। এই ভাবে জীবন ও সম্পদহানির পরিমান কমানো সম্ভব। এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সমুদ্রপারে বাঁধ, জলাধার নির্মাণ ও উপকূলে বনসৃজন একান্ত জরুরী।

ঘূর্ণীঝড়ের প্রভাব (Effects of cyclone) ঃ

ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণীঝড় প্রকৃত অর্থেই প্রচন্ড ক্ষতিকর হয়ে থাকে। মোটামুটি ভাবে এর ক্ষতিকর অঞ্চল উপকূল থেকে ১০০ কিমি পর্যন্ত দূরত্বের মধ্যে হয়ে থাকে। যে সব কারণে এই সব ঘূর্ণীঝড় থেকে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে সেগুলি হল (১) প্রচন্ড গতিবেগের বাতাস, (২) প্রবল বৃষ্টি, (৩) প্রবল জোয়ার বা সমুদ্রের জল স্ফীতি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হয় ঐ জল স্ফীতি। যা ১০ থেকে ২০ কিমি পর্যন্ত উপকূল ছাড়িয়ে চলে যায়। এই ক্ষতি আরও বাড়িয়ে দেয় প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা। বাড়ি, ঘর, গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে। ক্ষেতের ফসল ও মজুদ খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়। গৃহপালিত প্রাণীরা মারা যায়। তার পরে দেখা দেয় রোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।

কী করবেন ও করবেন না (Do's & Do'nts) ঃ

- ঘর-বাড়ি খুঁটিয়ে দেখুন। দরজা, জানলা, ছাউনি সব ঠিক আছে তো? জীর্ণ হয়ে থাকলে প্রয়োজনী মেরামত করুন।
- একটা তেলভরা হ্যারিকেন, টর্চলাইট ও ব্যাটারি মজুত রাখুন।
- রেডিওটা ঠিক আছে কিনা দেখে রাখুন। ব্যাটারি চালিত হলে বাড়তি একটা ব্যাটারি মজুত রাখুন।
- রেডিও সেট চালু রাখুন ও আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা শুনুন। কোন পরামর্শ শুনতে পেলে পাশের লোকদের তা জানিয়ে দিন।
- বেশি বৃষ্টি হলে যে সব নদী বা খালের জল বন্যা সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

- কাঁচের পাল্লাওয়ালা জানালা বন্ধ করে রাখুন ও সম্ভব হলে সাটার লাগিয়ে দিন।
- বাড়তি খাবার ঘরে মজুত রাখবেন। বিশেষ করে চিড়া, মুড়ি বিস্কুটের মত শুকনো খাবার যা রান্না না করেই খাওয়া যাবে। পানীয় জলও বেশি করে মজুত রাখুন।
- বাড়ি ছেড়ে নতুন আশ্রয়ে যেতে হলে মূল্যবান সামগ্রী উপরে তুলে রাখুন। চুরি হতে না পারে তেমন ভাবে রাখুন।
- বৃদ্ধ ও শিশুদের খাদ্য বিশেষ করে মজুত করে রাখবেন।
- নিজে শান্ত থাকুন। এর ফলে অন্যরাও উৎসাহিত হবেন।
- আশ্রয় শিবিরের অধিকর্তার নির্দেশ মেনে চলবেন। নির্দেশ না পেলে আশ্রয়স্থল ছেড়ে যাবেন না।

সাধারণের জন্য ঃ

- টিনের কৌটা, কাঠ বা লোহার খন্ড এবং অন্য কোন কঠিন বস্তু আলগা রাখবেন না, ঝড়ে সেগুলি মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।
- গুজব ছড়াবেন না, গুজবে কান দেবেন না। কেবলমাত্র রেডিওতে প্রচারিত সরকারি খবরই বিশ্বাস করবেন।
- নিচু জায়গায় ঘর হলে নির্দেশ পেলেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। না গেলে জলে ডোবার ভয় থাকবে।
- দুঃসাহসের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করবেন না। আকাশ একটু ফর্সা হলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বেন না। তখনই বিপরীত দিক থেকে হঠাৎ প্রচন্ড ঝড় আসতে পারে। ঝড় থেমে গেছে দেখা গেলেও এটা ঘটতেই পারে।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচতে ঝুলে থাকা কোন তার বা লোহার পোলে হাত দেবেন না।

(সূত্র ঃ IGNOU পুস্তিকা ও Sri R. N. Goldar)

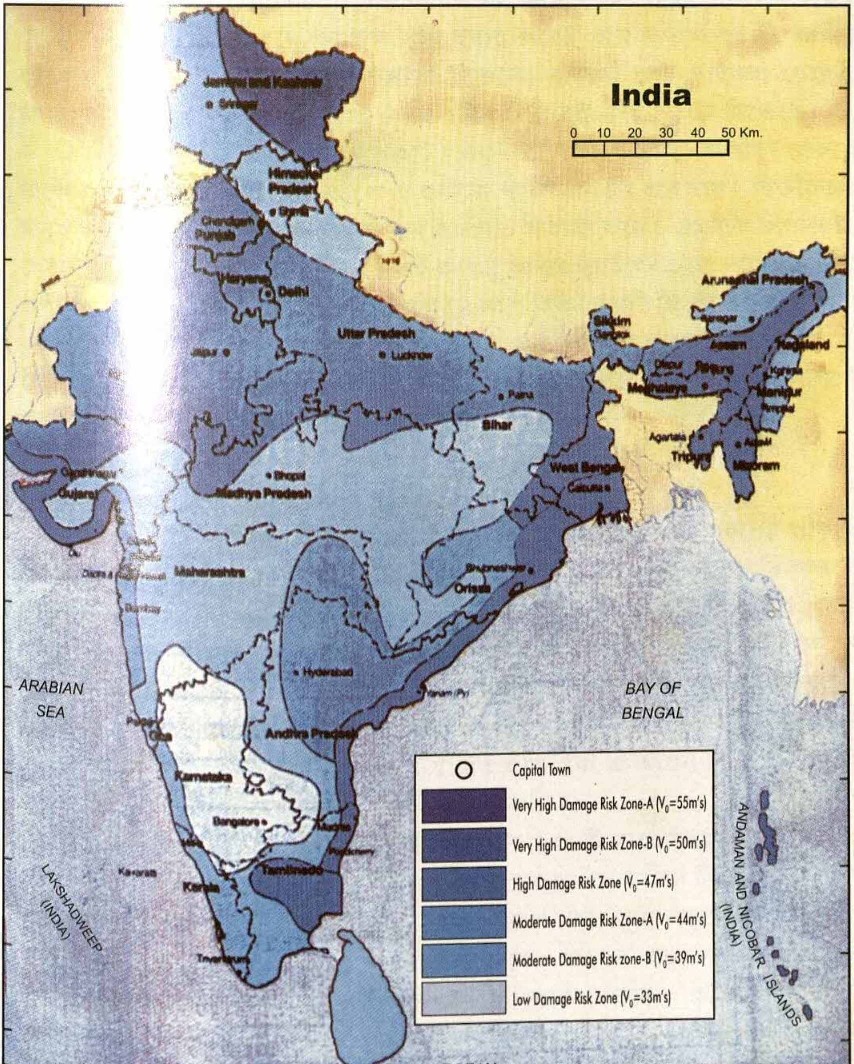
ভারতে ঘুর্ণীঝড়

স্থান	সাল	মৃত্যু	প্রাণী	সম্পদহানী ও যোগাযোগ ছিন্ন
বাংলা	অক্টোবর ১৮৪৭	৭৫০০০	৬০০০	”
বাংলা	অক্টোবর ১৮৭৪	৮০০০০	অসংখ্য	”
অন্ধ্র উপকূল	নভেম্বর ১৯৪০	৭৫০	৩০০০০	”
তামিলনাড়ু	ডিসেম্বর ১৯৭২	৮০	১৫০	”
পঃ বঙ্গ	সেপ্টেম্বর ১৯৭৬	১০	৪০০০০	”
অন্ধ্র উপকূল	নভেম্বর ১৯৭৭	৮৫৪৭	৪০০০০	”
তামিলনাড়ু	মে ১৯৭৯	৭০০	৩,০০০০০	”
ওড়িষা	সেপ্টেম্বর ১৯৮৫	৮৪	২৬০০	”
অন্ধ্র	নভেম্বর ১৯৮৭	৫০	২৫৮০০	৮৪০০ ঘর/বাড়ি নষ্ট
ওড়িষা	জুন ১৯৮৯	৬১	২৭০০০	১৪৫০০০ ঘর/বাড়ি নষ্ট
অন্ধ্রউপকূল	মে ১৯৯০	৯২৮		১৪০০০ ঘরবাড়ি
তামিলনাড়ু	নভেম্বর ১৯৯১	১৮৫	৫৪০	৩০০ কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট
পশ্চিমবঙ্গ	এপ্রিল ১৯৯৩	১০০	অসংখ্য গরু / মোষ	”
পশ্চিমবঙ্গ	নভেম্বর ১৯৯৪	১০০		২৬টি গ্রাম
অন্ধ্র উপকূল	অক্টোবর ১৯৯৬	১০৫৭		৬৪৭০০০ বাড়িঘর ধ্বংস
গুজরাট	জুন ১৯৯৮	১২৬১		২৫৭০০০ ঘরবাড়ি
ওড়িষা	অক্টোবর ১৯৯৯	১০০৮৬		২১৬০০০ ঘরবাড়ি বনাঞ্চল ধ্বংস

উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণীঝড়

স্থান	গতি/মিটার প্রতি সেকেন্ড	মৃত্যু	সময়কাল	আর্থিক ক্ষতি
চিরালা	৭০	১০,০০০	নভেম্বর ১৯৭৭	৩৫০ কোটি টাকা
মছলিপত্তনম	৫৮	৭০০	মে, ১৯৭৯	১৭০ কোটি টাকা
শ্রীহরিকোটা	৫৮	৬০০	নভেম্বর, ১৯৮৪	৪০০ কোটি টাকা
মছলিপত্তনম	৬৫	৯৬৭	মে, ১৯৯০	২২৪৮ কোটি টাকা
ওড়িষা		১০০০০	অক্টোবর, ১৯৯৯	কয়েকশ কোটি টাকা

Wind and Cyclone Hazard Mapping



C.S. = Cyclonic Storm crossing 1° Lat.

(S.C.S) = Severe Cyclonic Storm only

PMWS = Probable Maximum Wind Speed

Note : 1. Probable maximum surge heights are shown in Flood Hazard Map of India

2. Number of C.S. (S.C.S.) between Lat 21°22′ as shown are upto Long 90° E hence the number crossing Indian coast upto about 88° will be less.

দাবানল
(Forest Fire)

বন-জঙ্গলে আগুনের কথা মাঝে-মধ্যে শোনা যায়। এই আগুন সময় সময় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাও বহুক্ষেত্রে সেই আগুন নেভাতে সক্ষম হচ্ছে না। প্রাকৃতিক নিয়মে বনাঞ্চল সৃষ্টি হবার পরেই বনে-জঙ্গলে আগুন লাগার কারণ জানা গেছে। বস্তুত মানব সভ্যতা আগুনের ব্যবহার সেই দাবানল থেকেই আয়ত্ব করেছিল। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে বৃষ্টির প্রভাবেই সেই আগুন নিভেছে।

এই আগুন লাগার কারণ প্রধানত ২টি। এক—গ্রীষ্মকালে জঙ্গলের পাতা শুকিয়ে থাকে এবং বজ্রপাতে সৃষ্ট তীব্র তাপে ঐ শুকনো পাতায় আগুন ধরে যায়। দ্বিতীয়ত ঃ মানুষ দাহ্য পদার্থ সহ অসাবধানে আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। এমনকি সিগারেট-দেয়াশলাই থেকে আগুন লেগে যায়। এই আগুন আবার দুধরণের হতে পারে। মাটির ওপরের শুকনো ঘাস পাতায় আগুন লেগে তা সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আর অন্য ধরণের আগুন নিচের শুকনো পাতা থেকে শুরু হলেও পরে তা গাছের উপরের দিকে লেগে যায় এবং হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে, পাহাড়ের উপরের দিকে আগুন লাগলে খুব কম ক্ষেত্রেই তা নিচের দিকে নেমে আসে।

ভারতে দাবানল (Forest Fire in India) ঃ

ভারতে দাবানল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে অন্য এক ধরণের প্রাকৃতি আগুন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। তা হল রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে মাটির নিচের কয়লার আগুন। বহু বছর ধরে সেই আগুন জ্বলছে খনির গভীরে। তার ফলে উচ্চ মানের লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত যে সব অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে তার পক্ষে এই আগুন নেভানো সম্ভব হয় নি। বস্তুত ঐ অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ আগ্নেয় গিরির ওপর অবস্থান করছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এমন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে এবং ঐ আগুন নিভিয়ে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়িয়ে উচ্চমানের কয়লা রক্ষা করা যাবে।

১৯৯৫ সালে শুধু এক বছরে হিমাচল প্রদেশে ৪৫০টি দাবানলের ঘটনার সংবাদ জানা গেছে। আপনা থেকে জ্বলে ওঠা দাবানল ছাড়াও বনবাসীরা নিজেরাই বিশেষ ধরণের বনসৃজনের জন্য আগুন লাগায়। এতে শুকনো পাতা পুড়ে নতুন নতুন প্রজাতির গাছ জন্মায়। একে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত অগ্নিসংযোগ। জঙ্গলে ঝাড়পোছ করে সহজে এই চাষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। আজকাল ভারতে দাবানলগুলির বেশির ভাগ ঘটে মানুষের অবহেলায়। যেমন—বিড়ি, সিগারেট বা উনুন থেকে আগুন লেগে যায়। ১৯৯৯ সালে দীর্ঘস্থায়ী খরার সময় হিমাচল প্রদেশে বড় ধরণের দাবানল সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রতিটি দাবানলেরই হাজার হাজার হেক্টার জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯১৬ সালে শুরু হয়ে এক দাবানল ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত চলেছিল। মহাকাশ সংস্থার উপগ্রহ থেকে দেখা যায় উত্তরপ্রদেশের ৪টি পাহাড়ি জেলায় ২ লক্ষ সাড়ে এগারো হাজার হেক্টার বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে। ১৯৯৯ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৮০ হাজার হেক্টর বন ধ্বংস হয়েছে। আর ১৯৯৫ সালে উত্তর প্রদেশে ধ্বংস হয়েছে পৌনে চার লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চল।

নিবারণের ব্যবস্থা (Prevention) ঃ

দাবানল মূলতঃ মরসুমি। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে বা শুখা দিনে এগুলি ঘটে থাকে। ভারতে এখনও আধুনিক দাবানল নির্বাপক ব্যবস্থা চালু হয়নি। ইংরেজ আমলে বনের সীমান্ত অঞ্চল থেকে শুকনো পাতা কুড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হত। তার ফলে সেখানে বিভাজক অঞ্চল (বাফার জোন) তৈরি হত এবং তার পরে নালা কেটে রাখা হত। উন্নতদেশগুলি বেশি পরিমাণে জল বহন করতে পারে তেমন বিমানকে কাজে লাগিয়ে জল দিয়ে দাবানল নেভানো হয়। ভারতে অবশ্য এখনও তেমন ব্যবস্থা হয়নি।

হিমালয়ের তরুনতর পার্বত্য অঞ্চলে দাবানলের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা সে সব রাজ্য ও বিপজ্জনক অঞ্চলের আয়তন নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন।

নিচের সারণীতে তা দেওয়া হল —

	রাজ্য	আয়তন	বনাঞ্চলের আয়তন
১	মনিপুর	২২,১১ লক্ষ হেক্টর	৬ লক্ষ ২ হাজার হেঃ ২৭.২৩%
২	অরুনাচল প্রদেশ	৮৩,৭৪৩০০ হেঃ	৫১৫৪০০০ হেঃ ৬১.৫৫%
৩	অসম (পার্বত্য জেলা)	১৫২২২০০ হেঃ	২৯৬২০০ হেঃ ১৯.৪৯%
৪	সিকিম	৭১০০০০ হেঃ	২৫৭০০০০ হেঃ ২০.৮০%
৫	মেঘালয়	২২৪৩০০০ হেঃ	৯৪০০০০% হেঃ ৪১.৯১%
৬	মিজোরাম	২১০২০০০ হেঃ	১০০৩০০০ হেঃ ৬১.৯৯%
৭	ত্রিপুরা	১০৪৯১৬৯ হেঃ	৬০৬১৬৮ হেঃ ৫৭.৭৮%
৮	নাগাল্যান্ড	১৫১৩৭৭৪ হেঃ	৮৬২৫৩২ হেঃ ৫৬.৯৮%
৯	উত্তরপ্রদেশ (পাহাড়ী অঞ্চল)	৫৩৫৮৫৯৫ হেঃ	৩৪২৪৮৫৭ হেঃ ৬৩.৯১%
১০	জম্মু ও কাশ্মীর	৪৫০৫০০০ হেঃ	২৭৪৭০০০ হেঃ ৬০.৯৮%
১১	হিমাচলপ্রদেশ	৩৩৬৭৬০০ হেঃ	১০৪৬৯০০ হেঃ ৩১.০৯%

দাবানল সম্পর্কে সাবধানতা ঃ

১। দাহ্য পদার্থ ও আগুন লাগবার উপকরণ বনের দাহ্য বস্তু থেকে দূরে রাখতে হবে।

২। আগুন লাগতে পারে তেমন বস্তুর প্রতি নজর ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

৩। আগুন লেগে যেতে পারে তেমন বস্তুকে অহেতুক মজুত রাখা যাবে না। তবে প্রয়োজনে মজুত রাখতে হলে নিয়ম ও বিধিনিষেধ মেনে রাখতে হবে।

৪। বনাঞ্চলের কাছের কারখানা, কয়লাখনি, তৈল ভান্ডার, রাসায়নিক কারখানায় এবং বাড়ির রান্নাঘরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

৫। বাড়িঘর তৈরি বা খনি থেকে কয়লা তোলবার সময় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ঠিকভাবে রাখতে হবে।

৬। দাবানল সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখতে হবে। তারা নজর রাখবে ও প্রয়োজনে বিপদ সংকেত জানাবে।

৭। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা তথা দমকল ব্যবস্থাকে মাঝে মাঝেই মহড়া দিতে হবে।

৮। আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সূত্র ঃ NCDM পুস্তিক ও
ভারত সরকারের কৃষি দপ্তর

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রকৃতি কী রকম হয় ?

(Nature of Natural Disaster)

মানুষের সচেতনতা বাড়ানো মানুষকে জমায়েত করা দক্ষতা গড়ে তোলার প্রস্তুতি	পরিকাঠামো গঠন প্রতিষ্ঠান গঠন মানুষের কাজ	নীতি বিশ্লেষণ সমন্বয় ও জালিকা তৈরি, প্রভাব খাটানো ও উমেদারি

পরিণাম	ভূমিকম্প	ঘূর্ণীঝড়	জলোচ্ছ্বাস	বন্যা	খরা
মৃত্যু	বহু	সামান্য	বহু	সামান্য	সাধারণ
গুরুতর আঘাতে বিশেষ পরিচর্যা	বিপুল	মধ্যম মানের	সামান্য	সামান্য	সাধারণ
সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়ে	সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা থাকে। (সম্ভবত ভীড় ও স্যানিটেশনের জন্য হয়ে থাকে)				

পরিণাম	ভূমিকম্প	ঝড়	জলোচ্ছ্বাস	বন্যা	খরা
খাদ্যাভাব	কম (খাদ্যাভাব ছাড়া অন্য কারণে হতে পারে)	কম	সাধারণ	সাধারণ	সাধারণ
বড় ধরনের স্থানান্তর	কম (শহরাঞ্চলেও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে)	সাধারণ	সাধারণ	সাধারণ	
কমপুষ্টি বা দুর্ভিক্ষ	মাঝে মাঝে	কম	মাঝে মাঝে	মধ্যম মানের	সাধারণ

সূত্র : NCDM (New Delhi)

মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়
(Man made Disaster)

পরমাণু অস্ত্র/যুদ্ধ (Automic arms & war problems)

যুদ্ধ সাধারণ ভাবেই দেশে দেশে বিপর্যয় ডেকে আনে, অথবা যুদ্ধে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বাড়ে। যদিও যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা থাকে শুধু সরকারি উদ্যোগে সায় দেওয়া। অবশ্য ভিয়েতনামের যুদ্ধের মত কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রমনকারী দেশের মানুষদেরও শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হতে দেখা গেছে। পাশাপাশি আক্রান্ত দেশের মানুষের ঐক্য যুদ্ধ বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অক্ষমরা বেশি বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। এর চরম পরিণতি দেখা গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষপর্বে জাপানের দুটি অংশে পরমাণু বোমা ফেলার পরে। এতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। এই ঘটনার ৫৭ বছর পরে, (২০০২) লক্ষ লক্ষ বংশধর তেজস্ক্রিয়তা জনিত ক্যানসারে ভুগছে।

পরমাণু শক্তি সংশ্লিষ্ট আর একটি বিপর্যয় উৎস হল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনা। কয়েক বছর আগে তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনায় কয়েক হাজার মানুষ মারা যায়। এখনও সেখানকার দেড় লক্ষের বেশি মানুষ তেজস্ক্রিয় ক্ষয়রোগে ভুগছে।

জীবাণু যুদ্ধ বা জীবাণু সন্ত্রাস (Bio-terroism) ঃ

যুদ্ধ বা সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য জীবাণুর ব্যবহারের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এই যুদ্ধের উপকরণ জীবাণু সংরক্ষণ, বৃদ্ধি সাধন ও ব্যবহার খুবই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে হয়ে থাকে। এর পিছনে খরচও হয় প্রচুর। তাই খুব আর্থিক শক্তিশালী দেশ বা যাদের এই ধরণের সংগ্রহশালা বা গবেষণাগার আছে, তারা ছাড়া অন্য দেশ বা গোষ্ঠীর পক্ষে এই কাজ করা বেশ কষ্টকর। যেহেতু এই বিষয়ে কোটি কোটি টাকার দায় ভার থাকে তাই খুব অসংগঠিত ভাবে তার ব্যবহার দেখা যায় না। সোজা কথায় খরচায় পোষায় না।

এজেন্ট কী কী ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে (Agents) ঃ

Anthrax, Plague, Tularaemia যা বাতাসের সাহায্যে ভেসে নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে, চামড়ার মধ্যে দিয়ে, বা খাবারের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবশে করে। কখনও জলবাহিত রোগের জীবাণু জল সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে সংক্রমণ অনেক ব্যাপক আকার নেয়। এছাড়া আছে yellow fever, ডেঙ্গু (DHF) যার্ম সংক্রমিত জীবাণু মশার ও মাছির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন যুদ্ধের সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের উপর জীবাণু প্রয়োগ করা হয়েছে।

সাধারণতঃ কাদের উপর প্রযোজ্য হতে পারে?

এসবই শত্রু পক্ষের সৈন্যদের উপর, শত্রু দেশের বড় বা ছোট শহরের উপর এবং আন্তর্জাতিক সীমানার কাছাকাছি।

কী কী ভাবে প্রয়োগ হতে পারে?

- বাতাসের মাধ্যমে
- জল সরবরাহের মাধ্যমে
- প্রাণী সম্পদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটিয়ে
- বাহক বা ভেক্টরকে সংক্রমিত করে।

বিপদের পূর্বাভাস কী কী?

- অনেক মানুষের একই সঙ্গে একই ধরণের অসুখের হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়া
- অজানা রোগ ও তাতে বহু মানুষ বা প্রাণীর মৃত্যু
- অস্বাভাবিক ভাবে সংক্রমণ (যেমন বাতাসের মাধ্যমে Anthrax)
- এ ছাড়াও নানা রকম ভাইরাস যেমন Hantaa, Sbola, Gnanarito, Machnpo ইত্যাদির মারণযজ্ঞে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- অঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংক্রমণ
- সূত্রহীন জীবাণু সংক্রমণ
- মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয়।

বাঁধ ও শিল্প (Reservoir & Industry) ঃ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা হয়। বেশি বৃষ্টি হলে ঐ বাঁধ জলভারে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। এই আশঙ্কায় বাড়তি জল হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে গ্রামের পর গ্রামে বন্যা ও প্লাবন দেখা দেয়, সম্পদ নষ্ট হয়। এছাড়া দূষণ ও বড় বাঁধ ভেঙ্গে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে সব সময়ই।

শিল্প থেকে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কয়েক বছর আগে ভোপালে একটি কারখানার গ্যাস মিথাইল আইসো-সায়ানাইড লিক করে কয়েক হাজার মানুষ মারা যায়। এখন তার ১৭ বছর পরেও কয়েক লক্ষ মানুষ ঐ গ্যাসের প্রভাবে রোগ ভোগ করে চলেছে।

মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়ের অন্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে বন নিধনের জন্য মরুভূমি ও ভূমিক্ষয় সৃষ্টি এবং বিপুল জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সার্বিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে ও হতে থাকবে। এর ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা অবশ্যই প্রয়োজন।

মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়ের আর যে সব ঘটনা রয়েছে তার মধ্যে আছে সড়ক, রেল গাড়ি, বিমান প্রভৃতি দুর্ঘটনা। এইসব বিপর্যয়ে অবশ্য ব্যাপক সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয় না, হয় সীমিত সংখ্যক মানুষ। আর এগুলি সব সময় ইচ্ছাকৃত মানুষ সৃষ্ট বিপর্যয় নয়, কার্যকারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তবু এগুলি প্রাকৃতিক নয় এবং মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত। কখনো তা ভুলের জন্য হয়। আবার অন্য সময় অযোগ্যতা বা অসাবধানতার জন্য ঘটে থাকে। সাম্প্রতিক মানুষ সৃষ্ট বিপর্যয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বিমান আঘাতে বিশাল বিশাল বাড়ি ধ্বংস করার এবং আফগানিস্তানে বোমা বর্ষণে।

দাঙ্গা ঃ মানুষের সৃষ্টি আর এক বিপর্যয় হল দাঙ্গা, জাতি, সম্প্রদায় ও দেশ বিরোধী দাঙ্গায় জীবন ও পম্পদহানি ঘটে। এই ক্ষেত্রে সরকারি প্রসাশন পক্ষপাত দুষ্ট হলে ক্ষতি হয় বেশী।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ

(Disaster Preparedness measures)

- সময়মত, সঠিক ও ফলপ্রসূ প্রস্তুতির সাহায্যে বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা কমানো।
- সময়মত উপযুক্ত, কার্যকরী ও সংগঠিত প্রয়াস ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ত্রাণ সরবরাহ করা, চিকিৎসা ও পরিষেবা দুর্যোগ-পীড়িত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে কষ্টলাঘব করা।
- বিপর্যয়ের সঙ্কেত বা আভাস পাওয়ামাত্র সেই অঞ্চলের মানুষদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা।
- আর্থিক ও জীবনহানি সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো।

প্রাক্ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রস্তুতি (Pre-Disaster Preparation) বলতে কী বোঝায় ?

আমরা প্রাকৃতিক জগতে বসবাস করি। তাই আমাদের প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে ও মোকাবিলা করে যেতে হবে। কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন ও সজাগ থাকি ও সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করি তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশেই হ্রাস করতে পারি এবং এই কারণেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঠিক মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতির। শুধু সঠিক প্রস্তুতিই নয় প্রয়োজন জোরদার সম্মিলিত ও সময়মত পরিকল্পনা ও সমবেত প্রস্তুতির। সেই কারণেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করণ ও তার ভৌগোলিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকেই বিপর্যয়ের প্রকৃতি, প্রকটতা এবং দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল কোন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্দাজ করতে পারি।

স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

কী কী তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে (Information : need to collect) ঃ

(১) কোন কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল দুর্যোগ কবলিত হয়। বন্যা, খরা, ঝড়, সাইক্লোন, পাহাড়ে ধস ইত্যাদির মধ্যে কোনটি ঐ নিদিষ্ট অঞ্চলে আছড়ে পড়ে।

(২) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে দুর্যোগের কোন দিকে যাবার প্রবণতা বেশি থাকে?

(৩) দুর্যোগের তীব্রতা সাধারণত কেমন হয়?

(৪) কী ধরনের ক্ষতি হয়?

(৫) দুর্যোগের সময়সীমা অর্থাৎ কতক্ষণ বা কতদিন ধরে তা চলতে থাকে?

(৬) বন্যার জল গ্রামের কোন দিক থেকে আসে, কোথায় বেশি ও কম জমে থাকে? কোন কোন স্থান নিরাপদ? কোন অঞ্চল বেশি দুর্গত হয়?

(৭) আপতকালীন ব্যবস্থা কী ভাবে করা যায়?

দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানচিত্র স্থানীয় জনসাধারণের অংশ গ্রহণে ও অঞ্চল চিহ্নিত করণের মাধ্যমে (PLA* পদ্ধতিতে) বন্যা, খরা, ধস, ভূমিকম্প, সাইক্লোন প্রবণ এলাকার মানচিত্র তৈরি করা যেতে পারে। মানচিত্রটিতে বিভিন্ন অঞ্চলের দুর্যোগের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল

চরম ঝুঁকিপ্রবণ | **কম ঝুঁকিপ্রবণ** | **নিরাপদ স্থান**

মানচিত্রে এলাকাগুলি চরম ঝুঁকিপ্রবণ, কম ঝুঁকিপ্রবণ এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল পৃথক পৃথক ভাবে পৃথক রঙে চিহ্নিত করা উচিৎ। আপতকালীন আশ্রয় স্থল আগেভাগে চিহ্নিত হওয়া জরুরী। নিরাপদ স্থানে নির্মিত ত্রাণ শিবিরে দুর্যোগপীড়িত জনসাধারণ স্থানান্তর করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিরাপদ পানীয়জল, শৌচাগার, বর্জ্য পদার্থ নির্গমণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে অধিক সংখ্যক শৌচাগার নির্মাণের আগাম ব্যবস্থা রাখা দরকার।

ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ঘরবাড়ি কেমন হবে ? (Housing Structure)

ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের ঘরবাড়ি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দাপট সহ্য করার মত যথেষ্ট শক্তপোক্ত হয়। বন্যাপ্রবণ এলাকা হলে উঁচু পাটাতন করে অথবা পাকাবাড়ি হলে ভিত উঁচু করে তৈরি করা উচিত যাতে সহজে জল ঢুকতে না পারে। বাড়িগুলি এমনভাবে তৈরি করা উচিত যেন বন্যার জল বেরিয়ে যেতে পারে এবং ক্ষতি হলেও খুব সামান্যই ক্ষতি করতে পারে। শহরাঞ্চলে রাস্তার জল যাতে বাড়তে না পারে ও দ্রুত সরে যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

কোন কোন অঞ্চলে মানুষ বন্যা ও বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাঠের উঁচু পাটাতন করে তার উপর বাড়ি তৈরি করে। পশ্চিমবাংলায় কোন কোন অঞ্চলে কংক্রিটের পিলার তৈরি করে টিনের চাল ও বেড়ার দেওয়াল বানিয়ে বাড়ি তৈরি করা হয় যাতে অতি সহজেই এক জায়গা থেকে অন্যত্র অর্থাৎ বেড়া অথবা দেওয়াল খুলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আবার অবস্থা স্বাভাবিক হলেই বা জল নেমে গেলে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারে। বন্যায় টালির চাল ও বাঁশের দেওয়াল বেশি কার্যকারী।

*PLA = Participatory Learning Appraisal

বন্যা কবলিত অঞ্চলের মানুষ কী করবেন ?

বন্যা কবলিত অঞ্চলের জনসাধারণের সকলেরই সাঁতার জানা উচিৎ। বিশেষত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, যাদের বয়স পাঁচের উর্ধ্বে তাদের সকলেরই সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিৎ। নতুবা বন্যার জলে ভেসে গেলে ডুবে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং নোংরা জল পেটে ঢুকে জলবাহিত সংক্রামক রোগ, সর্দি, জ্বর ইত্যাদি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বন্যার জল যখন খুব বেগে কোন অঞ্চল প্লাবিত করে, তখন বৃদ্ধ ও ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে বন্যার জলের স্রোত তাদের ভাসিয়ে নিয়ে না যেতে পারে।

বন্যার সময় খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবহার সাবধানে করা উচিত। যদি মনে হয় খাদ্য বস্তুর মান সঠিক নয় তবে তা বাতিল করা উচিত। পানীয় জল অবশ্যই শোধন করে পান করা উচিত।

বিপর্যয় মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ (Disaster management training for volunteer)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বন্যা বা দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী থাকা প্রয়োজন। দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবীদের পর্যাপ্ত ও উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে রাখা উচিৎ। সেক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীরা বন্যার সময় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধার কাজে নেতৃত্ব দিতে পারে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীরা সেই এলাকায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে অঞ্চলের জনসাধারণকে দুর্যোগের সময় কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এবং কী কী সমস্যা আসতে পারে তার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা আগাম বলে দেবেন। বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর যোগ্যতা একজন সাধারণ কর্মীর চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশি। সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের সময় ছাড়াও সাধারণ অবস্থায় কোন অসুখ হলে সেক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞান কাজে লাগতে পারে।

দুর্যোগকে নিত্যসঙ্গী করেই বাঁচতে শেখা উচিত (Learn to live with disaster)

আমরা জানি প্রতিদিনই বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সালের মে মাসে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা 100 কোটিতে পৌঁছে গেছে। জনসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে নদী ও সমুদ্রের কাছের অঞ্চলে বা ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করেছ। আমরা এও জানি যে মিশরের লোকেরা অতীতে চাষবাসের জন্য নীল নদের তীরে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল, যদিও তারা জানত যে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় প্রতিবছরই তাদের যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে। সেই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ-এর



কিছু কিছু অঞ্চলের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য এবং সেই কারণেই আমাদের এই ধরণের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। যদি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের সকলের মধ্যে এই ধরণের লড়াকু মানসিকতা তৈরি করা যায় এবং দুর্যোগের মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কম হবে।

আর স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানীয় জল, জল পরিশ্রুত করার সঠিক পদ্ধতি, শৌচাগারের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্য কর্মীদের রোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই বাস্তব অবস্থা মোকাবিলার জন্যই বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রতি পাড়ায় জনসংখ্যা অনুপাতে এক বা একাধিক উঁচু পাকা বাড়ি তৈরি করে রাখতে হবে। যেখানে দ্বিতলে ও ছাদে প্রয়োজনে লোক থাকবে। একতলায় থাকবে গৃহপালিত পশুরা, সরকার বা পঞ্চায়েত থেকে ঐ বাড়ি তৈরি করে রাখতে হবে। বছরের অন্য সময়ে সেই বাড়ি অন্য কাজে, সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা যাবে। বিয়ে বাড়ি বা সভা সমাবেশের জন্য ভাড়া দিয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে। দেখাশোনার দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় কমিটির ওপর। এই প্রসঙ্গে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে সমস্ত স্কুল ও হাসপাতালগুলিকে দ্বিতল করার সরকারি সিদ্ধান্ত বেশ উপযোগী।

পরিপূরক শিক্ষার ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় ? (What is Complementary Education) ঃ

অভিজ্ঞতার নিরীখে দেখা গেছে যে, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলের জনসাধারণের অনেক সময় দীর্ঘদিন ত্রাণ শিবিরে দিন কাটাতে হয়। এইভাবে দীর্ঘদিন ত্রাণ শিবিরে থাকার দরুন অন্যান্য অসুবিধার সঙ্গে পড়াশুনারও দারুণ ক্ষতি হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা এবং যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সেই সব ছাত্র ছাত্রী। ত্রাণ শিবিরে ঘনবসতির মধ্যে পড়াশুনার তেমন অবকাশ বা সুযোগ থাকে না। সেই কারণে তাদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাদের পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যাতে তারা বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিতে পারে। যেখানে স্কুল বন্যার জলে ডুবে গেছে সেখানে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে সাময়িক কোন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং ঝড়ে স্কুলের টিনের চাল উড়ে গেলে বা ঘর ভেঙ্গে গেলে অর্থ সংগ্রহ করে মেরামতের ব্যবস্থা করা উচিৎ। দায়িত্ব মূলত সরকারের হলেও সাধারণ মানুষকে নিজ কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। অনেক জায়গায় স্কুলবাড়িগুলি অস্থায়ী ত্রাণ শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা (Agriculture loss Management) ঃ

দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে কৃষি সব সময়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামে গঞ্জে কৃষকরা ব্যাঙ্ক থেকে বা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কৃষিকাজে বিনিয়োগ করে এবং বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদির কারণে যখন কৃষি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন কৃষকদের খুবই করুণ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় এবং বারে বারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুণ কৃষকরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারে না। অনেক কৃষক এই পরিস্থিতিতে আত্মহননের পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। পরিস্থিতি চরম হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাই এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ দুর্যোগকালীন প্রয়োজন মেটাতে আপতকালিন শস্য ভান্ডার স্থাপন করা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ এলাকার মানুষের সংগঠিত সহযোগিতা ও প্রয়াসে ত্রাণ তহবিল খোলা ও চালানো যেতে পারে। এই তহবিল গ্রামসভা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিৎ। এই তহবিলের জমা টাকার সমস্ত হিসাব রাখতে হবে। অর্থাৎ কত টাকা জমা পড়ল, কত টাকা ঋণ দেওয়া হল অথবা কতজন ঋণ ফেরৎ দিল ইত্যাদি। আর শস্য ভান্ডারের ক্ষেত্রে মজুত শস্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত রাখা উচিৎ।

তৃতীয়তঃ সেই অঞ্চলের পুষ্টিগত মান উন্নয়নের জন্য এলাকার সকলকে সব্জী বাগান করে তরিতরকারি উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। উপরন্তু কী উপায়ে

রান্না করলে পুষ্টিগত মান বজায় থাকবে এবং খাদ্যগুণ নষ্ট হবে না সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ধারণা দিতে হবে।

চতুর্থতঃ প্রতিটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে ফসলের বীমা করা দরকার।

নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা (Area based specific Disaster Management) ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের মানুষের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সম্ভাবনা অনুমান করার নিজস্ব পদ্ধতি কী কী রয়েছে অর্থাৎ কীভাবে বোঝা যাবে যে কখন বন্যা আসতে পারে বা প্রবল ঝড় হতে পারে এবং এলাকার মানুষ যুগ যুগ ধরে কীভাবে অনুমান করতেন যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে তা জানতে হবে এলাকার বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। এই সব দেশজ প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জলের রং, তাপমাত্রা, বাতাসের গতি, কীটপতঙ্গের গতিবিধি ও অন্যান্য লক্ষণ দেখেই অনুমান করতে পারেন যে দুর্যোগ কতটা চরম আকার ধারণ করতে পারে।

স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ (Collection of local resources) ঃ

প্রতিটি গ্রাম, অঞ্চল ও ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব কিছু না কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই প্রয়োজন হলে সেই গুণাবলী ও সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো দরকার। সম্পদগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে দুর্যোগ অনেকটাই প্রতিহত করা যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়। দুর্যোগের সময় যথেষ্ট লোকবলের প্রয়োজন হয় এবং এক একটি এলাকায় ডাক্তারের সংখ্যা থাকে খুবই কম। তাই স্থানীয় নেতা, পঞ্চায়েত সদস্য এমনকি হাতুড়ে ডাক্তারদেরও এই সময় কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে ডাক্তারদের সাহায্যই সব থেকে বেশি প্রয়োজন। ডাক্তারী ছাত্রদের সাহায্য বিশেষভাবে পাওয়া যেতে পারে। কারণ, তাদের উৎসাহ ও উদ্যম প্রচুর।

আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তাদের অনেকে আবার দুর্যোগ কবলিত জনসাধারণের আশ্রয় ও নিরাপদ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। প্রত্যেক অঞ্চল বা গ্রামে কিছু ফাঁকা জায়গা বা ফাঁকা ঘরবাড়ি থাকে সেই জায়গাগুলোকে দুর্যোগের সময় ত্রাণশিবির হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাঁধের জল নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Dam water) ঃ

পশ্চিমবাংলায় কোন কোন অঞ্চলে বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়ার দরুণ হঠাৎ করে সেই এলাকা প্লাবিত হয়। এই ধরণের আকস্মিক কৃত্রিম প্লাবনের দরুন বহুমানুষ ও পশু প্রাণ হারায় এবং বহু সম্পদেরও ক্ষতি হয়। এ ধরনের আকস্মিক সিদ্ধান্ত ও তার



রূপায়ণের দরুণ অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সেই কারণে বাঁধের জল ছাড়ার আগে এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে তারপর জল ছাড়া উচিৎ। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস (Weather Forecasting) ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের একটি বিশেষ অঙ্গ হল আবহাওয়া সম্পর্কিত খবরাখবর রাখা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত অনেক আগে থেকেই আবহাওয়ায় কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সেই অনুযায়ী দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি অন্য সংকেতের অপেক্ষায় বসে না থেকে পুরোনো সঙ্কেত অনুযায়ী কাজ শুরু করতে পারেন। দেখা যায় যে জোয়ার আসার সময় বন্যার সমস্যা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপায়। তাই জোয়ারের সঠিক সময় সকলকে জানাতে হবে এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে, বিশেষ করে যারা নদী তীরে বা সমুদ্রের উপকূলে বসবাস করেন। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এসম্পর্কে অর্থাৎ জোয়ার-ভাটার সময় ও তীব্রতা সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে।

অন্তর্বর্তী সমন্বয়-সাধন (Interim Co-ordination) :

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বন্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি ও সমন্বয় সাধনের উপর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই নির্ভর করে। এটাও দেখা গেছে যে, নিজেদের মধ্যে একতা ও সমন্বয়ের অভাবের দরুণ দুর্যোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি বিলম্বিত হয়। এছাড়াও দলাদলি, মনোমালিন্য, অহেতুক আত্মসম্মান বোধ, অহঙ্কার ইত্যাদি নানা কারণে অনেক ক্ষতি হয়। দুর্যোগ প্রতিরোধে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করনীয় থাকে। দুর্যোগের সময় নিজের পদমর্যাদা বা আত্মসম্মানের কথা না ভেবে কীভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় উপরোক্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে মানুষ বিপর্যয় কালে কাজ করলেও পরবর্তীকালে তা আর থাকে না, যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

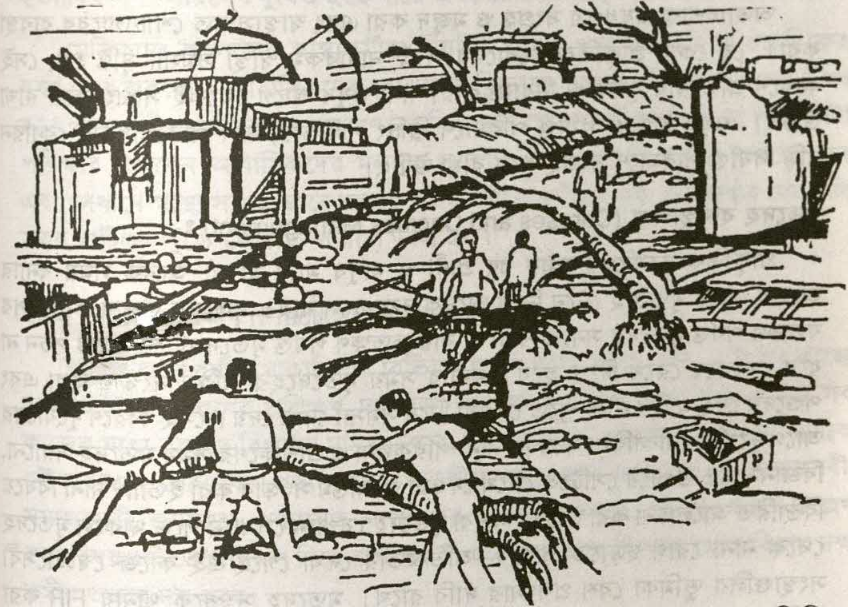
খাদ্য মজুত (Food Storage) রাখার সুযোগ সুবিধা গুলি কী কী ?

বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সবচেয়ে বেশি দুরবস্থা হয় মানুষের। মানুষকে দিনের পর দিন জলবন্দী হয়ে থাকতে হয় এবং তারা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে পারে না। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মানুষের দুর্গতির অন্ত থাকে না। এই জলবন্দী অবস্থায় থাকার সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে এই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগে থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করে রাখার বন্দোবস্ত থাকা দরকার। এই সঞ্চয়ের পদ্ধতি প্রত্যেকে নিজের বাড়িকে কাজে লাগাতে পারেন এবং এসব এলাকাভিত্তিক ভাবেও করা যেতে পারে। অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখলে একদিকে যেমন হাতের কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে, তেমনি অসময়ে অহেতুক বেশি দাম দিয়ে কেনার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় আগে থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঞ্চয় করে রাখার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তবে খাদ্য বস্তু বিজ্ঞান সম্মত ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে সঞ্চিত রাখা উচিৎ। খাদ্য দ্রব্যের মত জরুরী ওষুধপত্রও আগে থেকে সংগ্রহ করে রেখে দেওয়া যেতে পারে। তবে ডাক্তার দ্বারাই চিকিৎসা করানো উচিৎ।

যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত (Transportation Management) :

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুন মানুষের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। সেই সময় মানুষকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত এবং যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকলে ত্রাণ সামগ্রী সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া যায় না। গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না এবং বিনা চিকিৎসায় মানুষ প্রাণ হারায়। সেই কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে থেকেই ত্রিপল, তাঁবু, নৌকা, ভ্যান, রিক্সা,

অ্যামবুলেন্স, হেলিকপ্টার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রাখা উচিৎ। এমনও দেখা যায় যে, কোথাও সেতু যাতায়াতের অযোগ্য বা রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ থাকার দরুণ ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো যাচ্ছে না। সেই সব অঞ্চল আগে থেকেই চিহ্নিত করে সেতু মেরামত করে রাখা উচিত যাতে সময়মত সব ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং যানবাহন সহজেই ঢুকতে ও বেরোতে পারে এমন জায়গায় সেগুলি রাখতে হবে। তা হলেই পরিস্থিতি অনেক সহজ হয়ে যাবে।



গ্রামীণ এলাকায় তিন চাকার ভ্যান রিক্সা বিশেষ সহায়ক। দরকার এলাকাভিত্তিক যানবাহনের তালিকা তৈরি করা। এগুলি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। নৌকার জন্য উন্নয়নমূলক সংস্থার বিশেষ আগ্রহ দেখানো উচিৎ। জরুরী প্রয়োজনে সরকারি দপ্তর ও জনসাধারণ যাতে সেগুলি ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে, ভালভাবে সংরক্ষণ ও মজুদ রাখতে হবে। আজকাল সাইকেল অ্যাম্বুলেন্সের চল হয়েছে। খুব সহজেই গ্রামীণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা তৈরী করা যায়।

সচেতনতা শিবিরের (Awarness Camp) আয়োজন কেন করবেন ?

জনসাধারণকে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া দুর্যোগ প্রতিরোধের অন্যতম হাতিয়ার। জনসাধারণকে সঠিক প্রশিক্ষণ দিলে প্রয়োজনে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হবে। তার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

(১) জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘব করা।

(২) অভ্যাস, আচরণ, মানসিকতা ও ধারণার সদর্থক পরিবর্তন।

(৩) প্রয়োজনীয় জ্ঞানের হস্তান্তর এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(৪) উন্নতমানের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৫) ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো।

অত্যাবশ্যক ওষুধপত্র সংগ্রহ ও মজুদ করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরই নানারকম স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেই কারণে প্রতিরোধ মূলক ও নিরাময়কারী নানা ওষুধ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখা উচিৎ। ওষুধ ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্লিচিং পাউডার, জল পরিশোধনের ক্লোরিন বড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করে রাখা উচিৎ।

মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা (Corpses and Cacrass Management) ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বহু প্রাণী ও মানুষ মারা যায়। অনেক সময় বন্যার জলের স্রোত মৃতদেহ টেনে নিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করার পর যতক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহ সনাক্ত করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহটিতে যাতে পচন না ধরে সেভাবে রেখে দিতে হবে। বন্যার সময় মৃতদেহের অন্তিম সংস্কার করা এবং পশুদের দেহ মাটির নীচে পুতে দেওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সেই কারণে দুর্যোগের আগে দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত নানা পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের সময় মৃতদেহ সরানো, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সেটিকে রেখে দেওয়া ও অন্তিম সংস্কার করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা উচিৎ। নতুবা মৃতদেহ যেখানে সেখানে পড়ে থাকলে মৃতদেহ থেকে নানা রোগ ছড়াতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই কাজে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ভূমিকা বেশ প্রশংসার দাবি রাখে। মৃতদেহ সম্পর্কে থানায় FIR করা ক্ষতিপুরণ পাওয়াও সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ।

টেলি যোগাযোগ (Telecommunication) ব্যবস্থা ঃ

দেখা যায় সাধারণ টেলি ব্যবস্থা বড় দুর্যোগের সময় একেবারে উপযোগী থাকে না। তখন উপগ্রহ মারফৎ টেলি যোগাযোগ বেশ কার্যকারী। আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন এই উপগ্রহ ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে থাকে ও সমুদ্রে যে সব জাহাজ চলাচল করে মূলত তারাও উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ রেখে চলে। যে সব জেলে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় তাদেরও উপগ্রহ মারফত খবরের আদান প্রদান ব্যবস্থা থাকা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়।

বন্যার সময় দেখা যায় কিছু গ্রাম বেশ কয়েক দিন বিচ্ছিন্ন থাকে। সেখানে খবর আদান প্রদানের জন্য অস্থায়ী বেতার ব্যবস্থা ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বোপরি Mobile Phone এই পরিস্থিতিতে যুগান্তকারী উন্নতি আনতে সক্ষম। Mobile Phone -এর ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে বিশেষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে যথেষ্ট উপযোগী।

পরিবেশ পরিস্কার রাখা ঃ

দুর্যোগের সময় সাধারণভাবে স্কুল কলেজ ও সাধারণ আবাসনে বা পথের ধারে অনেক মানুষকে একত্রে গাদাগাদি করে ত্রাণ শিবিরে অনেকদিন থাকতে হতে পারে। এত লোকের মল-মূত্র ত্যাগ, রান্না খাওয়া, ইত্যাদির জন্য শীঘ্রই ত্রাণ শিবিরের চারদিকটা দুষিত হয়ে রোগ ছড়াতে পারে, তাছাড়া দুর্যোগে মৃত পশুপক্ষী ইত্যাদির মৃতদেহ ইত্যাদির পণ্য পরিবেশ দুষিত হতেপারে এবং রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে।

মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে চারদিকের দুষণ রোধ করবেন। আবাসিকদের বোঝাবেন কিভাবে নোংরা পরিবেশ রোগের উৎস হতে পারে, এই আবাসিকগণ, সাধারণ নাগরিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সবাই মিলে পরিবেশটা পরিস্কার রাখবেন আবাসিকদের মলমূত্র ত্যাগের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেখানে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে মলমূত্র ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। মরা জীবজন্তুর দেহগুলি সত্বর মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারলে ভাল হয়।

হাতে কলমে প্রশিক্ষণ (Practical Training) ঃ

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। এই সব কাজে দরকার বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ, তা ছাড়া অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কাজে লাগে। এই সব কাজের মধ্যে রয়েছে বিপর্যস্ত মানুষ উদ্ধার, সাঁতার জানা, প্রথামিক চিকিৎসা, যান্ত্রিক নৌকা চালনা, যোগাযোগ পদ্ধতি জানা। জরুরী অবস্থায় এসব কাজে লাগে। স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী, জননেতা, পঞ্চায়েত সদস্য, পুর ও পঞ্চায়েতকর্মী, প্রমুখের আগে উল্লেখ করা বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখা ভাল। এটা করা হলে বিপর্যয় মোকাবিলায় দক্ষ কর্মীর অভাব দূর হবে।

গ্রাম স্তরের পরিকল্পনা (Village level Disaster Mitigation Plan) ঃ

স্থানীয় ভাবে বিপর্যয় প্রতিকারের কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এই জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণ ও সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। এতে লাভ হল এই যে, স্থানীয় মানুষ জানেন কখন কোথায় বিপর্যয় হতে পারে এবং কীভাবে তার মোকাবিলা করা সম্ভব। তার চেয়েও বড় কথা হল তাঁরা এটাও জানেন যে, কোন সাধারণ কাজটি, যেমন বাঁধ মেরামত, নিকাশী ব্যবস্থা প্রভৃতি, করা হলে বিপর্যয় প্রতিহত করা সম্ভব। এই সব পরিকল্পনা রূপায়ণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সরকারি সহায়তা অবশ্যই প্রয়োজন। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে আগেই উদ্যোগী হতে পারেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে বিপদ শুরু হবার আগেই স্থানীয় সাধারণ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী, জনপ্রতিনিধি, সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করা দরকার। সেখানে স্থানীয় সম্ভাব্য দুর্গত অঞ্চল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, প্রসূতি ও গর্ভবতী

এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের তালিকা করা দরকার। বিপর্যয় কালে কোথায় আশ্রয় নেওয়া যাবে। কিভাবে সেখানে পৌঁছানো যাবে এবং ত্রাণ শিবির কিভাবে পরিচালিত হবে তা ঠিক করে রাখতে হবে। এছাড়া কে কোন দায়িত্ব পালন করবে তা ঠিক করা দরকার। গ্রামস্তরে এই পরিকল্পনা আগে থেকে করা থাকলে বিপর্যয়কালে কাজ বোঝা হয়ে দেখা দেবে না এবং মানুষের দুর্গতিও কম হবে।

এই প্রসঙ্গে দুটো পদ্ধতির করা বলা যেতে পারে। এটা হল "**কাজ করতে করতে শেখা**" এবং "**শিখতে শিখতে কাজ করা।**" এদের বলা হয় সহভাগী পরিকল্পনা রচনা। এর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা রচনা করে। যেহেতু পরিকল্পনা রচনাকালে তাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অংশ থাকে তাঁরা এটা বিশ্বাস করে যে এর প্রতি তাঁদের একটা নিজস্ব দরদ ও দায় বদ্ধতা থাকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরা যুক্ত থাকেন বলে সব সময়ই সে কর্মসূচি কার্যকরী হয়ে থাকে। এই ধরণের সহভাগী কর্মসূচিকে পাটিসিপেটরি, লার্নিং, এপ্রাইজাল (PLA) বা পার্টিসিপেটরিয়াল এপ্রাইজাল (PRA) বলা হয়ে থাকে।

প্রাক্‌বিপর্যয় কালে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতিপর্বে এই পদ্ধতি বিশেষ সমাদৃত এবং দুর্যোগ কালে ও পরে বিশেষ কার্যকরী। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, স্বাস্থ্য সমীক্ষা, পুষ্টির অবস্থা, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় ভাবে অসুস্থতার হ্রাস বৃদ্ধি সময়কাল জানা ও জানানো সহজতর হয়।

যখন আমরা দুর্যোগের মুখোমুখি
(When we face Disaster)

বন্যার সময় জল থেকে উদ্ধারের পর প্রাথমিক শুশ্রূষা ও স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব ঃ

বন্যার সময় জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনা অনেক বেশি ঘটে। বিশেষ করে Flash Flood হলে। তাতে শুধু মানুষই নয় অনেক প্রাণীও মারা যায়। তাই আগে থেকে নিরাপদ স্থানে যাওয়া সব সময়ই বাঞ্ছনীয়।

কীভাবে জলে ডোবা ব্যক্তিকে শুশ্রূষা করা উচিৎ ঃ

জলে ডোবা ব্যক্তিকে উপুড় করে শুইয়ে দিন। তার মাথাটি এক পাশে ঘোরান থাকবে এবং হাত দুটি মাথার পাশ দিয়ে উপরদিকে ছড়ান থাকবে। মুখে বা গলায় কিছু আটকে থাকলে (কাদা, বালি, শ্লেষ্মা ইত্যাদি) জিভ সামনের দিকে টেনে খুব দ্রুত দু-আঙ্গুল রোগীর মুখে ঢুকিয়ে তা বার করে দিন।



ফুসফুস থেকে জল বের করে দেওয়ার জন্য পেটের দুপাশ দিয়ে জলে ডোবা ব্যক্তির দেহ দুহাতে জড়িয়ে তার শরীরের মাঝের অংশটি তুলে ধরুন। মুখ থেকে কাদা, আগাছা, ময়লা ও নকল দাঁত (যদি থাকে) বের করে দিন।

শুইয়ে ঐ ব্যক্তির মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে থাকুন যাতে ফুসফুসে বায়ু সঞ্চার হয়।

ভিজে জামা কাপড় ছাড়িয়ে দিন।

চাদর, কম্বল ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা দিয়ে জলে ডোবা ব্যক্তির শরীর গরম রাখুন।

জ্ঞান ফিরে এলেও রোগীকে কিছুতেই উঠে বসতে দেবেন না। গরম পানীয় খেতে দিন। যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যান।

শ্বাসকষ্টের কীভাবে মোকাবিলা করা উচিৎ (Breathing problem management) ঃ

বন্যার সময় বহুক্ষণ জলে ভেজা ও ভেজা জামাকাপড় পরে থাকার ফলে প্রচন্ড সর্দিকাশি হতে পারে এবং জ্বর দেখা দিতে পারে।

শিশুর জ্বর বেশি হলে, জোরে জোরে শ্বাস নিলে ও তার বুকের মাঝখানটা ওঠা নামা করতে থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এই অবস্থায় শিশুকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া খুবই জরুরী।

অসুস্থ শিশুকে মায়ের দুধ ও অন্যান্য তরল ও স্বাভাবিক খাবার দেওয়ার দরকার।

জ্বরাক্রান্ত রোগীর শরীর অতিরিক্ত কাপড়চোপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন না।

কানে ব্যথা, পুঁজপড়া ও গলার ব্যথায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা ভীষণ আকার নিতে পারে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ খুবই জরুরী।

শ্বাসকার্য পুনরায় চালু করার পদ্ধতি ঃ

(১) রুগী (ব্যক্তি) কে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার চিবুক ধরে সামনের দিকে টানুন যাতে কপাল একটু নীচের দিকে চলে যায়। এর ফলে গলা অনেকটা সরল আকারে নেবে। এবং বাতাস ঢোকার সুবিধা হবে। (জিভ পিছন দিকে যাবে না ও শ্বাসনালীর পথ খুলে যাবে)

(২) দু আঙুল দিয়ে টিপে রোগীর নাকের ফুটো বন্ধ করে, তার মুখ খুলে তার মুখ আপনার মুখ দিয়ে ঢেকে তার ফুসফুসের ভেতর জোরে ফুঁ দিতে হবে যাতে রোগীর বুক উঁচু হয়ে ওঠে।

(৩) মিনিটে ১৫-১৬ বার এরকম করতে হবে। প্রতিবার ফুঁ দেওয়ার আগে একটু থামুন, যাতে আগের ফুঁ এর বাতাসটি বের হয়ে যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস দেখার পাশাপাশি কব্জিতে রেডিয়াল ধমনীর অথবা গলার পাশে ক্যারোটিড ধমনীর স্পন্দন দ্রুত দেখে নিয়ে হৃদযন্ত্রকে সচল করতে নীচের পদক্ষেপগুলি নিন ঃ—

(১) রোগীকে শক্ত জমিতে চিৎ করে শুইয়ে দিন।

(২) উদ্ধারকারী রোগীর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে রোগীর বুকের ঠিক মাঝখানের হাড়ের (sterum) তলার দিকে (নীচ থেকে দু' আঙুল উপরে) হাতের তালু একটির উপর আরেকটি রেখে জোরে জোরে চাপ দেবেন। এমনভাবে চাপ দেবেন যাতে হাড়টি প্রায় দু'ইঞ্চি নেমে যায়। এরকম মিনিটে ৬০-৭০ বার করতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে এক হাত দিয়ে, এবং নবজাতকদের ক্ষেত্রে দু' আঙুলের ডগা দিয়ে মিনিটে ১০০-১২০ বার চাপ দিতে হয়। প্রতি ১৫ বার চাপ দিয়ে দু'বার মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখুন। যদি এই চিকিৎসায় ফল হয় তবে,

(ক) ক্যারোটিড ও রেডিয়াল ধমনীর স্পন্দন ফিরে আসবে

(খ) চোখের তারার সংকোচন-প্রসারণ হবে (চোখে আলো ফেলুন)

(গ) শরীরের/মুখের ভেতরের নীলচে ভাব ফিকে হয়ে আসবে

(ঘ) স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হবে।

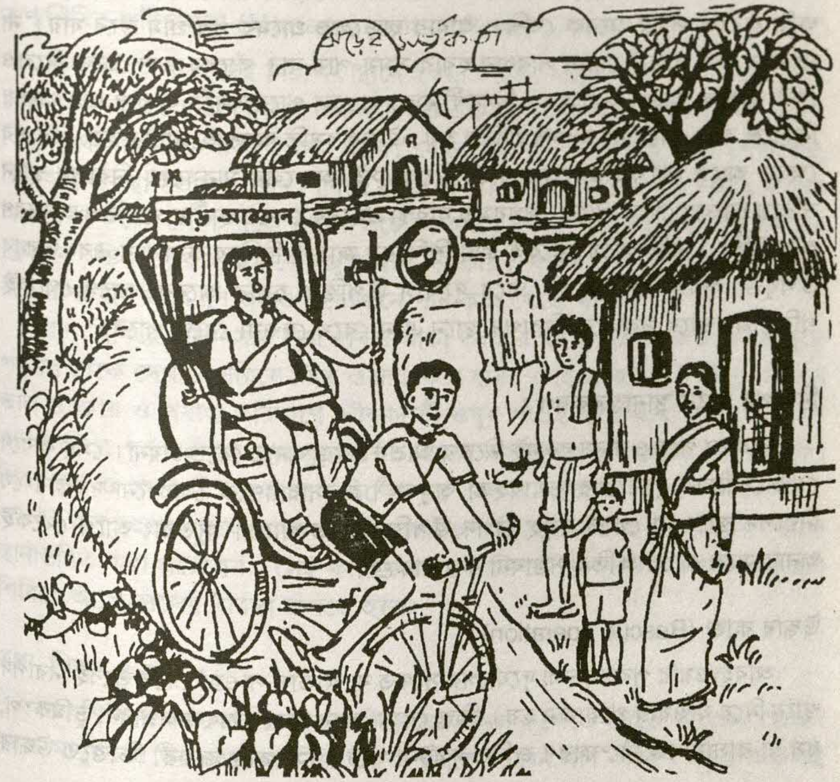
(সূত্র ঃ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন ডাক্তার নেই ঃ শ্রমজীবী স্বাস্থ্য-উদ্যোগ)

দুর্যোগের মুখোমুখি হলে কী করা উচিৎ

(What to do when we are facing disasters)

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও পরিবেশের সর্বশেষ অবস্থা, কোন ধরণের দুর্যোগের সম্ভাবনা ইত্যাদি অনুমান করার জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছে। যার মাধ্যমে অনেক আগেই পরিস্থিতি কতটা সঙ্কটজনক হবে তার কিছুটা অনুমান করা যায়।

প্রচার মাধ্যম, তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দরুন জনসাধারণকে সময়মত সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সাবধান করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সতর্কবার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার পর জনসাধারণের কাছে পৌছাতে যেন দেরী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অনেক সময় আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষের কাছে তা সময়মত পৌছায়নি। তার ফলে কোন সতর্কতা



অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। আবার অনেক সময় এটাও দেখা গেছে যে, পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও সেই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সঙ্কেতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে NGOদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি গ্রাম ও প্রতিটি অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবীদের কর্তব্য হল, সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কী বা বিপদ সংকেত কী ও তা কীভাবে বোঝা গেছে সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও সময়মত সংকেতবার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। কোন কোন দুর্যোগের ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকম্প, বাধ ভেঙ্গে পড়া বা রাসায়নিক দ্রব্য জনিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আগে থেকে সঙ্কেত দেবার কোন সুযোগই থাকে না এবং সেই কারণেই এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ও ক্ষতির পরিমাণও হয় বেশি।

তবে আশা করা যায় যে, সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কম করা যেতে পারে।

অনেক সময় নদীর নাব্যতা হ্রাসের দরুণ নদীপাড় উপচে জল চতুর্দিক প্লাবিত করে অথবা পলি জমে থাকা বাঁধে জল ধারণ ক্ষমতা কম থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়তি জল ছেড়ে দিতে হয়। এই জল না ছাড়লে বাঁধ ভেঙ্গে নিয়ন্ত্রণহীন জল ক্ষতি করতে পারে অনেক বেশি। আবার ছাড়লেও গ্রামের পর গ্রাম ডুবে যায়। না জানিয়ে জল ছাড়ায় মানুষ সাবধান হবার সময় পায় না। বাঁধের জল ছেড়ে দিলেও সেই অঞ্চলে কৃত্রিম বন্যা হয়। নিকাশী নালা বা খাল পারে বসতি বা বাঁধ জল থাকায় নিকাশে বাধা পেয়ে বহু অঞ্চল প্লাবিত হয়। ঐ সব বসতি অবশ্যই প্লাবিত হয়। এই সব ক্ষেত্রে আগে থেকেই সংকেত বার্তা দিলে সেই অঞ্চলের মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সময়মত ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে স্থানীয় পদ্ধতিও অনুসরণ করা উচিৎ। যদি আগে থেকেই ত্রাণ শিবিরের জায়গা চিহ্নিত করা যায় এবং থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়, তবে দুর্যোগ উপস্থিত হবার অনেক আগে থেকেই পরিকল্পিতভাবে সকলকে নিরাপদ স্থানে এনে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরকরণ ঃ

দুর্যোগে পড়েও মানুষ কখনই নিজের আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র যেতে চায়না। সেই কারণে স্বেচ্ছাসেবীদের দুর্যোগের ভয়াবহতা অনুযায়ী জনসাধারণকে বোঝানো দরকার যে নিরাপদ স্থানে না গেলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হতে পারে। সুতরাং আগে থেকেই অন্যত্র সরে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকবে।

উদ্ধার কাজ (Rescue operation) ঃ

আবহাওয়ার পূর্বাভাস বা দুর্যোগের সঙ্কেত বা আভাস পাওয়া গেলে তবেই নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন কোন সময় হঠাৎ জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, ধস বা রাসায়ণিক বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধার

কাজ চালানো হয়। বন্যার সময় উদ্ধার কাজ কী কী উপায়ে কোন কোন স্থানে পরিচালনা করা প্রয়োজন বন্যার আগেই সে বিষয়ে সমীক্ষা করে বন্দোবস্ত করে ফেলা উচিত। যেমন নৌকা, স্পিডবোট, সাইকেল, ভ্যান ইত্যাদি কোথায় কোনটা পাওয়া যাবে এবং কাজে লাগবে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী বা পঞ্চায়েত, ব্লক এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের সর্বশেষ পরিস্থিতি কী, কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কীভাবে তার সমাধান সম্ভব ইত্যাদি বিষয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারেন। এছাড়াও খুব সহজেই সাইকেল স্ট্রেচার-এর ব্যবস্থা করা যায়।

সাময়িকভাবে বন্যার্ত মানুষদের কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে তারপর হেলিকপ্টার, নৌকা, স্পিডবোট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসনকে সমস্ত ঘটনা, যেমন কী ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে, কোন মহামারির সম্ভাবনা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাদের জানানো উচিৎ। তাছাড়া গুরুতর প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে উদ্ধার ও ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ত্রাণ শিবির পরিচালনা (Management of Relief Camp) ঃ

ত্রাণ শিবির সবসময়ই নিরাপদ স্থানে হওয়া উচিত, যাতে বানভাসী মানুষের আর কোন ক্ষতি না হয়। ত্রাণ শিবির এমনভাবে ও এমন জায়গায় করা উচিত যেখানে বেশ কিছুদিন থাকার সমস্ত ব্যবস্থাই করা সম্ভব। যেমন নিরাপদ পানীয় জল, খাদ্য, শৌচাগার, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি। ত্রাণ শিবিরে বসবাসকারী দুর্গত মানুষরা যাতে পানীয় জলের অপচয় না করেন সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে। ক্যাম্পে জল পরিশোধনের ক্লোরিন বড়ির প্রচুর পরিমাণে মজুত রাখা দরকার। বৃষ্টির জল যদি পরিষ্কার পাত্রে ধরে রাখা যায় তবে সে জলও প্রয়োজনে পান করা যেতে পারে।

ত্রাণ শিবিরে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার যাতে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে শুশ্রূষা করা যায়। সেই সঙ্গে ত্রাণ শিবিরে একজন ভাল ডাক্তার ও পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবনদায়ী ওষুধ সংগ্রহ করে রাখা উচিৎ। কারণ ত্রাণ শিবিরে গর্ভবতী মা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু এদের অসুস্থ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতী মহিলাদের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। হঠাৎ করে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিংবা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। সেই কারণে অসুস্থ ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করার জন্য ত্রাণ শিবিরে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তথ্য, শিক্ষা ও জ্ঞান ঃ

ত্রাণ শিবিরে থাকাকালীন ছাত্রছাত্রীরা যেমন স্কুল কলেজে যেতে পারে না তেমনি বয়স্ক মানুষরাও তাদের নিজ নিজ কাজে যেতে পারেন না। কারণ সমস্ত অঞ্চলই

থাকে জলমগ্ন। তাই ত্রাণ শিবিরেই কোনমতে দিনাতিপাত করতে হয়। সেই কারণে বন্যার্ত মানুষকে প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক নানা ধারনা দেবার এটাই উপযুক্ত সময়। ত্রাণ শিবিরে বসবাসকারী মানুষদের জানানো উচিত যে বন্যার সময়, বন্যার আগে ও পরে কী কী ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই সময় কী কী ধরনের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তার প্রতিকার কী ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন জলাধার ও পানীয় জল কী উপায়ে পরিশোধন করা উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে জানানো প্রয়োজন। ত্রাণ শিবিরে থেকে নিজ নিজ বাসগৃহে ফিরে আসার সময় তাদের ব্লিচিং পাউডার ও জল পরিশোধনের রাসায়নিক বড়ি ইত্যাদি দেওয়া দরকার।

ত্রাণ শিবিরে থাকাকালীন বন্যার্ত মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোষ্টার ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি টাঙানো যেতে পারে। এছাড়া ত্রাণ শিবিরে ভিডিও শো-এর বন্দোবস্ত করলে একদিকে যেমন জ্ঞান বাড়বে অন্যদিকে তেমনি একঘেয়েমিও কাটবে।

নজরদারি ও দেখাশোনা করা ঃ

দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে দেখাশোনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত প্রতিরোধ ও নিরাময় মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরীক্ষা নিরীক্ষাও নজরদারীর জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা উচিত যাতে সেই ব্যক্তি সব কিছু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করে সময়মত সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন। বন্যায় কী কী ক্ষতি হয়েছে তা দেখে ও বিশ্লেষণ করে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে আর যেন বিশেষ কোন ক্ষতি না হয়। যেমন বন্যার সময় সাপের গর্তে জল ঢুকে যাবার দরুণ সাপ গর্ত ছেড়ে লোকালয়ে এসে ঢুকে পড়ে। তাই সাপ তাড়ানোর ব্যবস্থা, সাপ ঘরের কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজে দেখা অথবা কাউকে সাপে কাটলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

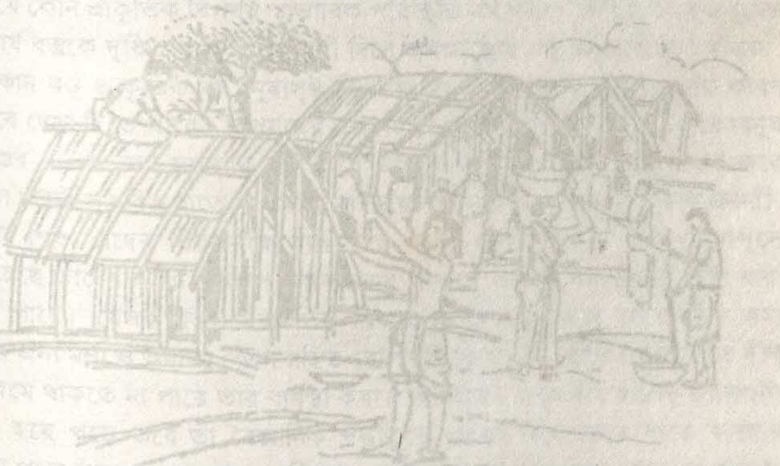
বিকল্প আয় ঃ

প্রতিটি বাড়িতেই জরুরী প্রয়োজনের অভাব মেটাতে ও পুষ্টির যোগান দিতে ঘরের কাছে সবজির বাগান করায় সবাই উদ্যোগী হতে পারেন। এছাড়া জরুরী অবস্থার সময় মানুষ ত্রাণ শিবির, রেল লাইনের ধারে, বাঁধের ওপর বা রাস্তার পাশে থাকতে বাধ্য হয়। তখন তাদের শুধু ত্রাণের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অথচ ত্রাণ ছাড়াও মানুষের প্রয়োজন হয় অর্থের। যে সব কাজের মাধ্যমে উপার্জন করা যায় তার মধ্যে রয়েছে গাড়ি চালানো, চায়ের দোকান, মুদিখানা, পড়ানো, রাতে পাহারা, সংবাদ বাহক, দিন মজুরী, পানীয় জল সরবরাহ, নৌকা চালনা, ট্র্যাকটর চালনা প্রভৃতি। বিপর্যয়ের সময় ও তার পরেই ধূর্ত ব্যবসায়ীরা মজুদদারী ও চোরা বাজারীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই অবস্থা ঠেকাতে উদ্যোগী হওয়া যায়। এছাড়া চেতনা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন, যাতে অন্য সব শিবিরবাসী উপার্জনে উৎসাহী হয়।

দৈহিক নিরাপত্তা (Physical Security) ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বহুলোক একই জায়গায় এক অসহায় অবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। এর ফলে দুষ্কৃতিরা সেই অসহায়তা ও সংশ্লিষ্ট অসাবধানতার সুযোগ নেয়। কোথাও কোথাও লুঠপাটের খবরও পাওয়া যায়। এই সময় অসহায় মহিলা, বালিকা বা শিশুকন্যারা যেন হয়রানির শিকার না হয়ে পড়ে। এই অনভিপ্রেত কদর্য অবস্থার মোকাবিলায় সাবধানতা ও আশু প্রতিকারে দ্বিমুখী ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবী ও অভিভাবকদের দায়িত্ব অপরিসীম। কোথাও যৌন নিগ্রহ হয়ে থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে দুটি কারণে। প্রথমত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা এবং দ্বিতীয়ত সম্ভাব্য গর্ভসঞ্চারের প্রতিকার।

আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থায় ধর্ষণের অব্যবহিত পরেই জরুরী প্রতিকারের সংস্থান রয়েছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীও সাহায্য করতে পারেন। সকলকে মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে চক্ষু লজ্জা বা গোপনীয়তা ভবিষ্যতে গুরুতর সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। আর এ ব্যাপারে হাতুড়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রায় সবক্ষেত্রেই বিপদ ডেকে আনে। কাজেই প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে।



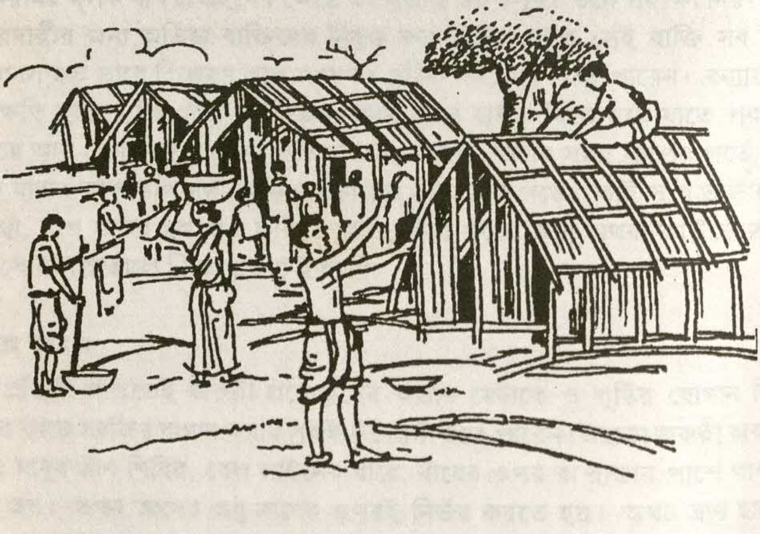
প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা
(Post disaster Management)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা কাকে বলে (What is post disaster phase) ?

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় থেকে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়াকে post disaster phage বলা হয়ে থাকে। বিপর্যয়ের পরবর্তী কালে আগের মত স্বাভাবিক অবস্থায় যাওয়া বেশ কষ্টকর। কোন কোন ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। বিশেষ করে যারা দীর্ঘ-মেয়াদী ত্রাণকার্য পরিচালনা করে আসছেন। তাঁদের কাজের কিছু ধারাবাহিকতা নীচে দেওয়া হল।

পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ (Rehabilitation and Rebuilding) ঃ

রাস্তা, রেলযোগাযোগ, টেলিফোন ও বিদ্যুতের যোগাযোগ যত শীঘ্র সম্ভব স্থাপন দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থার দিকে যেতে সাহায্য করবে। যেসব মানুষ বাড়ি ঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে তাদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্যের বিনিময়ে কাজ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরণের মানুষকে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতির কাজ দেওয়া যেতে পারে। অনেক মানুষ একসঙ্গে গৃহহীন হয়ে পড়ায়, শ্রমের বিনিময়ে নিজ গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, হাতে নেওয়া যেতে পারে, যার মাধ্যমে মানুষজন তার মাথা গোঁজার স্থানের ব্যবস্থা



করতে পারে। অনেক সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একসঙ্গে অনেক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। মৃতদেহগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় সৎকারের ব্যবস্থা করা উচিৎ। গবাদিপশুর দেহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া উচিত এবং দেখতে হবে যাতে তা থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের অভাব না ঘটে। বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা যেমন শস্য বীজ দেওয়া, চাষের বলদ, বাড়ি ঘর তৈরির জন্য কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষজন তার জীবিকার জন্য বাইরে যেতে পারছে।

প্রতিরোধী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Preventive Health Measures) ঃ

যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক ব্যবস্থা না নেওয়া যায় ততক্ষণ অবধি পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পাওয়া সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত সমষ্টি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিধান, যথা—নিরাপদ পানীয়, প্রয়োজনীয় শৌচ ব্যবস্থা ও টাটকা খাবার নিয়মিত সরবরাহ করা না যায় ততক্ষণ অবধি তা সম্ভব হয় না। **আমরা জানি দুর্যোগের পরবর্তী কালে যে সব কারণে মৃত্যু হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান হল জল বাহিত রোগ। তাছাড়াও শ্বাসকষ্ট, সাপের কামড়, বাড়ি চাপা পড়া ও জলে ডুবে যাওয়া প্রভৃতি।** যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিলে ঐ সব দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জনস্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসার আমাদের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। যে সব সরঞ্জাম বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি পরেও ব্যবহারের উপযোগী থাকে। সঠিক ভাবে সঞ্চয় করে রাখলে পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলায় সাহায্য করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে সব জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রাপ্তিস্থান কোথায় তার একটা তালিকা আগে থেকেই তৈরি করে রাখা উচিৎ। এরকম একটা তালিকা পরে দেওয়া হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ (Observation & Survillance) ঃ

যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় স্বাভাবিক পরিস্থিতি নষ্ট করে। বিভিন্ন ভাবে মানুষের ব্যবহার্য বস্তুকে দূষিত করে যা আগামী দিনে জনস্বাস্থ্যের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন বড় প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় অনেক মানুষ ও পশুর মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। বিপর্যয়ের ভয়াবহতা খুব বেশি হলে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ও পশুর গলিত দেহ সমস্যার সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত করে তোলে। তাই সব কিছু যাতে যথাযোগ্য ব্যবস্থায় দূষণমুক্ত হয় তা দেখা অত্যন্ত জরুরী। যে সব শিশু তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে অথবা কোন দম্পতি তার ছেলেপুলে হারিয়েছে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। যেসব রাস্তা মেরামতির দরকার তা মেরামত করা, অনেক দিন জমা জলের জন্য মশা ও অন্যান্য পতঙ্গবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। জল যাতে দীর্ঘ দিন জমে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। বিপর্যয়ের ফলে যদি জলের উৎসগুলি দূষিত হয়ে পড়ে তবে তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শোধন করে মানুষ যাতে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। যদি সাধারণের ব্যবহৃত কোন স্থান যেমন স্কুলবাড়ি, লাইব্রেরি ও চিকিৎসাকেন্দ্রে নষ্ট হয় তবে জরুরী ভিত্তিতে তার পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। সর্বোপরি গ্রাম বা এলাকা ভিত্তিক গণসংগঠন তৈরি করা যাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা সহজ হয়। প্রতি বাড়ি পিছু অর্থনৈতিক উন্নয়ণমূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যাতে পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করা যায়।

বিপর্যয়জনিত স্বাস্থ্য-সমস্যা ও মোকাবিলা
(Emergency Health Management)

এমন কয়েক ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে যাতে কিছু মানুষ ঘটনা ঘটা মাত্র প্রাণ হারান ও কিছু মানুষ পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য হল উদ্ধার ও সময় মত যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কষ্ট উপসমের ব্যবস্থা করা। সম্ভব হলে আগাম প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা, যাতে ক্ষয় ও ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমানো যায়।

সময়মত যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ (Timely appropriate action) ঃ

১। আমরা জানি যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভূমিকম্পের ফলে মানুষের হাড় ভাঙা ও দৈহিক আঘাত বেশি হয়ে থাকে। মানুষের গাছ বা বাড়ির নীচে চাপা পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কখনও আবার আগুন থেকে পুড়ে যাওয়া রোগীর সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্য, পানীয় জলের অভাব ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। এই জরুরী স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় যথা সম্ভব প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে স্বাস্থ্য ও সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়।

২। জরুরী প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলা করা ও খাদ্যের অভাব মেটানোতে সচেষ্ট থাকতে হবে। খাদ্য, পানীয় জল, শৌচাগার তৈরি, নিরাপদ আশ্রয়, বস্ত্র ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা এই প্রস্তুতির মধ্যে পড়ে। স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ও প্রয়োজন ভিত্তিক বন্টন এবং বাইরের সাহায্যের সুষ্ঠু বন্টন এর আর এক দিক।

৩। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মৃত্যুর হার কমান। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ পরিবেশের দূষণ রোধ ও সংক্রামক ব্যাধির মোকাবিলা।

৪। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা ঃ
(Health Problems related to disasters)

১। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। World Disaster Report-1994 অনুসারে আমরা জানতে পারি যে প্রতিবছর গড়ে এদেশে ৪৮৮৮ জন মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হন। এছাড়া রয়েছে আঘাত ও রোগ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বহু, প্রাণী ও গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হয় ও সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর অনেক সমস্যার সমাধান স্থানীয় ভিত্তিতে করে ওঠা সম্ভব হয় না। তাই দরকার বাইরের সাহায্য। এমন অনেক রাসায়নিক বিপর্যয় আছে যা মানুষের

মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে ও তা অনেক মানুষকে প্রতিবন্ধী করে দেয়। ১৯৮৪ সালে ভোপাল রাসায়নিক বিপর্যয় এখনও মানুষের স্মরণে আছে। অনেক সময় রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ, বায়ু জল ও ফসলের মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করে চলে। এগুলির অন্যতম আর্সেনিক দূষণ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ক্রমেই বেড়ে চলে।

২। অনেক সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ফসলের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে বন্যা ও খরার ফলে যে পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হয় তা থেকে স্থানীয় ভাবে খাদ্যাভাব জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, অনাহার, পুষ্টির অভাব ও ভিটামিন এ-র অভাব। যার ফলে গরীব মানুষ আরও গবীর হয় ও খাদ্যাভাব তাদের শরীরকে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে সহজে মানুষ অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৩। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে স্থানীয় ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং ফল স্বরূপ জরুরী অবস্থার মোকাবিলায় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ থেকে শুরু হয় নানা রকম স্বাস্থ্য বিপর্যয়। যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে আগে থেকে সম্ভাব্য সমস্যা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা জানান যায় তাহলে মানুষের মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা অত্যন্ত সহজ হয়ে থাকে। সর্বোপরি স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে সাহায্য করা এক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ, সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্তব্য।

৪। কিছু কিছু বিপর্যয় প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি করে, যা থেকে পরিবেশে দূষণে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন, বন্যার পরে অনেক সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। বিপর্যয়ের পরবর্তী কালে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে নানা মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। তাই তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক, মানসিক ব্যাধি ও অসামাজিক কাজে আগ্রহ বেড়ে যায়। অনেক সময় বাবা ও মায়ের মৃত্যুর ফলে বাচ্চারা অনাথ হয়ে পড়ে এবং পরে স্থায়ীভাবে অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানসিক সঙ্কট মানুষকে স্বাস্থ্য সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

৫। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অনেক মানুষ নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অস্থায়ী আবাসনে আশ্রয় নেয়। হঠাৎ অনেক মানুষের এক জায়গায় এসে ওঠা ও দীর্ঘদিন থাকার ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যদি বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য সম্মত শৌচ ব্যবস্থা না থাকে। এছাড়াও নানাধরণের সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল।

৬। বিপর্যয় কবলিত মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সমস্যা নির্দিষ্ট সময়ে ও একইভাবে হয় না। বিপর্যয়ের ধরণ অনুসারে তার তারতম্য হয়ে থাকে। বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই

(৯/১০ দিন পরে) কোন মহামারীর অভিজ্ঞতা হতে পারে যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। আবার তা দুর্ভিক্ষের আকার নেয় দীর্ঘ সময় পরে।

৭। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ জন যখন অস্থায়ী শিবিরে থাকে তখন শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও কুমারী মেয়েরা সব থেকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। সর্বোতভাবে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা সকল মানুষের কর্তব্য। তবুও দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অনেক সময় তারা সমান মর্যাদা পান না, কখনও বা তারা অত্যাচারের শিকার হন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রেও মহিলা ও শিশুদের অগ্রাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮। বন্যার জল শুধু মানুষকেই নয়, ঘরছাড়া করে সাপ, পোকা-মাকড় প্রভৃতিকেও। মানুষ যেমন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বের হয় সাপ ও পোকামাকড়ও তাই করে। ফলে দেখা যায় মানুষের পরিত্যক্ত বাড়ি সাপ ও পোকামাকড়দের আস্তানা হয়ে দাঁড়ায়। জল নেমে গেলে মানুষ আনন্দে বাড়ি ফেরে তখন ভুলে যায় যে তার বাড়িতে সাপ থাকতে পারে। আলোর স্বল্পতা থাকায় সাপ ও ক্ষতিকর পোকামাকড়ের অবস্থান সহজে নজরে আসে না, ঘটে থাকে দুর্ঘটনা। অনেক সময় পোকামাকড়ের কামড়কেও সাপের কামড় হিসাবে ভুল করা হয়। মনে রাখতে হবে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ছাড়া কোথাও সাপে কাটার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা হওয়া বেশ অসুবিধাজনক। ওঝা ও ঝাড়ফুঁক সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলা।

৯। বন্যার পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে ক্ষত, চর্মরোগ ও হাজা-র সম্ভাবনা প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু তা থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম থাকে, তাই মানুষ তাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করে না যা পরে স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। মহিলাদের ঋতুর সময়কালীন ব্যবহৃত স্যানেটারি প্যাড ও ন্যাপকিন সঠিক ভাবে পরিষ্কার করার অভাবে বা বন্যার জলে পরিষ্কার করা ও অস্বাস্থ্যকর ভাবে ব্যবহার করার ফলে মহিলাদের দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা ও স্বেচ্ছাসেবী ও সরকারী কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। মনে রাখতে হবে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবতী মা-ই পারে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিতে। তার ফলে উপকৃত হয় সমাজ।

১০। বন্যা বা ভূমিকম্পের পর সচল বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনেক বিপর্যয় ডেকে আনে। অনেক সময় ভূমিকম্পের ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহের তার ছিঁড়ে পড়ে বা খুঁটি ভেঙ্গে রাস্তা বা মানুষের কাছাকাছি জায়গায় চলে আসে। ঐ সময় মানুষকে সাবধান করা ও উদ্ধার কাজের সময় তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।



১১। প্রত্যেক ব্যক্তির জানা উচিত তার বসবাসের জায়গায় কোন ক্ষতিকারক কারখানা আছে কিনা। যদি থাকে তা থেকে কী ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এবং তা প্রতিরোধের কী কী উপায় আছে, জরুরী প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্য তাদের কী কী করণীয় এবং তা জানার পর সমস্ত সাধারণ মানুষকে তা জানানো দরকার।

১২। যখন বন্যার জল বাড়তে থাকে সেখানে কোন ভাবেই গৃহপালিত পশুদের বেঁধে রাখা উচিত নয়। বাঁধন খুলে দিলে তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হতে পারে। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে শুধুমাত্র গবাদি পশু বাঁধনমুক্ত করে না দেওয়ায় অনেক গবাদি পশু মারা গেছে।

জলবাহিত রোগ ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা

(Water borne diseases and their prevention)

(ক) জলবাহিত রোগ (water borne diseases)

১। সংক্রামক জীবাণুঘটিত — কলেরা, রক্ত আমাশয়, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ইত্যাদি।

২। ভাইরাস ঘটিত — হেপাটাইটিস-এ, রোটা ভাইরাস, পোলিও ইত্যাদি।

৩। পরজীবী ঘটিত — আমাশয়, জিয়ার্ডিয়াসিস ইত্যাদি।

৪। কৃমি সংক্রমণ — রাউন্ড ওয়ার্ম, হুক ওয়ার্ম, ইত্যাদি।

(খ) এই ধরনের রোগ কিসের মাধ্যমে ছড়ায় (How does it spread) **ঃ**

১। দূষিত জল

২। দূষিত খাবার যেমন — বাসি খাবার, যেখানে সেখানে তৈরী খোলা খাবার, রাস্তায় বিক্রি কাটা ফল, আইসক্রীম এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য ও দুধ, অনেকক্ষণ আগের অপরিচ্ছন্ন ভাবে তৈরী স্যালাড ইত্যাদি। খাদ্যের গুণগত মান খারাপ হলে এবং যিনি রান্না করেন বা খাবার পরিবেশন করেন তাঁর দৈহিক পরিচ্ছন্নতার অভাব থাকলে ও এই সব রোগ হতে পারে।

৩। বমি, মল, মূত্র, শ্লেষ্মা ইত্যাদিতে মাছি বসলে তার পায়ে ঐ রোগের জীবাণুগুলি লেগে যায় এবং ঐ মাছি খোলা খাবারে বসলে খাবার দুষিত আর এবং ঐসব রোগ ছড়াতে পারে। তাছাড়া মাছি খাবারে বসে মলত্যাগ করে। তার ফলে কিছু রোগ ছড়াতে পারে। মাছির দ্বারা কলেরা, আমাশা, রক্তআমাশা, বিভিন্ন কৃমি, হেপাটাইটিস-এ প্রভৃতি রোগ ছড়াতে পারে।

৪। মল — আমাদের মলে বিভিন্ন রোগের জীবাণু থাকে। কোন ভাবে মানুষের মল খাদ্য বা জলের সাথে মিশলে কলেরা, আমাশয়, রক্ত আমাশয়, হেপাটাইটিস-এ টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ ছড়াতে পারে।

৫। রাঁধুনি এবং পরিবেশক — এদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব থাকলে — (যেমন নখ না কাটা, পায়খানার পর হাতে সাবান না দেওয়া, নোংরা হাত খাবারে লাগানো ইত্যাদি) বিভিন্ন রোগ ছড়ায় যেমন কৃমি, আমাশয় ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণ (Symptoms) **ঃ**

ক) উদরাময় (Diarrhoea) — কলেরা, আন্ত্রিক, খাদ্যে বিষক্রিয়া ইত্যাদির জন্য বার-বার বেশি পরিমাণে চালধোয়া জলের মত পায়খানা হয়, বমি হতে থাকে, পেটে যন্ত্রণা

হতে পারে। অল্প জ্বরও থাকতে পারে। জলশূন্যতার জন্য শরীর দুর্বল হয়। হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে, প্রস্রাব কমে যায়, রোগী অসাড় হয়ে পড়ে।

খ) আমাশয় — বারে বারে পাতলা বা সাধারণ পায়খানা হয়। তাতে শ্লেষ্মা ও রক্ত থাকতে পারে, তলপেটে যন্ত্রণা এবং জ্বর থাকতে পারে। সাধারণভাবে শরীরে দ্রুত জলশূন্যতা দেখা দেয় না কিন্তু হতে পারে।

গ) টাইফয়েড — দুসপ্তাহ বা তার বেশিদিন জ্বর চলতে থাকে। হঠাৎ জ্বর শুরু হয় এবং দিন দিন জ্বর বাড়তে থাকে। জ্বর অনিয়মিত ওঠানামা করতে পারে। মাথার যন্ত্রণা। গা বমি, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। সাধারণ জ্বরের ওষুধে ভাল কাজ হয় না।

ঘ) ভাইরাল হেপাটাইটিস — হাল্কা জ্বর, ক্লান্তি, মাথা ঝিমঝিম, গা বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, শরীরে যন্ত্রণা, গরমের তেলের মত প্রস্রাব চোখের সাদা অংশে হলুদ ভাব ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ।

ডাইরিয়া/আমাশয় রোগে স্বাস্থ্য কর্মীদের কী করা উচিত?

ডাইরিয়া হলে পাতলা পায়খানার এবং বমির মাধ্যমে শরীরের জল এবং মূল্যবান লবন বেরিয়ে যায়। এই জল এবং লবন শরীরে প্রতিস্থাপন না করতে পারলে রোগী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকে। বিশেষ করে বাচ্ছাদের ক্ষেত্রে এই কথাটা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। স্বাস্থ্য কর্মীর প্রথম কাজ রোগীকে ঠিকমত মূল্যায়ন করে যদি শরীরে জলশূন্যতা (Dehydration) না থাকে তাহলে তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া এবং সেইমত বাড়ীর লোককে এবং রোগীকে পরামর্শ দেওয়া। যদি জলশূন্যতা থাকে তাহলে তার মাত্রা নির্ধারণ করে জল ও লবণ দ্রুত প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা বা রোগীর অবস্থা সংকটজনক হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া।

ডাইরিয়ার চিকিৎসার কয়েকটি ধাপ ঃ

১। লবণ-জল শূন্যতা কতটা তা বুঝতে হবে - নাড়ীর গতি, চামড়ার কমনীয়তা, পায়খানা বা বমির মাত্রা, রোগীর চেতনা, তেষ্টা আছে কিনা, জিব শুকনো না ভিজে, বাচ্ছা কাদলে চোখে জল আসছে কিনা খিঁচুনি ইত্যাদি দেখে জলশূন্যতা এবং তার মাত্রা নির্ণয় করা যায়।

২। পায়খানা / বমির সাথে যে পরিমাণ জল এবং লবন শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে তা দ্রুত প্রতিস্থাপন করা।

৩। আবার যাতে লবন জলশূন্যতা না হয় তার প্রতিরোধ করতে হবে।

রোগীর জ্ঞান থাকলে এবং খেতে পারলে সাধারণ খাবার চালু রাখতে হবে বিশেষ করে বাচ্চাদের।

লবনজল প্রতিস্থাপন চালিয়ে যেতে হবে।

প্রয়োজনে জীবাণু নাশক ওষুধ দিতে হবে।

৪। রোগীর বিশেষত বাচ্ছার অপুষ্টি আছে কিনা দেখতে হবে, যদি থাকে তা দূর করার প্রয়াস নিতে হবে।

পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করে সবাইকে একাজে যুক্ত করতে হবে।

অপুষ্টিজনিত বিশেষ সমস্যা (যেমন রাতকানা) থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

শরীরে লবন জল প্রতিস্থাপন কিভাবে করা যায়?

ডাইরিয়ার রোগীর লক্ষণ দেখে এবং তার শরীরের লবনজল শূন্যতার মাত্রানুযায়ী চিকিৎসার তিনটি

ক) লবনজল শূন্যতা নেই — জলশূন্যতা প্রতিরোধ করার জন্য সাধারণ জল, ডাবের জল, ডালের জল, মুড়ি ভেজানো জল, ভাতের মাড়, নুন চিনির সরবৎ (Sugar Salt Solution) ইত্যাদি বারে বারে খেতে হবে। বমি হলে অল্প অল্প, বারে বারে খেতে হবে। সাধারণ খাবার চলবে।

খ) কিছুটা লবন জল শুন্যতা আছে — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশমত তৈরী বিভিন্ন নুন এবং চিনির মিশ্রণে তৈরী পাউডার প্যাকেট ঔষুধ দোকানে এবং সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাওয়া যায়। ১ লিটার পানীয় জলে পুরোটা গুলে ঢেকে রাখতে হবে এবং বারে বারে খেতে হবে। কত সময়ের মধ্যে কতটা পরিমাণ খেতে হবে তা স্বাস্থ্যকর্মী জানেন। অবস্থার অবনতি হলে (জলশূন্যতা বাড়তে থাকলে, খিঁচুনি হলে, রোগী অচেতন হয়ে গেলে, খুব বমি হতে থাকলে) স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

গ) **খুব বেশি জল লবন শূন্যতা** — রোগীর অবস্থা সংকটজনক—অচেতন, তেষ্টা নেই, খিঁচুনী হচ্ছে) স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

কিভাবে ORS বানাবেন ?

একগ্লাস (কমবেশি ২৫০ মিলিটার জলে) পানীয় জলে দু'চামচ সাধারণ চিনি (২×৫ = ১০ গ্রাম) আর তিন আঙুলের এক টিপ খাবার নুন মেশান, সম্ভব হলে ১/২ চামচ যে কোন লেবুর রস মেশানো যেতে পারে। ছয় ঘণ্টার পর ব্যবহার না করা উচিত।

জলবাহিত রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা যাবে?

১। আক্রান্ত রোগীদের বমি, মল, মূত্র পরিশোধন করা।

২। নিরাপদ পানীয় জল —পুকুরের জল, অগভীর নলকূপের জল, পায়খানাগারের পার্শ্ববর্তী কোনও উৎস থেকে জল নিলে দুষিত হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ী, হোটেল, ফুটপাতের খাওয়ার দোকান, ইত্যাদির জল নিরাপদ নাও হতে পারে। পানীয় জল পরিস্কার হাতে সংগ্রহ করে পরিস্কার পাত্রে চাপা দিয়ে রাখুন। পানীয় জলের উৎসের

চারদিকে পায়খানা বা প্রস্রাব করবেন না, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন, আশেপাশে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হলে জল ফুটিয়ে খান। টগবগ করে অন্তত ১০ মিনিট ফুটলে জল জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়।

৩। পায়খানা প্রস্রাবের পর হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে।

৪। কোন কিছু খাওয়ার আগে, রান্নার আগে, খাবার পরিবেশনের আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৫। খোলা খাবার, কাটা ফল, না ধোয়া ফল বা সবজি, বাসি খাবার, যেখানে সেখানের নিম্নমানের খাবার না খাওয়াই ভাল।

৬। পরিবেশ পরিষ্কার রাখুন যাতে মাছির বৃদ্ধি কম হয়।

৭। বন্যার সময় ও বন্যার পরে জলবাহিত রোগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে কারণ —

— বন্যার সময় জল দুষিত হয়,
— মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মৃতদেহ দুষণের মাত্রা বাড়ায়,
— মশা মাছির উপদ্রব বাড়ে,
— অনাহারে অনিদ্রায় মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
— ত্রাণ শিবিরে আক্রান্ত রোগীর থেকে অন্যদের দেহে রোগ সংক্রামিত হয়।
— ত্রাণ শিবিরে খাবার স্বাস্থ্য সম্মত নাও হতে পারে।

উপরের বিষয়গুলি সম্বন্ধে পূর্বেই সচেতন হওয়া দরকার এবং পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা —

জল শোধনের কিছু পদ্ধতি ঃ

(ক) জল ফুটিয়ে — ১৫-২০ মিনিট টগবগ করে ফুটিয়ে কিছুক্ষণ থিতিয়ে যাবার পরে উপরের জল বিশুদ্ধ পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে ত্রাণ শিবিরে জ্বালানীর ব্যবস্থা করা কঠিন।

(খ) ব্লিচিং পাউডারের সাহায্যে — ১০০ লিঃ পরিষ্কার জলে ২৩০ মিগ্রা ব্লিচিং পাউডার লাগে। ছোট কাপে ব্লিচিং পাউডার গুলে নিয়ে ১০ মিনিট পরে দ্রবণটি জলের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে ও ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মেশানোর একঘন্টা পরে জল পানের উপযুক্ত হবে।

(গ) ক্লোরিণ ট্যাবলেট (হ্যালোজেন বড়ি)
১০০ লিটার জলে ৫০০ মিগ্রার ৫টি বড়ি মেশাতে হবে।

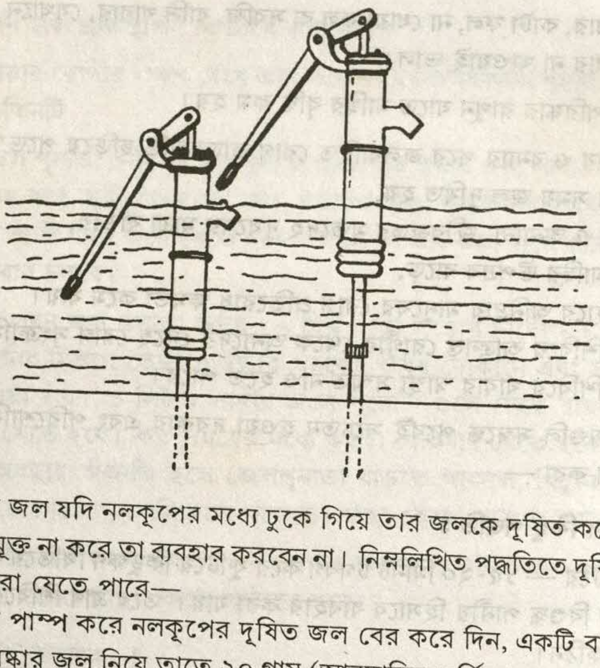
(ঘ) তরল ব্লিচিং (৫% ক্লোরিণ)
১০০ লিটার জলে দেড় মিলি. বা ২২ ফোঁটা মেশাতে হবে।

(ঙ) এছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে এক লিটার জলে ২ ফোঁটা টিংচার আয়োডিন দ্রবণ মেশাতে হবে।

সূত্র ঃ ডঃ রণদেব বিশ্বাস (AIIH & PH)

নলকূপের জল পরিশোধন —

বন্যার সময় নলকূপ ডুবে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রথমেই উপরের হাত-পাম্পটি খুলে ফেলুন। তারপর নিচের পাইপের মাথায় আর একটি টুকরো পাইপ জোড়া দিয়ে সেটিকে এমন ভাবে উঁচু করে নিন যাতে হাত পাম্পটি লাগানোর পরে জল বেরোবার মুখটি বন্যার জলের স্তরের উপরে থাকে। এরপর হাত পাম্পটি আবার লাগিয়ে দিন, এই জন্য বাড়তি পাইপের টুকরো আগে থেকে সঞ্চয় করে রাখা খুবই প্রয়োজন।



বন্যার জল যদি নলকূপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার জলকে দূষিত করে দিয়ে তাকে তবে দূষণমুক্ত না করে তা ব্যবহার করবেন না। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দূষিত নলকূপকে শোধিত করা যেতে পারে—

প্রথমে পাম্প করে নলকূপের দূষিত জল বের করে দিন, একটি বালতিতে ৭/৮ লিটার পরিষ্কার জল নিয়ে তাতে ২০ গ্রাম (আনুমানিক ভর্তি চায়ের চামচের ৪ চামচ) ব্লিচিং পাউডার ঢেলে ভালো করে তা গুলে নিন। একটি ২০০ ফুট গভীর নলকূপের জন্য এই পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার লাগবে। নলকূপের গভীরতা কম বা বেশী হলে আণুপাতিক হারে ব্লিচিং পাউডারের পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে হবে। প্রাপ্ত ব্লিচিং পাউডারে ক্লোরিণের ভাগ দেখে নিতে হবে, সাধারণ ব্রিচিং পাউডারে ক্লোরিণ ও চূর্ণের পরিমাণ ১ : ১০ থাকে, ক্লোরিণের ভাগ বেশী থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এবার নলকূপের মাথায় হাত-পাম্পটি খুলে নিন। বালতির নীচে সাদা তলানি পড়ার পর উপরের পরিষ্কার জল পাইপের মধ্যে ঢেলে দিন। বালতির তলানিটা বাইরে ফেলে দিন। একটি সরু বাঁশ বা অনুরূপ কিছুর সাহায্যে পাইপের মধ্যে ঢালা ব্লিচিং পাউডার গোলা জল ভালো করে মিশিয়ে দিন। তারপর পাইপের মুখটি ভালো করে বন্ধ করে দিন। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি রাতে করুন ও পরদিন আবার হাত পাম্পটি

লাগিয়ে দিন। এবার পাম্প করতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না জলে ক্লোরিণের গন্ধ সম্পূর্ণভাবে দূর হচ্ছে। এখন এই নলকূপের জল সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত হলো। এই জল খাওয়া ছাড়াও রান্নাবান্না শিশুদের স্নান, থালাবাসন ধোয়া ইত্যাদিতে ব্যবহার করুন;

এছাড়াও বৃষ্টির জল যদি শুদ্ধপাত্রে ধরা যায় ও ভালোভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা যায় তাহলেও দূষণমুক্ত জল হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

পাতকুয়ার জল জীবাণুমুক্ত করণের পদ্ধতি ঃ

— ২৫ থেকে ৩০ ফুট গভীর

— কুয়োর ময়লা তুলে ফেলুন।

— ৫০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ও ২০০ গ্রাম চুন একটি মগে গুলে কুয়োর জলে মিশিয়ে দিন।

— কুয়ো থেকে জল তুলে আবার তা কুয়োতে ফেলে দিন। এটা বেশ কয়েকবার করুন।

— ২ ঘন্টা পর কুয়োর জল ব্যবহার করতে পারবেন।

কুয়ো ৩০ ফুটের গভীর হলে ও একই পদ্ধতিতে তা জীবাণুমুক্ত করুন।

জল ব্যবহার বিধি ঃ

করবেন —

১। শুধু নলকূপের জল পান করুন।

২। পাতকুয়ো বা পুকুরের জল যদি খেতে হয় তবে ফুটিয়ে বা অন্যভাবে পরিশোধন করে নিয়ে খাবেন।

৩। ধূলো ময়লা / রোগ জীবাণু যাতে না পড়ে তার জন্য ঢেকে রাখুন এবং লম্বা হাতাওয়ালা পাত্র দিয়ে জল তুলে ব্যবহার করুন।

৪। পুকুরের জলে ধোয়া বাসনপত্র নলকূপের জলে আর একবার ধুয়ে নিন।

করবেন না —

১) ফুটিয়ে বা পরিশোধন না করে পাতকুয়ো বা পুকুরের জল পান করবেন না।

২) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করবেন না বা জঞ্জাল ফেলবেন না।

৩) পানীয় জলের উৎসের চারধার নোংরা করবেন না।

৪) পানীয় জলের পাত্র থেকে হাত বা না ধোয়া পাত্র ডুবিয়ে জল নেবেন না।

ভাইরাল হেপাটাইটিস-এর ক্ষেত্রে পরামর্শ ঃ

- পূর্ণ বিশ্বাস।
- অতিরিক্ত মশলাপাতি না খাওয়া।
- যত বেশি সম্ভব তরল পদার্থ খাওয়া।
- পৃথক পৃথক ভাবে সমস্ত রান্নার বাসনপত্র, কাপড়-চোপড় ও তোয়ালে পরিষ্কার রাখা। নিজে থেকে রোগীকে কোনও ওষুধ দেওয়ার সিদ্ধান্তে না গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা
(First Aid)

দুর্ঘটনা	করনীয়	কখন হাসপাতাল পাঠাতে হবে
(১) পুড়ে যাওয়া	(১) পোড়া জায়গাটি অন্ততঃ দশ মিনিট ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। (২) রোগীকে চা বা দুধ বেশী চিনি দিয়ে খাওয়াতে হবে, পারলে রোগীকে O.R.S. (ও. আর. এস.) দিন। (৩) পোড়া স্থানটিতে ২% জেনসিয়ান ভায়োলেট লোশন লাগিয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন।	যদি পোড়া ব্যাপক এবং/বা গভীর হয় অথবা মাথা, মুখ ও যৌনাঙ্গ পুড়লে অথবা রোগীর জ্ঞান না থাকলে।
(২) কুকুরের কামড়	(১) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবান ও জল দিয়ে ক্ষত স্থানটি ধুয়ে নিন। সাবান না থাকলে ক্ষত স্থানটিকে জলের ধারার নিচে রাখুন। (২) ক্ষতস্থানটিতে কোনোরূপ সেলাই বা ব্যান্ডেজ করা যাবে না। (৩) যত তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।	যত শীঘ্র সম্ভব
(৩) জলে ডোবা	(১) রোগীর মুখ নীচে রাখুন এবং মাথা একপাশে ঘুরিয়ে দিন। (২) রোগীর শরীর উপুড় করে তুলুন যাতে ফুস ফুস থেকে জমা জল বেরিয়ে আসতে পারে। (৩) কৃত্রিম দাঁত, মাটি বা জলজ উদ্ভিদ মুখের ভিতর থেকে বার করে দিন।	কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালু হওয়ার পর - যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করুন।

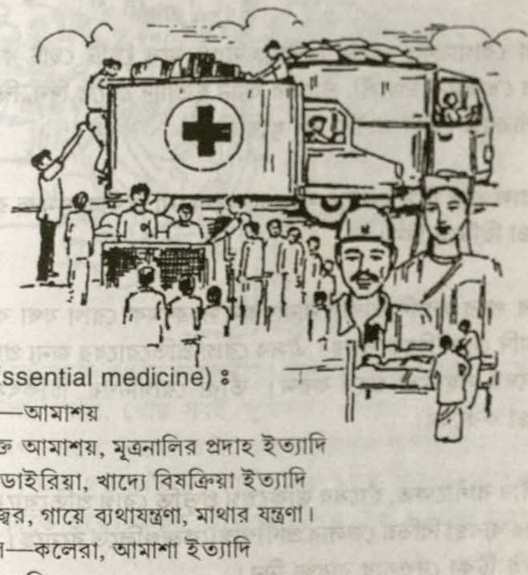
দুর্ঘটনা	করনীয়	কখন হাসপাতাল পাঠাতে হবে
	(৪) শরীরের জামাকাপড় ঢিলে করে দিতে হবে। (৫) যদি রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকে তবে কৃত্রিম উপায়ে (মুখ থেকে মুখ পদ্ধতিতে) শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে। এবং চালু হওয়ার পরও ১৫মিঃ অবধি চালিয়ে যেতে হবে।	
(৪) হাড়ভাঙা ঃ	১) রোগীকে যথা সম্ভব আরাম দায়ক অবস্থায় রাখতে হবে। ২) আহত স্থানটি যাতে না নড়ে সেইজন্য স্লিন্ট (Splint) ও ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতে হবে। ভাঙা স্থানটির পার্শ্ববর্তী সন্ধিগুলির নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে। ৩) ভাঙা হাড় সরে গেলে স্বস্থানে বসানোর চেষ্টা করা উচিৎ নয়।	প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।
(৫) সর্দিগর্মী	১) রোগীকে ছায়ায় রাখতে হবে ২) কাপড়-জামা কাপড় যথা সম্ভব ঢিলে করে দিতে হবে ৩) রোগীর গায়ে ঠান্ডা জল ঢালতে হবে বা ঠান্ডাজলে কাপড় ভিজিয়ে গায়ে রাখতে হবে, বিশেষ করে বগল দুটিতে ৪) জ্ঞান থাকলে বেশী করে ঠান্ডা জল খাওয়াতে হবে। পারলে সামান্য লবণ চিনি মেশানো খাওয়াতে হবে।	রোগীর জ্ঞান না ফিরলে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।
(৬) কীট পতঙ্গের কামড়	১) সম্ভব হলে হুলটি তুলে ফেলতে হবে। ২) ঠান্ডা সেক দিতে হবে, সোডি বাই কার্ব সলিউশান বা এমোনিয়া দিলে জ্বালা দূর হবে।	রোগীর শক হলে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

দুর্ঘটনা	করনীয়	কখন হাসপাতাল পাঠাতে হবে
(৭) মচ্‌কান	১) আহত স্থানটিকে সবচেয়ে আরামদায়ক অবস্থার রাখতে হবে। ২) ঠান্ডা সেক বা বরফ দিতে হবে। ৩) আহত স্থানটিকে অনড় রাখতে ব্যাণ্ডেজ করতে হবে।	ব্যথা ও ফোলা না কমলে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।
(৮) সাপে কাটা	১) রোগীকে আশ্বস্ত করুন ২) দংশনের উপরে কাপড় এঁটে বাধতে হবে। ৩) সাবান জল দিয়ে ভাল করে ধুতে হবে। ৪) গজ ও পরিস্কার কাপড় দিয়ে ঢাকতে হবে। ৫) অঙ্গে স্পিলন্ট দিতে হবে নাড়াচাড়া বন্ধ করার জন্য এবং অঙ্গটি শরীরের চেয়ে নীচে রাখতে হবে।	 
(৯) ক্ষত	১) চাপ দিয়ে বা টুর্নিকেট বেঁধে রক্ত বন্ধ করতে হবে। ২) ক্ষতটি সাবান জলে ভালো করে ধুতে হবে। মাটি বা অন্যান্য জিনিস ক্ষতে থাকলে বের করে ফেলতে হবে। ৩) আয়োডিন, জেনসিয়ান ভায়োলেট বা মারকিউরোক্রোম লোশন লাগাতে হবে। ৪) গজ বা পরিস্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে ব্যান্ডেজ বা অ্যাডহেসিভ প্লাষ্টায় লাগাতে হবে।	তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে, যদি ১) ক্ষতটি অত্যন্ত অপরিস্কার হয়, ২) অত্যধিক রক্তপাত হয়, ৩) রোগীর শক্ থাকে।
(১০) বিষপান	১) অ্যাসিড বা ক্ষার পান করলে বমি করানো যাবে না। ২) প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াতে হবে।	যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

মেডিক্যাল ক্যাম্প (অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র)

(Medical Camp)

প্রতিকূল পরিস্থিতি দূষিত জল/ খাবার, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকা, রোদ/ বৃষ্টি, অনভ্যস্ত জায়গায় থাকা, মানসিক চাপ ইত্যাদির কারণে জ্বর, সর্দি কাশি, জলবাহিত রোগ, খাদ্যে বিষক্রিয়া, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ইত্যাদি রোগ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, সাপে কামড়ানো, আগুনে পুড়ে যাওয়া, পড়ে গিয়ে বা বাড়ী ধ্বসে পড়ে হাড় ভাঙা ইত্যাদির মতো দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। গর্ভবতী মায়েদের প্রসব এবং শিশুদের টিকাদানেরও প্রয়োজন আছে। বন্যায় জলবন্দী বা অন্যান্য দুর্যোগে আটক মানুষের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেয় এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারে না। তাই ত্রাণ শিবিরের কাছাকাছি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা উচিত। সেখানে সর্বক্ষণ ডাক্তার, কম্পাউন্ডার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকবেন।



প্রয়োজনীয় ওষুধ (Essential medicine) ঃ

মেট্রোনিডাজোল বড়ি—আমাশয়

নরফ্লক্সাসিন বড়ি—রক্ত আমাশয়, মূত্রনালির প্রদাহ ইত্যাদি

ORS — প্যাকেট —ডাইরিয়া, খাদ্যে বিষক্রিয়া ইত্যাদি

প্যারাসিটামল বড়ি—জ্বর, গায়ে ব্যথাযন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা।

টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল—কলেরা, আমাশা ইত্যাদি

মেবেনডাজোল বড়ি—কৃমি,

স্যালবুটামল বড়ি—হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট,

ক্লোরফেনিরামাইন ম্যালিয়েট বড়ি—এলার্জি, চুলকানি।

কোট্রিমক্সাজোল বড়ি—রক্ত আমাশয়, মূত্রনালীর প্রদাহ, শ্বাসনালীর সংক্রামণ।

অ্যামক্সাসিলিন ক্যাপসুল—শ্বাসনালীর সংক্রামন, সাইনুসাইটিস্

বেনজাইল বেনজোয়েট লোশন—চুলকানি, উকুন

গামা বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড লোশান

জেনশান ভায়োলেট লোশান—কাটা, খোস প্যাঁচড়া।

বন্যার সময় ও পরে পশুপাখিকে সুস্থ রাখা

(Cattle Protection)

১। পরিস্কার জীবাণুমুক্ত জল আপনার গবাদি প্রাণীকে দিন। পুকুর, নদীনালার জল তুলে থিতিয়ে নিন ও পরিমাণমত ফিটকিরি অথবা পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট গুড়ো তাতে মিশিয়ে নিন। আপনার নিকটবর্তী প্রাণীস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঐ ওষুধ পরিমাণ মতো পাবেন।

২। গরু বাছুরকে পচা ঘাসপাতা খেতে দেবেন না।

৩। মৃত পশু পাখির দেহ মাঠে ঘাটে ফেলে দেবেন না। মৃত পশু পাখিকে সুবিধা মতো কোমর সমান গর্ত করে পুতে ফেলুন।

৪। এঁষো রোগাক্রান্ত গবাদি প্রাণীকে নরম ঘাস ছোট ছোট করে কেটে, পরিস্কার জলে ভেজানো বিচালী, ভাতের ফ্যান ইত্যাদি খেতে দিন, ফিটকারির জলে এষো রোগাক্রান্ত গবাদি প্রাণীর মুখ ধুয়ে দিন।

৫। গোয়াল এবং হাঁস মুরগীর খামারকে শুকনো ও বীজাণুমুক্ত রাখতে কাপড় কাচার সোডা ছিটিয়ে দিন।

৬। বর্ষার পরে গবাদি প্রাণীর নানারকম সংক্রামক রোগ যথা বাদলা, তড়কা, এঁষো ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। ঐসব রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রাণীস্বাস্থ্য আধিকারিক কর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করুন। তাঁরা রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও যথাযথ টিকার ব্যবস্থা করবেন।

৭। মুরগীর রাণীক্ষেত, হাঁসের ডাকপ্লেগ প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক টিকা দানের ব্যবস্থা বিভিন্ন জেলার প্রাণীস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রয়েছে। আপনার পশুপাখিকে আজই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা নিন।

৮। গবাদি প্রাণীর মুখে ও পায়ে ঘা দেখা দিলে নিকটবর্তী চিকিৎসা কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন। প্রাণীস্বাস্থ্য আধিকারিক কর্মীরা আপনার কাছাকাছি আছেন। তাঁদের সাহায্য ও পরামর্শ নিন।

পুষ্টি
(Nutrition)

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাধারণত খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। বহু বিত্তবান লোকেরও সঞ্চিত খাদ্য ভান্ডার নষ্ট হয়ে যায়। তেমন অবস্থায় শুধু গরীব মানুষ নয় সচ্ছল মানুষদের লঙ্গর খানা ও ত্রাণ শিবিরের সীমিত খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ত্রাণ শিবিরগুলিতে খাদ্যাভাবের ফলে সৃষ্টি হয় পুষ্টির সমস্যা। এই পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্কটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু, প্রসূতি ও গর্ভবতী মা, অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা।



পুষ্টির যোগান দিতে সবজি বাগান অতুলনীয়। সেখানে শাক-সবজির সঙ্গে অবশ্যই কলাগাছ থাকবে। কলা, মোচা, থোর সবই পুষ্টিকর। তাছাড়া ঐ গাছ দিয়ে তৈরি ভেলা বন্যার্ত উদ্ধারেও কাজে লাগে। তাই, এর প্রয়োজন অপরিসীম। সেই সঙ্গে পেঁপে সবজি ও পাকা ফল দুভাবেই উপকারী। ফল চাষে বিশেষ ভাবে নারকেল গাছের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, এথেকে বিশুদ্ধ জল ও খাদ্য হিসাবে শাস পাওয়া যায়।

একথা ঠিক যে, খাদ্য সঙ্কটের সময় পুষ্টির কথা বললে অনেকেই বাতুলতা বলে ঠাট্টা করতে পারেন। তবু, একথা বলা দরকার যে, সামান্য কয়েকদিনের সংকটই পুষ্টিহীন শিশু, অসমর্থ, ও প্রসূতিদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই, ত্রাণ শিবিরে অথবা বাড়িতে বিপর্যয়ের সময় ও তার অব্যবহিত পরে সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর প্রধান অংশ তথা পুষ্টিকর উপাদান বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে তাদের, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যাদের। এটা যাতে অনুসৃত হয় তা দেখতে হবে সচেতন গৃহকর্তা ও স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বেচ্ছাসেবীদের।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য হামেশাই মানুষদের অস্থায়ী শিবিরে থাকতে বাধ্য হন। ঐ সময় খাদ্য ও পুষ্টি অবশ্যই প্রয়োজন। তখন নানাদিক বিবেচনা করে তাই ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্যাভাস

মানুষের খাদ্যাভ্যাস প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ওপর নির্ভরশীল—

(১) জাতি
(২) দেশ (পরিবেশ ও আবহাওয়া)
(৩) আর্থিক সঙ্গতি
(৪) সামাজিক রীতিনীতি
(৫) বয়স
(৬) স্ত্রী বা পুরুষ
(৭) খাদ্যের সহজলভ্যতা
(৮) খাদ্য তৈরির পদ্ধতি

মানুষের বেঁচে থাকতে হলে খাবার প্রয়োজন অবশ্যই। আবার সেই খাবারের মধ্যে থাকা চাই—

(১) প্রোটিন
(২) কার্বোহাইড্রেট
(৩) ফ্যাট
(৪) ভিটামিন এবং সর্বোপরি
(৫) জল,
(৬) নানারকম খনিজ লবন।

কোনটি কী পরিমাণ দরকার, তা এক একজনের এক এক রকম হয়। এ ব্যাপারে অর্থাৎ পরিমাণ স্থির করতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তালিকা এই পুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

বিটা কেরোটিন ও ভিটামিন 'এ'

প্রকৃত পক্ষে এ দুটি একই বস্তু। এ দুটি মানব দেহে প্রাত্যহিক প্রয়োজন। এগুলি লাগে—

পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদের	২৪০০ মাইক্রোগ্রাম (3.5 mols)
পূর্ণ বয়স্ক মেয়েদের	২০০০ মাইক্রোগ্রাম (2.8 mols)
শিশুদের	৭০০ মাইক্রোগ্রাম (2 mols)

এগুলির উপকারিতা কী তা বোধ করি সকলেরই জানা আছে, তাই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন তবু, চেষ্টা করলে সে বিষয়ে সচেতন থাকলে অভাবের সময়েও তার ব্যবস্থা করা যায় তাই, এখানে সুষম খাদ্য তালিকা দেওয়া হল।

সুষম খাদ্য তালিকা

এর আগে আলোচিত অপুষ্টির সম্ভাবনা ও তার প্রতিকারের কথা মনে রেখে একটি সুষম খাদ্য তালিকা এখানে দেওয়া হলো। এই তালিকাটির লক্ষ্য হলো ১৭ থেকে ৩৭ বছরের মানুষের সাধারণ সময়ের উপযোগী।

(১) **আটা বা চাল** প্রত্যহ ৪০০ থেকে ৪৭৫ গ্রাম

(২) **ডাল** প্রত্যহ ৬৫ থেকে ৮০ গ্রাম
ছোলার ডাল ঃ সপ্তাহে তিন দিন
মুগের ডাল ঃ সপ্তাহে দুদিন
মুসুরি ডাল ঃ সপ্তাহে একদিন
অড়হর ডাল ঃ সপ্তাহে একদিন

(৩) **পাতা জাতীয় সব্জী : প্রত্যহ ১২৫ গ্রাম**
পালং শাক, তেঁতুল পাতা, নটেশাক : সপ্তাহে দু'দিন
লাউ, কুমড়ো শাক, ধনেপাতা, সরষে শাক : সপ্তাহে দু'দিন
গারজ শাক, বাঁধাকপি, ছোলার পাতা, কড়লা পাতা : সপ্তাহে দু'দিন
নিমপাতা, কচু পাতা, বাঁশের কচিপাতা, খেসারির শাক : সপ্তাহে একদিন

(৪) **অন্যান্য সব্জী : প্রত্যহ ৭৫ থেকে ১০০ গ্রাম**
আলু, আমআদা, পটল, কুমড়ো, মূলা : সপ্তাহে দু'দিন
সিম, কড়লা, বেগুন, পদ্মডাঁটা, গাজর, ঝিঙে, কাঁচকলা : সপ্তাহে দু'দিন
ফুলকপি, চালতা, শশা, ডুমুর, লাউ : সপ্তাহে দু'দিন
চাল কুমড়ো, ওল, শালগম, কচু, বিট, কাঁচা আম, মোচা, থোড় : সপ্তাহে একদিন

(৫) **মাছ, মাংস, ডিম : প্রত্যহ ৪০ গ্রাম**
শক্তিযুক্ত মাছ : ভেটকি, খয়রা, পারশে, মাগুর, চিংড়ি, ট্যাংরা।
নিরামিষ ভোজীরা : ডাল, সয়াবিন, দুধ, দই।

(৬) **মশলা জাতীয় : প্রত্যহ ৩ থেকে ৫ গ্রাম**
ধনে, জিরে, লঙ্কা, মেথি, রসুন, আদা, যোয়ান, গোলমরিচ, হলুদ, তেঁতুল, হিং, এলাচ, জায়ফল।

(৭) **বীজ ও বাদাম জাতীয় : প্রত্যহ ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম**
সরষে, বাদাম, পেস্তা, সূর্য্যমুখী বীজ, আখরোট, তিসি, তিল, নারকেল।

(৮) **ফল : প্রত্যহ ৩০ গ্রাম**

(৯) **চিনি/গুড় : প্রত্যহ ৩০ গ্রাম**

(১০) **দুধ জাতীয় : প্রত্যহ ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম**
দুধ, গুড়ো দুধ, দই, ছানা, রসগোল্লা, সন্দেশ।

(১১) **তেল জাতীয় :** ঘি, মাখন, সরষের তেল, বাদাম তেল, সূর্য্যমুখী তেল।

পুষ্টি ও মাতৃদুগ্ধ — দুর্যোগের সময় পরবর্ত্তীকালে আসন্না প্রসবা, সদ্য প্রসূতি বা শিশু নিয়ে মায়েদের ত্রাণ শিবিরে থাকতে হয়। তখন শিশুর পুষ্টি অবশ্যই প্রয়োজন। সেদিকে মাতৃদুগ্ধ অতুলনীয়।

প্রাকৃতিক নিয়মেই সন্তান গর্ভে ধারণ করায় সময়েই মা সন্তানের ভবিষ্যৎ এর জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ক্রমেই তার স্তনের গ্রন্থীগুলি পুষ্ট হতে থাকে এবং প্রসবের প্রাক্কালে তা পূর্ণতা পায়। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বুকের দুধের রং থাকে হলদে। এই দুধ একদিকে পুষ্টিকর ও অন্যদিকে রোগ প্রতিরোধী। তাই সংস্কার বসত ঐ দুধ টিপে ফেলে না দিয়ে শিশুকে খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া ৪ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুই বুকের দুধ দিতে হবে। এমন কি বাইরের জল, মিছরির জল বা কৌটার দুধ কোনটাই দেওয়া যাবে না। এতে শিশু সুস্থ থাকবে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা পাবে। বুকে দুধ আসে না, স্তন ছোট বা মা রুগ্ন যাই হোক না কেন শিশুর প্রয়োজনীয় দুধের যোগান ঠিকই থাকবে। কৌটার দুধ, জল, বোতলে খাওয়া রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

বুকের দুধ খাওয়ানো একবার বন্ধ হয়ে গেলেও তা পুনরায় চালু করা যায় অতি সহজেই। তাই, চিন্তা না করে, ভীত না হয়ে ৪ মাস শুধু বুকের দুধ ও পরে সেই সঙ্গে অন্য খাদ্য দিলে শিশু সুস্থ থাকবে, সবল হবে।

বিপর্যয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি

(Direct & Indirect Impact of disasters)

যে কোন বিপর্যয়েই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে ক্ষতির ব্যাপ্তি অনেক বেশি হয় বলেই তাকে আমরা বিপর্যয় বলি। বিপর্যয়ের ক্ষতি সাধারণতঃ আমরা দুই ভাগে দেখতে পাই যেমন প্রত্যক্ষ ক্ষতি এবং পরোক্ষ ক্ষতি। যেমন মানুষ ও পশু পাখির মৃত্যু, সম্পদের বিনাশ ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি। আমরা বেশীর ভাগ সময়ই বিপর্যয়ের ক্ষতি বলতে প্রত্যক্ষ ক্ষতিরই হিসাব করে থাকি। কিন্তু যদি সঠিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও বিবিধ অর্থনৈতিক ক্ষতির আলোচনা করি তা হলে আমরা বুজব যে, যে কোন বিপর্যয়ই দীর্ঘ স্থায়ী অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষতি করে যা পরবর্তীকালে পূরণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

প্রত্যক্ষ (Direct) ক্ষতি ঃ

প্রত্যক্ষ ক্ষতি বলতে আমরা বুঝি যে ক্ষতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন মানুষের মৃত্যু। প্রাণী সম্পদ। কৃষিজাত সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ। পরিকাঠামো যথা রাস্তা, ব্রীজ , টেলিফোন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হওয়া। কোন কোন শিল্প-দুর্ঘটনা যা শিল্পকে প্রত্যক্ষ ক্ষতির মধ্যে দাঁড় করায়। যেহেতু উপরিউক্ত বিষয়গুলি আমরা দেখতে পাই, সেহেতু তার পরিমাপ করা সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে থাকে। বাস্তব ব্যাপার হল, প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়ে পরোক্ষ ক্ষতি অনেকগুণ বেশী হয় যার সচরাচর মূল্যায়ণ হয় না।

পরোক্ষ (Indirect) ক্ষতি ঃ

পরোক্ষ ক্ষতি বলতে আমরা বুঝি যে, ক্ষতি আমরা প্রথমে দেখতে পাই না। অনেক সময় অনুভূতির মধ্যে আনি না। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যা একটা ভূমিকা পালন করে। একটু সঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যে কোন বিপর্যয়ে পরোক্ষ ক্ষতি অর্থনীতির ওপর সুদূর প্রসার প্রভাব বিস্তার করে যা অনেক সময়ই আমাদের অধরা থেকে যায়। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। নিচে বিষদ ভাবে সেগুলি আলোচনা করা হল ঃ

১। যে কোন বিপর্যয়ের ফলে মানুষের মৃত্যু। অঙ্গহানী, পঙ্গুতা ও কর্মহীন হয়ে থাকে। দেখা যায় যে ব্যক্তির কর্মরত অবস্থায় মারা গেলেন এবং পরবর্তী অবস্থায় তাদের পারিবারিক আয় কমতে বাধ্য। অন্যদিকে দেশ বা জাতি ঐ মানুষের সৃষ্ট সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিপর্যয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা পঙ্গুতা আসতে পারে। ফলে আগামী বর্ষে তার রোজগার কমতে বাধ্য এবং অন্যদিকে দেখা যায় কী

দেশ বা জাতি তার পরিশ্রমের শতকরা একশত ভাগ লাভে বঞ্চিত হল। আবার দেখা যায় যে ভূমিকম্পে কলকারখানা ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে কিছু সংখ্যক মানুষের স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন আয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বহু মানুষ মানসিক রোগের স্বীকার হয়ে পড়েন ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির মধ্যে পড়েন। প্রাণী সম্পদের ক্ষতি ঐ এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে থাকে। এখনও ভারতে শতকরা ৬০ শতাংশের বেশী মানুষ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। হঠাৎ কোন ঘূর্ণীঝড় বা খরা যদি ব্যাপক গবাদি পশু নষ্ট করে তার প্রভাব স্থানীয় ভাবে কৃষিকাজের উপর পড়তে বাধ্য। গত ওড়িষার ঘূর্ণীঝড়ে দেখা গেছে যে ব্যাপক সংখ্যক চাষের কার্যে ব্যবহৃত গবাদি পশু মারা যায়। যা স্থানীয় ভাবে পরবর্তী ফসল উৎপাদনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কৃষিকার্যে, হস্তচালিত কুটিরশিল্পে বহুক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী বা ব্যবসায়ী মূলধন বিনিয়োগ করলে তা থেকে তাদের আয় হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর বন্যায় বহু সংখ্যক চাষী ও ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসায়ী ক্ষতির মুখে পড়ে। পরের বছর ঋণ করে আবার শুরু করে এবং অনেক জায়গাতে ঐ মানুষজন বারে বারে ক্ষতির মুখে পড়েন। তাই আমরা মনে করি যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় গরীব মানুষকে আরও গরীব করে তোলে। যে কোন বিপর্যয়ে মানুষের যেমন সম্পদহানী হয়ে থাকে তেমনই দেশ বা জাতীয় সম্পদের প্রভুত ক্ষতি হয়ে থাকে। এই ক্ষতির মধ্যে থেকে সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করে বা ঋণের মাধ্যমে জরুরী অর্থে সংস্থান করে। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য বহুক্ষেত্রে সুদের হার বেশ চড়া। কিন্তু নিরুপায় হয়ে তখন তা করতে হয়। ঠিক তেমনই বিপর্যয়ে দেশ বা জাতির সম্পদের প্রভূত ক্ষতি হয়ে থাকে। অনেক সময় ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য বাইরের ঋণ নিতে হয় যার পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী ঋণের বোঝা, যা থেকে দেশ বা জাতির বেরিয়ে আসা বেশ অসুবিধাজনক। এমনও দেখা যায় যে সম্পদগুলি বিপর্যয়ের ফলে নষ্ট হল তার পরবর্তী বছরগুলির কার্যকারিতা নষ্ট হল। পরবর্তী পরিস্থিতির ফলে জরুরী ভিত্তিতে ঐ সম্পদের পুনঃ নির্মাণ ও তার সুদের বোঝা অধিকাংশ ক্ষেত্রই দেখা যায়। এই ঋণের বোঝা দেশ বা জাতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

কোন বিপর্যয়ের ফলে শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে এবং কাঁচামালের যোগান কম হতে পারে বা বন্ধ হতে পরে যার ফল হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী মন্দার সৃষ্টি হতে পারে। একই ভাবে আমদানি ও রপ্তানি বাজারের সাধারণ চরিত্র বদল হতে পারে। আবার দেখা যায় যে বিপর্যয়ের পরবর্তী অবস্থায় রাজস্ব আদায় উল্লেযোগ্য ভাবে কমে যেতে পারে। আবার জরুরী প্রয়োজনে উন্নয়ণমূলক কাজে যাওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পরে। আমরা যে বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব দেখি তা হল যে পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হয়েছে বা যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তার উপর ভিত্তি করে। খুব কম সময়ই উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত করি। কখনও ক্ষতির পরিমান বেশি করে বলা হয় ক্ষতিপূরণ পাবার আশায়। ফলে সঠিক ক্ষতির পরিমান নিরুপণ করা হয়ে ওঠে না।

কখনও কখনও বিপর্যয়ের পর শিল্পে মন্দা দেখা যায় যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পরে বিমান পরিবহনে ও বীমাশিল্পে মন্দা চলছে। হয়তো আগামীদিনে তা কাঠিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী সেখানে বিভিন্ন ভাগে সরকারীভাবে শুল্ক বসানো হয়ে থাকে। যেমন সারচার্জ বসানো ইত্যাদি। কখনও বিভিন্ন ভাবে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়ার জন্য বন্ড ছাড়া হয় এবং মেয়াদ অন্তে সুদ সমেত তা বিনিয়োগকারীকে ফেরত দেওয়া হয়ে থাকে। কখনও রাজ্যসরকারগুলি বন্যা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিভিন্ন বিনিয়োগকারী সংস্থা যেমন—HUDCO বা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদ সমেত ফেরত দিতে বাধ্য হয়ে থাকে। উপরিউক্ত ব্যবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নয়ণমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে ভুল পরিকল্পনা, সময়মত পরিকল্পনা রূপায়ণে বাধা, সময়ের মধ্যে শেষ না হওয়ার জন্য আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। ঐ প্রকল্পের পরিকল্পনায় স্থানীয় মানুষের যোগদানের অভাব হেতু তার উপযোগিতা হয়ত কম হতে পারে। উদ্ধার কার্য পরিচালনা ও অস্থায়ীভাবে মানুষের বসবাসের ও খাদ্যের যোগান একটি ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার যা সাধারণত উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনাকে ব্যাহত করে। নষ্ট হওয়া রাস্তা, ব্রিজ, সরকারী আবাসন, স্কুল কলেজ সরকারী সম্পত্তি সময়মত ক্ষতি মেরামত বা নির্মাণ হয়ে ওঠে না তা থেকে সর্বস্তরে ক্ষতি হয় ও দেশ রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হয়।

বিপর্যয় ও মানসিক স্বাস্থ্য
(Disaster & Mental Health)

কোন বিপর্যয় পরবর্তীকালে, মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয় একটা স্বাভাবিক পরিণতি। অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে এই বিপর্যয় দুঃর্ঘটনার অব্যবহিত পরে বা কয়েক মাসের মধ্যে দেখা যায়। কারণ হিসাবে দেখা যায় হঠাৎ বেড়ে যাওয়া দুশ্চিন্তা বা বিপন্নতা বোধ। আমরা এই বিপন্নতা বোধের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নিজ স্বাস্থ্য ভাবনার মধ্যে দিয়ে। সেক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলি দেখতে পাই তা হল, কোন বিষয়ের উপর অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা, মাত্রাতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, নিদ্রাহীনতা, দুঃস্বপ্ন, ভীতিবোধ, অনমনীয়তা ও আরও অনেক। যে মানুষ বিপর্যয়ের পরে নিজে বা পরিবারের বা আত্মীয়দের মৃত্যু, আঘাত ও সম্পদের নষ্ট দেখেছে, তাদের পক্ষে মানসিক সঙ্কট অন্য সাধারণ অসুখের মত একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক সময় হঠাৎ আর্থিক ক্ষতি, বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব বোধ বা তিল তিল করে গড়ে ওঠা সম্পদের হঠাৎ ধ্বংস মানুষের আঘাত আরও তীব্রতর করে তোলে। আমরা সাধারণত নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই যেমন ঃ—

- জীবন ধারার ছন্দ পতন বোধ।
- নিজ আস্থার অভাব বোধ।
- দুর্ঘটনার পুনঃ পুনঃ অনুভূতি।
- নিদ্রাহীনতা/ দুস্বপ্ন।
- দুঃখবোধ/ নিরাপত্তার অভাব বোধ।
- যৌন প্রবৃত্তিহীনতা।
- ঝুকিপূর্ণ ঘটনাকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- ক্রোধ/ ক্রোধীভাব।
- ভুলে যাওয়া/ নিস্পৃহ ভাব।
- বেঁচে যাওয়ার জন্য অপরাধবোধ।
- নেশা বৃদ্ধি/ ড্রাগের প্রতি আসক্তি।
- স্বাভাবিক সামাজিক জীবন থেকে গুটিয়ে নেওয়া।
- মাত্রাতিরিক্ত আবেগ প্রবণ হওয়া।
- নিরাপত্তার অভাব বোধ।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় NGOদের ভূমিকা ঃ

- নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটি ছোট গ্রুপ তৈরী করা যার মধ্যে বিশেযজ্ঞ ও সাধারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী থাকা প্রয়োজন।

- নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যথা রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে কোন দুর্যোগ মোকাবিলার কোন কর্মসূচি আছে কিনা যদি থাকে তা সংগ্রহ করা। দেখে নেওয়া যে সেখানে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে কিনা। যদি থাকে তাতে কিছু সংযোজনের প্রয়োজন আছে কিনা, যদি না থাকে তবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা ও প্রয়োজনীয় সংযোজন ঘটান। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান রাখা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করা যে "অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক আচরণই স্বাভাবিক ঘটনা।" সুচিন্তিত স্বাস্থ্য ভাবনা তাকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করবে।
- নিজের ও নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে জানুন ও অপরের অভিজ্ঞতার ও বিদ্যার খোজ রাখুন। জরুরী প্রয়োজনে তাদের সাহায্য পাওয়া যায়।
- বিজ্ঞাপন ও সংবাদ আদান প্রদানের কী ব্যবস্থা করা যায় আগে ভেবে রাখুন। মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নির্ভরযোগ্য ডাক্তার কোথায় পাবেন জেনে রাখুন।

মানসিক অবসাদ (Mental Depression) ঃ

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্বাভাবিক কারণেই মানুষ দিশে হারা হয়ে পড়ে। জীবন ও সম্পদ বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা হয়ে পড়ে এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল। এই প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠবার আগেই হয়ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকে আরও শোকাবহ ঘটনা।

তিল তিল করে, দিনের পর দিন গড়ে তোলা সংসার মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়। ভেসে যায় জমানো ধান চাল, গৃহপালিত পশু, পুকুরে পালিত মাছ, খেতের ফসল, ঘরবাড়ি সহ সব সম্পদ। এতে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয় তার শোক তখন সামলানো সত্যই কঠিন। তাই আসে অবসাদ। পিছনে পড়ে থাকে হারানো সম্পদ ও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বজন হারানো বেদনা। আর সামনে অন্ধকার অথবা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন দৈনন্দিন খাওয়া, থাকার জায়গা, রোগ ও চিকিৎসা, সন্তানের পড়ালেখার সমস্যা। তা ছাড়া নিজ বাসস্থানে ফিরে যাবার উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাব। এর ফলে অবসাদ গ্রস্ত হওয়া অনেকের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ঘটনা

এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না পারলে মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব পড়তেই পারে। তার ফল মারাত্মক হয়ে সারা জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। এমন ঘটনাও জানা গেছে যে শহরে দিন মজুরের কাজ করতে এসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ২/৩ দিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাড়িতে ফেরা সম্ভব হয় নি। পরে রেল চালু হতে ফিরে গিয়ে দেখেন শুধুই জল। বৌ-ছেলে-মেয়ের কোন খোঁজ নেই। শুনলেন ওরা জলের তোড়ে ভেসে গেছে। হত ভাগ্য দিনমজুর আর সামলাতে পারেননি। নিজের কাঁধের কোদাল-কুঁড়োল, দা-ঝুড়ি রেখে মাথার গামছা গাছে বেঁধে ঝুলে পড়ল। মনকে শক্ত করতে না পারলে বা বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে তার মোকাবিলা না করতে পারলে অনেকেই ঐ পথ নিতে পারে।

এই মানসিক অবস্থা সামাল দেবার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমাজ কর্মীদের দায়িত্ব বেশি। প্রথমই তাঁদের দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল গুলিতে এমন এক মানসিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে মানুষ জানবে যে তাঁদের দুর্যোগ মেনে নিয়েই বাঁচতে হবে। **এক কথায় দুর্যোগকে সঙ্গী করেই বাঁচতে শিখতে হবে। আর একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে জানতে হবে।**

মানসিক অবসাদ কাটিয়ে উঠবার সবচেয়ে ভাল পথ হল মানুষের সঙ্গে থাকা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তথা সামাজিক প্রাণী। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার প্রস্তুতি ও প্রাক্ সাবধানতা, দুর্যোগের সময় এবং পরবর্তীকালের ত্রাণ শিবির ও পুনর্বাসন প্রশ্নে সকলকেই অপরের জন্য কাজে লেগে পড়তে হবে। নিজেকে, নিজের পরিবারকে ভালবাসার সঙ্গে ভালবাসতে হবে অন্যকেও। এইভাবে কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেই অবসাদ দূর করা যাবে। মিলে মিশে বেঁচে থাকারও সহজ পথ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মহিলাদের ভূমিকা (Role of women in Disaster) ঃ

শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, সংসারের ঝক্কি ঝামেলার ক্ষেত্রে মহিলাদের দায়টাই বেশি। বিশেষ ভাবে নিম্নবিত্ত ও গরীব পরিবারে সেই দায় অনেক বেশি। সেখানে মহিলাদের অনেকেই ক্ষেত খামারে বা কারখানায় বা অন্যত্র কাজ করেন। এরপরেও সংসারের সব ঝামেলা তাঁকেই বহন করতে হয়। সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন, জ্বালানী ও জল সংগ্রহ, রান্না এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে খাদ্য সংগ্রহও মহিলাদের করতে হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেলে মহিলাদের আগলে রাখতে হয় সম্পদ ও সন্তানদের। পুরুষরা সম্পদের মায়া কাটিয়ে সব ফেলে চলে যেতে পারলেও মহিলারা প্রাণ থাকতে তা পারেন না. কারণ ঐ সব কিছুই তাঁরা "তিল তিল করে তালে পরিণত করেছেন"। তবু ছাড়তে হয়, যেতে হয় ত্রাণ শিবিরে।

সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আব্রুর সমস্যা, জল, খাদ্য, ওষুধ ও আচ্ছাদানের সমস্যা। এই ক্ষেত্রে মহিলাদের পাশে থেকে অবশ্যই পুরুষদের সাহায্য করা উচিৎ। উপরে যে সব সমস্যার কথা বলা হয়েছে তার সব কটির ক্ষেত্রেই পুরুষরা সাহায্য করতে পারেন এবং তাঁদের তা কর্তব্য বলে গণ্য করা উচিৎ। তাছাড়া সেনিটেশন, পুষ্টিসাধন ও সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। কারণ তাঁরাই সংসারের সমন্বয় সাধক বা কোঅর্ডিনেটর, এক কথায় গৃহকর্ত্রী।

দুর্যোগ চলাকালে মহিলাদের ও শিশু স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরপত্তা ও সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের বিশেষ দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য বলে গণ্য করা উচিত।

ফসলের বীমা
(Crop Insurance)

যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, বিশেষভাবে খরা, বন্যা ও ঘূর্ণীঝড়ে ফসল নষ্ট হয়, নষ্ট হয় মজুদ খাদ্য শস্যও। সাম্প্রতিক (২০০০ সাল) দক্ষিণবঙ্গের প্রবল বন্যা এবং ১৯৯৯ সালের ওড়িশার ঘূর্ণীঝড়ে ফসল ও মজুদ খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ ভাবে কৃষকরা এই জন্য কোন ক্ষতি পূরণ পান না। সারা বছরের খাদ্য ও সংসার খরচ এবং সর্বোপরি চাষের খরচ মাঠে মারা যায়। বীমা থাকলে চাষীরা কিছু ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন এবং পরবর্তী চাষের জন্য তার কিছু মূলধন হাতে আসতে পারে। **কাজেই রাজ্য সরকারের উচিত সামগ্রিক ভাবে ফসলের বীমা করে রাখা। এই ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে বীমার পরিধি যেন ভাগচাষীদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত থাকে।** কারণ সাধারণ ভাবে জমির মালিকরাই বীমার অর্থ পেয়ে থাকেন। অথচ ভাগচাষীরা বিনিয়োগ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে থাকেন। যে চাষী নিজে চাষ করেন অথবা ভাগ চাষ করেন উভয় ক্ষেত্রেই চাষীকে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। তাই, বীমার বাবদে ক্ষতিপূরণ চাষী ও ভাগচাষী উভয়েরই পাওয়া উচিত এবং তার যাতে ব্যবস্থা হয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির তা দেখা দরকার। এ ব্যাপারে খেত মজুরদের বিষয়ও ভাবা দরকার। কারণ এটা সামাজিক দায়।

রাসায়নিক বিপর্যয়
(Chemical Disaster)

কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপাল শহরে মিক (MIC) গ্যাস বিস্ফোরণে হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এবং লক্ষাধিক মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়। যে কারখানার গ্যাস থেকে ঐ বিপর্যয় হয়েছিল তারা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বহু কোটি টাকা কোম্পানী জমা দিলেও হারানো মানুষগুলি ফিরে আসে নি এবং পঙ্গু হওয়া মানুষগুলি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনি। আমরা ভুলতে পারি না, ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোসিমা (৬ আগষ্ট) ও নাগাসাকি (৯ আগষ্ট) শহরে আমেরিকা যে পরমাণু বোমা ফেলে ছিল সে কথাও। তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়, দুটি দ্বীপের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি বহন করে চলেছে। এই রোগ সৃষ্টি হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা থেকে। তেমন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনায়ও তেজস্ক্রিয়তার সমস্যা দেখা যায়। ফলে, রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয়তার বিপর্যয় সম্পর্কে আগে থেকে সাবধান হতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সজাগ করতে হবে। আর সত্যি সত্যি ঐ বিপর্যয় ঘটে গেলে ত্রাণ ও পুণর্বাসনে সচেষ্ট হতে হবে।

সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে জনবসতি পূর্ণ অঞ্চলে রাসায়ানিক কারখানা রাখা যাবে না। প্রতিকার হিসাবে এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। রাসায়নিক ও বাজির কারখানা এবং পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র জনবসতি থেকে দূরে রাখতে হবে।

সরকারি সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া আর্সেনিক দূষণের স্থায়ী সমাধান অর্থাৎ বিকল্প জলের ব্যবস্থা করা যাবে না। তবে, এ ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। ছয়ের দশকের সূচনা থেকে আর্সেনিক দূষণ দেখা দেয়। এদেশে রোগ হিসাবে প্রমাণিত হয় ১৯৮৩ সালে। তখন মূলত মালদহ থেকে ২৪পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৯৯৩ সালে কলকাতায়ও জলে আর্সেনিক পাওয়া যায়।

আর্সেনিক মিশ্রিত জলে কোন রঙ বা গন্ধ না থাকায় নিঃশব্দে এই বিষ শরীরে বাসা বাঁধে এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে। তাই সাবধানতাই হল এর প্রধান প্রতিষেধক। এটাকে একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে গণ্য করা উচিৎ। সেভাবেই তার মোকাবিলা করতে হবে। স্থানীয় নলকূপগুলিতে আর্সেনিকের অস্তিত্ব ধরা পড়লে এবং বিকল্প পানীয় জলের সংস্থান না থাকলে পুকুরের জল ফুটিয়ে পান করতে হবে।

জলে আর্সেনিক দূষণ
(Arsenic Pollution in Water)

আর্সেনিক এক রাসায়নিক পদার্থ। এর অন্য নাম হল 'সেঁকোবিষ'। পৃথিবীর নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশে এই রাসায়নিক পানীয় ও ব্যবহার্য জলে মিশে বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে। ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলে আর্সেনিকের মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। এর বিষক্রিয়ার প্রভাবে মৃত্যুও হয়েছে বহু লোকের। এই রোগের নাম আর্সেনিকোসিস। রোগটির প্রকৃত অর্থে কোন চিকিৎসা নেই। আর্সেনিক যুক্ত জল পান ও ব্যবহার বন্ধ করে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসায় দুষণে আক্রান্ত ব্যক্তি বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারেন। তবে গুরুতর অবস্থায় মৃত্যু ঠেকানো যায় না।

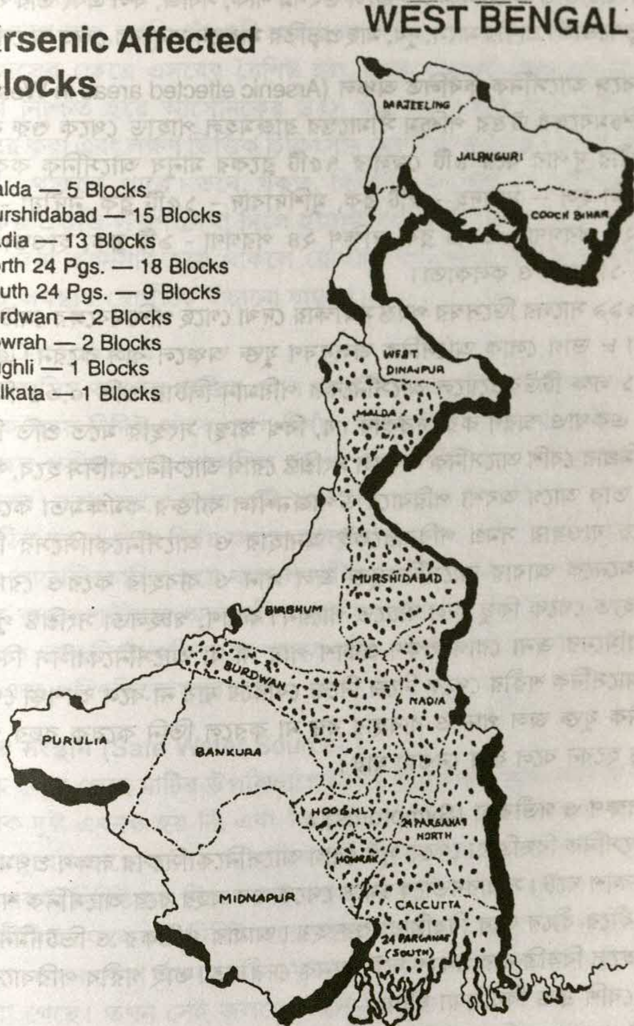
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে জলে মিশ্রিত আর্সেনিকের সহনশীল পরিমান হল প্রতি লিটার জলে ০.০১ মিলি গ্রাম। আমাদের দেশে ঐ সহনশীল মাত্রাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রতি লিটার জলে ০.০৫ মিলি গ্রাম। দেখা গেছে এই মাত্রায় মিশে থাকা জল পান ও ব্যবহার করে মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন।

স্বাভাবিক জল হল স্বাদ, রং ও গন্ধহীন। কিন্তু, এই গুণ সম্পন্ন জলেও রোগ জীবাণু থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে মানুষ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই জীবাণু চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু, আর্সেনিক মিশে থাকা জলের বিশুদ্ধতা অনুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়েও নিরূপণ করা যায় না। এই জন্য রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিট্যুট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, স্কুল অব ট্রপিক্যাল ডিসিজেস এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগে এ ব্যবস্থা আছে। রাজ্যের সব অঞ্চল থেকে কলকাতায় নল কূপের জল নিয়ে এসে পরীক্ষা করানো প্রকৃত অর্থেই এক অসম্ভব ব্যাপার। সম্প্রতি হাইজিন ইনস্টিটিউট বহনযোগ্য পরীক্ষার সরঞ্জাম ও রাসায়নিক দ্রব্য সহ থলে উদ্ভাবন করেছে। এই থলের মধ্যকার দ্রব্য ও রাসায়নিক অণুঘটক নিয়ে গ্রামে গ্রামে জলের রাসায়নিক বস্তু তথা আর্সেনিক দূষণ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখানে জলে আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া গেলে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে সেই জল পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে পাঠানো হয়। এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ ১ লিটার জলে ০.০৫ মিগ্রা হলে তবেই ধরা পড়ে। কাজেই মানুষকে এই সব বিষয় বিবেচনা করেই জল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে, সব জায়গায়ই জলে আর্সেনিক অস্তিত্ব ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরে বিকল্প জলের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বিগত শতাব্দর ছয়ের দশকের শুরু থেকেই আর্সেনিক দূষণ তথা সংশ্লিষ্ট রোগ আর্সেনিকোসিসের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই রোগের লক্ষণ গুলি অন্যান্য রোগের লক্ষণের সঙ্গে মিল থাকায় চিকিৎসায় বিভ্রাট দেখা দেয়। ইতিমধ্যে রোগ বেড়ে গিয়ে অনেককে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তারপরে ১৯৮৩ সালে কলকাতায় স্কুল অব ট্রপিক্যাল ডিজিজেস সংস্থায় রোগটি চিহ্নিত করেন। তখন দেখা যায় এর বিষক্রিয়ায় মালদহ থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অঞ্চলে অগভীর নলকূপের জল আর্সেনিক

Arsenic Affected Blocks

Malda — 5 Blocks
Murshidabad — 15 Blocks
Nadia — 13 Blocks
North 24 Pgs. — 18 Blocks
South 24 Pgs. — 9 Blocks
Burdwan — 2 Blocks
Howrah — 2 Blocks
Hughli — 1 Blocks
Kolkata — 1 Blocks



Source : AIIH&PH, Kolkata

যুক্ত। সব নল কুপের জলে এটা পাওয়া না গেলেও নির্দিষ্ট অঞ্চলে আর্সেনিক বিষক্রিয়া বাড়ছে। এছাড়াও আর্সেনিক যুক্ত জলে উৎপন্ন শাক, সবজি, ফল এবং তার ফলে সরাসরি অথবা তৃণভোজী প্রাণীর মাংস, দুধ, মাছ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের দেহে আর্সেনিক ঢোকে।

পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক কবলিত অঞ্চল (Arsenic effected areas in West Bengal) ঃ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রাজমহল পাহাড় থেকে শুরু করে গঙ্গা ও ভাগীরথীর দুপার ধরে ৯টি জেলার ৭৫টি ব্লকের মানুষ আর্সেনিক কবলিত। সেই জেলাগুলি হল -- মালদহ - ৫টি ব্লক, মুর্শিদাবাদ - ১৫টি ব্লক, নদীয়া - ১৩টি ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা - ১৮টি ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৯টি ব্লক, হাওড়া - ২টি ব্লক, হুগলি - ১টি ব্লক ও কলকাতা।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের মোট জন সংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ লোক আর্সেনিক জলদূষণ যুক্ত অঞ্চলে বাস করেন। এই অঞ্চলের অন্তত ১ লক্ষ টিউবওয়েলে আর্সেনিকের পরিমান লিটার প্রতি ০.০৫ মিগ্রার বেশি। এখানে একথাও স্মরণ করা দরকার যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি লিটার জলে ০.০১ মিগ্রার বেশি আর্সেনিক থাকলে সংশ্লিষ্ট রোগ আর্সেনিকোসিস হবে, যার পরিণতি মৃত্যু। তার আগে অবশ্য পরিবারে উপার্জনশীল ব্যক্তির কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমগ্র পরিবারকেই অনাহার ও আর্সেনিকোসিসের শিকার হতে হবে। অনেকে আবার আর্সেনিকযুক্ত জল পান ও ব্যবহার করেও রোগ লক্ষণ বা মৃত্যুর হাত থেকে কিছু কাল বাঁচতে পারেন। কারণ, স্বচ্ছলতা সংশ্লিষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য ও ভিটামিনের জন্য রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না বা আর্সেনিকোসিস বিলম্বিত হয়। তবে, আর্সেনিক শরীর থেকে নিজে নিজে বেরিয়ে যায় না বলে আশঙ্কা থেকেই যায়। আর্সেনিক যুক্ত জল পান ও ব্যবহার বন্ধ না করলে তিনি কয়েক বছর পরে হলেও আক্রান্ত হবেন বলে ধরে নেওয়া যায়।

রোগ লক্ষণ ও গভীরতা (Symptoms) ঃ

আর্সেনিক বিষক্রিয়া থেকে সৃষ্ট রোগ আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ প্রথম দিকে খুবই ধীরে প্রকাশ ঘটে। সাধারণভাবে ছমাস থেকে এক বছর ধরে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে তার বিষক্রিয়া শুরু হয়। আবার পুষ্টিকর ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়া হলে বিষক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে অনেক দেরীতে। তাই গরীব পরিবারে আর্সেনিক অনেক বেশি দ্রুত বিষক্রিয়া ঘটায়।

এই রোগে অর্থাৎ আর্সেনিকোসিসে প্রথমে ত্বকের রঙ কালচে ও ত্বক কর্কশ হয়ে যায়। আর তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশ ঘটে হাত ও পায়ের তালুতে। কোন কোন ক্ষেত্রে হাত, পা ও গায়ে সাদা/কালো ছিট ছিট দাগ দেখা যায়। অবশ্য এই দুধরণের লক্ষণ অন্য চর্মরোগের জন্যও হতে পারে। আর্সেনিকোসিসের ক্ষেত্রে এসব ঘটে ত্বকের রঙ তৈরির কোষকে আর্সেনিক সবার আগে উত্তেজিত করে বলেই। তখন ত্বক, নখ, চুল ও রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ত্বকে এবং বিশেষ ভাবে হাত ও পায়ের তালুতে গুটি গুটি দানা দেখা দেয়। এই যন্ত্রনাদায়ক অবস্থায় কোন কাজ করা যায় না। মুখের ঝিল্লিতে কালো ছোপ, হাত পায়ে শোথ, চোখ লাল, কাশি, হাঁপানী প্রভৃতি লক্ষণও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। আর্সেনিকোসিসের ক্ষেত্রে এসবের বৈশিষ্ট হল, কোন ওষুধেই কাজ হয় না। তখন পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে আর্সেনিকের উৎস বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে আর্সেনিক বের করা এবং লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে না পারলেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। তবে, যকৃত, কিডনির অসুস্থতা বা পেশির ক্ষিণতা, শ্বাসনালির কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হবে। আর আর্সেনিকের জন্য ক্যানসার হয়ে থাকলে রোগীকে হাসপাতালে নিতেই হবে এবং তখন গুরুতর অবস্থায় রোগীকে বাঁচানো যায় না।

রোগ নির্ণয় (Detection) ঃ

আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ লক্ষণ গুলি অন্যান্য চর্মরোগের সঙ্গে মিল থাকায় অনেক সময় নির্দিষ্ট ভাবে রোগ নির্ণয় বেশ কঠিন। একদিকে স্থানীয় জলের উৎসগুলির জল পরীক্ষা করে আর্সেনিক পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎসগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। তবে, হাতে পায়ে গুটি, পচন সহ স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

তবে, সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করতে হলে রোগীর ত্বক, নখ, চুল ও রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। আর্সেনিকোসিস হয়ে থাকলে পরীক্ষায় ঐ সব বস্তুতে আর্সেনিক পাওয়া যাবে। ত্বকের বদলে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হয়ে থাকলে এই পদ্ধতিতেও রোগ নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে ক্ষত ক্যানসারে পরিণত হয় এবং পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে।

বিকল্প জলের সংস্থান (Safe Water Source) ঃ

সমীক্ষায় দেখা গেছে মাটির উপরিভাগে অর্থাৎ পাতকুয়া, পুকুর, নদী বা ঝিলের জল আর্সেনিক দুষ্ট এখনও হয় নি, এবং বিজ্ঞানীদের ধারনা এই সব জল আর্সেনিক মুক্ত থাকবে। সূর্যের তাপে জলের আর্সেনিক প্রভাব কমে। কারণ, আর্সেনিক যুক্ত জল প্রবাহিত হয় একটা নির্দিষ্ট স্তর দিয়ে। সেই স্তর ৩০০ ফুট গভীরতা থেকে ১০০/১৫০ ফুট ভূস্তরে সীমিত। ফলে এই নির্দিষ্ট স্তরের ছাড়া অন্য জল আর্সেনিক মুক্ত এবং তা ব্যবহার যোগ্য। কোন কোন অঞ্চলে ৪০০ ফুটগভীরতায়ও জলে আর্সেনিক বিপজ্জনক মাত্রায় পাওয়া গেছে। তখন সেই জলকে আর্সেনিক মুক্ত করে নিতে হবে।

কলকাতা পুরসভা গঙ্গার জলকে পলতা ও গার্ডেনরীচে ফিটকারি ও ক্লোরিন দিয়ে জীবাণু ও তলানী মুক্ত করে শহরের বিস্তীর্ন অঞ্চলে সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া শহর কলকাতায় বহু গভীর নলকূপ বসিয়েও জল সরবরাহ করা হয়। তবে, সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতায় কয়েকটি নলকূপে আর্সেনিকের অস্তিত্ব বিপদসীমার উপরে থাকায় সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে সরকারি উদ্যোগে নদীর জল মালদহ ও ২৪ পরগনায় তলানী ও

জীবাণু মুক্ত করে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, প্রয়োজনের তুলনায় এই উদ্যোগ খুবই কম। তাই আর্সেনিকের মাত্রা জল থেকে কমানোর জন্য কয়েকটি উপায়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

১। বোতলে জল নিয়ে তা লিটার প্রতি ৫/৬ ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে রোদে রেখে দিতে হবে। রোদে থাকার সময় বোতল শোয়ানো থাকবে। সন্ধ্যায় সেগুলি দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সেই জল ছেঁকে নিয়ে বা উপর থেকে (তলানী বাদ দিয়ে) ঢেলে নিয়ে ব্যবহার করা যাবে। এই জলে আর্সেনিক কমে যাবে।

২। বাড়িতে সাধারণ ভাবে নদী, পুকুর বা নলকূপের জল কলশি বা জালায় নিয়ে তাতে ফিটকারি গুলে মিশিয়ে দিতে হবে। সেই জল ছেঁকে নিয়ে বা ফিল্টারে দিয়ে পরিমান মত ক্লোরিন মিশিয়ে নিতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে।

৩। নলকূপের সঙ্গে বা পাশে ফিল্টার বেড তৈরি করে ফিটকারি ও ক্লোরিন মিশিয়ে বালি, পাথর/খোঁয়ার বেড মাধ্যমে ফিল্টার করে আর্সেনিক মুক্ত জল পাওয়া যাবে।

৪। সাধারণ ভাবে বৃষ্টির জলকে অন্যতম প্রধান বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। বৃষ্টি বছরে কয়েক মাস হলেও তা পাত্রে সংগ্রহ করে কয়েক মাস আর্সেনিক মুক্ত জল পান ও ব্যবহার করা যাবে। তাতে শরীরে ঐ কমাস আর্সেনিক জমা হবে না বরং জমা আর্সেনিক কিছু পরিমানে হলেও কমবে। আর ছাদ বা টিনের চালের বৃষ্টির জল বাঁধানো কূয়ায় সংগ্রহ করে আরও বহু দিন ব্যবহার করা যাবে।

সরকারকেও আর্সেনিক মুক্ত জলের জন্য ব্যয়কে অপব্যয়ের বদলে বিনিয়োগ বলে গণ্য করতে হবে। বিকল্প জলের জন্য উদ্যোগী হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে ঐ বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। মানুষ সচেষ্ট হলে বিকল্প জলের উৎস কষ্টকর হলেও খুঁজে পাওয়া যাবেই।

আর্সেনিক কবলিত ৯টি জেলার হাল (১৯৯৭ সালে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে)

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন — ৮৮ ৭৫০ বর্গ কিমি
ও জনসংখ্যা — ৮ ০২ ২১ ১৭২ (২০০১ সালের জনগণনা)
(উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বর্ধমান, হুগলী হাওড়া ও কলকাতা)

আর্সেনিক কবলিত জেলাগুলির আয়তন	ঃ ৩৮ ৬৭৭ বর্গ কিমি
ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যা	ঃ ৩ কোটি ৮০ লক্ষ
মোট ব্লক / থানা	ঃ ১৬৩
আর্সেনিক কবলিত ব্লক/ থানা	ঃ ৭৬
এই অঞ্চলের জন সংখ্যা	ঃ ৯৫,৬২,৮৯৮
আর্সেনিক দূষ্ট জল ব্যবহারকারী	ঃ ১১ লক্ষ (প্রতিলিটার জলে ০.৫ মিগ্রার বেশি)
ব্লক/ থানাগুলিতে নিরাপদ মাত্রার আর্সেনিক দুষ্ট জল ব্যবহার করেন	ঃ ১৫ লক্ষ লোক
আর্সেনিক জনিত চর্মরোগে আক্রান্ত	ঃ ২ লক্ষ লোক

সূত্র ঃ AIIH&PH কোলকাতা

ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা

(Geographical Information System, G.I.S.)

ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা অথবা Geographical Information System খুব বেশি দিন আগের বিষয় নয়। ভূপৃষ্ঠের ওপরকার বিভিন্ন অবস্থানের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও তা জানানোর জন্য কমপিউটারের সাহায্য নেওয়া হয়।

এটা কিভাবে, কাজে সাহায্য করে?

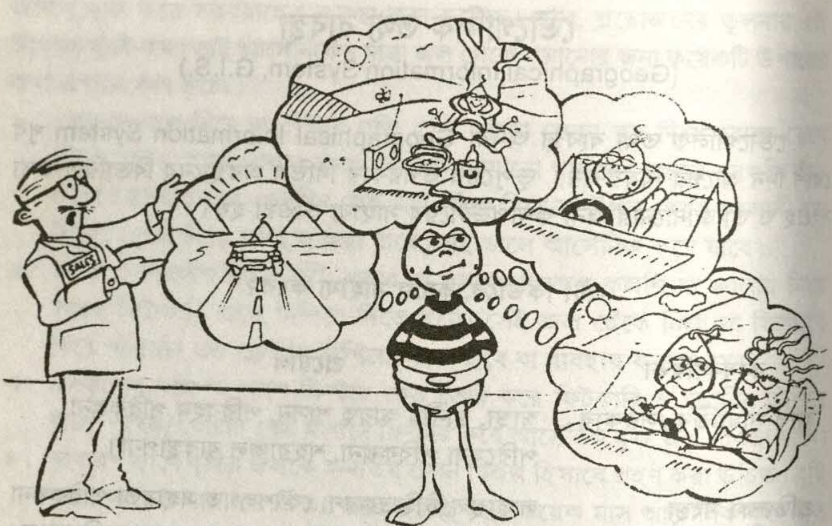
কার্যকারিতা	প্রয়োগ
আর্থ সামাজিক/সরকার	স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন, পরিবহন পরিকল্পনা, পরিষেবা পরিকল্পনা, শহরাঞ্চল ব্যবস্থাপনা।
প্রতিরক্ষা সংস্থা	লক্ষ্যস্থল চিহ্নিতকরণ, কৌশলগত সহায়তা পরিকল্পনা মোবাইল কম্যান্ড মডেলিং, গোয়েন্দা তথ্য সংহতি সাধন।
বাণিজ্য ও ব্যবসা	শেয়ার বাজার বিশ্লেষণ, বীমা, প্রত্যক্ষ বিপণন, বিপনন লক্ষ খুচরা বিপণন কেন্দ্র।
উপযোগিতা	নেট ওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা, পরিষেবা সংস্থান, টেলি যোগাযোগ জরুরী মেরামতি।
পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	জমি ভরাট করার ক্ষেত্র বাছাই ও খনিজ সম্পদের মানচিত্র দূষন তদারকী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনুমান, সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ণ

কমপিউটার সিস্টেম অ্যান্ড সফটওয়ার (Computer System and Software)

জি আই এস পরিচালিত হয় নানা ধরণের কমপিউটার মাধ্যমে। বহনযোগ্য পারসন্যাল কম্পিউটার (পি. সি) থেকে সুপার কমপিউটার। এইজন্য থাকে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়ার।

মানুষ ও জি আই এস (GIS) ঃ

জি. আই. এস কেন্দ্রীভূত বিষয় হল, সফটওয়ার, হার্ডওয়ার, ডাটা ও অ্যানালাইসিস উপকরণ। এসব যান্ত্রিক ব্যাপার থাকলেও আসলে মানুষ এর পরিকল্পনাকার, পরিচালক ও রূপকার। বস্তুত মানুষই একে পরিচালনা করে এর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়। জি আই এস একজন মানুষের ক্ষুদ্র গবেষণা থেকে শুরু করে সমষ্টিগত গবেষণা ও বিশ্লেষণ পর্যন্ত সবকিছুই করতে পারে। সব গবেষণা সফল হয় একথা বলা যায় না। আবার কোন কোনটা সঠিক তথ্যের অভাবে ব্যর্থও হয়ে যায়।



প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস থেকে শুরু করে তার মোকাবিলা ও পরবর্তী স্তরের সব কাজে এই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা যায়। তবে তার উপযুক্ত পরিচালনা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, সর্বোপরি তাকে কাজে লাগাতে হবে মানুষকেই।

সরকারি দপ্তর
(Govt. Offices)

জেলা স্তরে সব রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ ও প্রতিকার, ত্রাণ, পুনর্বাসনের মূল দায়িত্ব জেলা শাসকের (ডি এম)। আর ব্লক স্তরে প্রশাসনিক দায়িত্ব বি ডি ও এর, পঞ্চায়েত (ত্রিস্তর) এই প্রশাসনিক কাজে প্রধান সহায়।

এই সঙ্গে সব স্বেচ্ছাসেবকেরই বিভিন্ন দপ্তরের কাজ বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। যেমন কৃষি মন্ত্রকের দায়িত্ব বন্যা (কৃষি)। আবাসন ঃ পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যঃ চিকিৎসা, অসামরিক বিমান পরিবহন ঃ বিমান দুর্ঘটনা, প্রতিরক্ষাঃ, দেশরক্ষা এবং বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা, স্বরাষ্ট্র ঃ অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা।

রাজ্যস্তরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য, জন স্বাস্থ্য কারিগরী, সেচ, জলসম্পদ, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন, অর্থ, সমাজ কল্যাণ, পরিবেশ প্রভৃতি দপ্তরের মিলে মিশে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সহযোগিতায় কাজ করা বেশ উপযোগী।

গ্রাম ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা
(Role of volunteers in Village Lavel)

উদ্দেশ্য ঃ

- জীবন বাঁচানো, সম্পত্তি রক্ষা করা, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করা,
- দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বকীয় প্রতিরোধ,
- শিক্ষা চেতনা বৃদ্ধি ও গ্রাম ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ,
- বিপর্যয় পর্যালোচনা ও সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গঠন।

গ্রাম ভিত্তিক সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা ঃ

গ্রাম ভিত্তিক সম্পদ নথীভুক্তকরণ

গ্রামে কত নৌকা আছে? ক'জন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্স আছে, কটা ওষুধের দোকান আছে ও রাত্রিকালে কী করে ওষুধ পাওয়া যাবে। রাস্তার অবস্থা কী রকম? যানবাহন বলতে লরি, ট্রাক্টর, নৌকা, সাইকেল ও ভ্যান রিক্সা কটা। গ্রামে কটা পাকা বাড়ি আছে এবং গ্রামের মধ্যে উঁচু জায়গা কটা আছে যেগুলি জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা কী আছে? কটা হাসপাতাল, ডিসপেনসারি ও ডাক্তার আছে। ক'জন শিক্ষিত মানুষ আছেন যারা মুখ্য ভূমিকা নিতে পারেন।

গ্রামের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোকাবিলায় যেসব যন্ত্রপাতি লাগে যথা মাটি কাটা, গাছকাটা, ভাঙ্গা বাড়ি সরানোর যন্ত্রপাতি, নৌকা মেরামতি কোথায় হবে, এক্সরে যন্ত্রপাতি, জরুরী জল সরবরাহ ব্যবস্থা, টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও অয়্যারলেস ফোন পরিষেবা পাওয়া যাবে কিনা। ত্রাণ কার্যে ব্যবহৃত জিনিস কোথায় আছে ও তার রক্ষণাবেক্ষণ।

বিদ্যুৎ বা টেলিফোনের তার কোথা দিয়ে গেছে, কী অবস্থায় রয়েছে, তার থেকে সম্ভাব্য বিপর্যয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী হতে পারে তা আগে থেকে তৈরী রাখা।

গ্রামের আশে পাশে কোন নদী বা বাঁধ আছে কিনা, বাঁধের ধারে গাছ লাগান, নদীর পাড় মেরামতি ও বাঁধ থেকে জল ছাড়ার আগে কী ধরনের সতর্ক বার্তা কী ভাবে গ্রামের মানুষকে দেওয়া হবে ও তাতে গ্রামের মানুষের কী করনীয় আছে সে বিষয়ে আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

জরুরী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঃ

গ্রামের মধ্যে জরুরী প্রয়োজন মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম খোলা দরকার। সেখান থেকে সবাইকে সঠিক খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা ও করনীয় কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া। অযথা আতঙ্ক গ্রস্ত না হওয়া বা গুজব না ছড়ান ও গুজবে কান না দেওয়া। অপ্রয়োজনীয় সঞ্চয় করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকা। কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগে থেকে ঠিক করা।

বীমাকরণ সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তা থেকে সুবিধা সম্বন্ধে মানুষকে বোঝান। শস্য বীমা ও জীবনবীমা সম্বন্ধে জানান।

গ্রাম যদি খরাপ্রবণ এলায় হয় তা হলে গ্রামবাসীকে বোঝান, খরা মোকাবিলায় গাছ কাটার কুফল ও গাছ লাগানোর সুবিধা। বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী খরা মোকাবিলার পরিকল্পনা, যেমন জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বনসৃজন, মাছ চাষ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে কোন হাইরোড বা দুর্ঘটনাপ্রবণ রাস্তা আছে কিনা। সকল মানুষকে, বিশেষ করে স্কুলের শিশুদের রাস্তার পারাপার ও বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ জানাতে হবে ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা শেখাতে হবে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রাস্তার হুকিং ও অন্যান্য ভাবে বিদ্যুৎ চুরি প্রতিহত করা উচিত যা একটি সামাজিক অপরাধও বটে।

বিপর্যয় প্রশমিত করা

স্বল্পকালীন ঃ

যখন বিপর্যয় অবশম্ভাবী তখন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া খুবই জরুরী। যেমন ত্রাণ। ত্রাণে বিলম্ব দূর করা, জীবন রক্ষা করা, জরুরী ভিত্তিতে সাধারণ প্রয়োজন যেমন পরিশোধিত জল, খাবার, দুধ, আস্তানা, পোষাক ও মেডিকেল সাহায্য দেওয়া। বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা ঃ

দুর্যোগের ধরন দেখে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে যা এই বইয়ে লেখা আছে, অন্য অধ্যায়ে।

গ্রামের জরুরী প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবী, পঞ্চায়েত ও জনপ্রতিনিধিদের সভা ঃ

গ্রামের প্রয়োজনে NGOs, স্থানীয় ক্লাব, CBOs এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। স্থানীয় গ্রামের মানুষের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব অনস্বীকার্য। তাঁদের কাজে স্থানীয় মানুষের গ্রহণ যোগ্যতা অনেক বেশি। তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব যাতে না থাকে তা গ্রামের মানুষের কাম্য।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

প্রাক বিপর্যয় কালে	বিপর্যয় চলাকালে	বিপর্যয় পরবর্তীকালে
পরিকল্পনা	প্রাথমিক সংকেত গ্রাহ্য করা	পুনর্বাসন/পুনর্নির্মান
প্রশিক্ষণ	স্থান ত্যাগ করা	খাদ্য সংস্থান
মনোভাব গড়ে তোলা	উদ্ধার	বাড়ি তৈরি
ব্যবস্থাপনা	শিবির ব্যবস্থাপনা	রোগ প্রতিরোধী স্বাস্থ্য পরিষেবা
নিয়ন্ত্রণ	স্বাস্থ্য ও সেনিটেশনের ব্যবস্থা	কার্যকর পুষ্টি সংস্থান
পূর্বাভাস	চিকিৎসা শিবির	সংক্রমণ নিবারণ
অত্যাবশ্যক মজুত	তদারকি ও ব্যবস্থাপনা	মহামারি প্রতিরোধ
রক্ষণা বেক্ষণ	সরবরাহ অব্যাহত রাখা	
বিপর্যয় মোকাবিলার মহড়া		

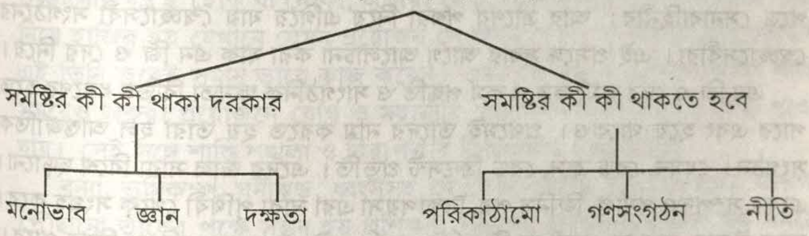
বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও সংহতি প্রকল্প

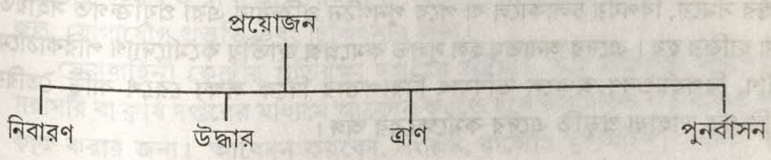
(Disaster Management and Co-ordination project)

গ্রাম স্তরে প্রবণতা চিহ্নিত করণ

- দুর্গতিপ্রবণ গোষ্ঠী
- দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল
- প্রাণীসহ দুর্গতিপ্রবণ সম্পদ
- দুর্যোগপ্রবণ সময়

অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনা





পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই থাকবে কী, কোথায় কখন কীভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান করা যাবে এবং কে, কখন, কী করবেন।

বিপর্যয় মোকাবিলায় অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

(Role & Responsibilities of NGOs & CBOs)

যে কোন বিপর্যয় মোকাবিলা একক কোন সংস্থার পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরি, যে ধরণের বিপর্যয় হোক না কেন তার মোকাবিলায় চাই নানা ধরণের সংস্থার সম্মিলিত বা সমন্বিত প্রচেষ্টা। আমরা এখানে তেমন ধরণের কয়েকটি সংস্থার ভূমিকা আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করেছি। সেগুলি হল বেসরকারি তথা স্বেচ্ছাসেবী, (এন জি ও), তৃণমূল স্তরের সংস্থা বা কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন (সি বি ও) এবং সশস্ত্রবাহিনী বা সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর নামটা আমাদের বারবার শোনা। কারণ যে কোন বিপর্যয় হলে ডাক পড়ে সেনাবাহিনীর। বন্যা কবলিত, ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বা ঘূর্ণীঝড়ে সর্বস্ব হারানো মানুষদের উদ্ধারে সবার আগে ডাক পড়ে সেনাবাহিনীর। আর ত্রাণের পশরা নিয়ে এগিয়ে যায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা। এই প্রসঙ্গে সবার আগে আলোচনা করা যাক এন জি ও দের নিয়ে।

এন জি ও দের কর্মক্ষেত্র ও কর্ম পদ্ধতি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে এবং হয়ে থাকেও। প্রথমেই তাদের নাম করতে হয় তারা হল আন্তর্জাতিক সংগঠন। যেমন, রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট প্রভৃতি। এদের জাল সারা বিশ্বে ছড়ানো। এদের সম্পদও পর্যাপ্ত, জিনিস পত্র, টাকাপয়সা এরা সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করে। ফলে উদ্ধার, ত্রাণ বা পুনর্বাসন বিপর্যয়ের সর্বস্তরেই এরা হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।

আর এক ধরণের এন জি ও আছে যারা উন্নয়ণ প্রচার, প্রসার ও তদারকীতে দক্ষ। শান্তির সময়ে, বিপর্যয় চলাকালে বা পরে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় এরা প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে হাজির হয়। এদের অন্যতম হল সুলভ কমপ্লেক্স জাতীয় কর্মোদ্যোগ পরিকাঠামো নির্মাণ, বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চলে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে বাড়ি তৈরির প্রযুক্তিগত সাহায্য প্রভৃতি এদের কর্মক্ষেত্রের অঙ্গ।

সি বি ও (CBO) ঃ

সি বি ও (CBO) এর পুরোনাম হল কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন একেবারে তৃণমূল স্তরে স্থানীয় অধিবাসীদের এই ধরণের সংস্থা সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে সবার আগে পৌঁছে যায়। এরকম সংস্থা ও মানুষের খুব কাছেই থাকে বলে প্রকৃতপক্ষেই এরা বেশি সুবিধা পায়। আর মানুষ পায় বিশ্বস্ত বন্ধু। এই ধরণের সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের সংস্থা, স্থানীয় ক্লাব, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি।

এন জি ও বা সি বি ওর কাজের ধরণ ঃ

বেসরকারি সংগঠন (এন জি ও) এবং সিবিও গুলির প্রধান ভূমিকা হল সরকার ও স্থানীয় মানুষের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে দুর্গত মানুষের উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা। বিপর্যয়ের তিন পর্যায়েই এদের করনীয় থাকে এবং এরা তা করে।

প্রাক্ বিপর্যয় ঃ সচেতনতা বাড়ানো ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রচার, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ, এবং পরিকল্পনা তৈরি করা।

বিপর্যয় কালে ঃ দ্রুত উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্য, জল ওষুধের যোগান দেওয়া, সেনিটেশন ও জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।

বিপর্যয়ের পরে ঃ পুনর্গঠনে কারিগরি বিদ্যা ও সরঞ্জাম সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা এবং সব কাজের তদারকি করা।

সেনাবাহিনীর ভূমিকা (Role of Armed Forces) ঃ

আমরা হামেশাই দেখি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বিধ্বংসী আগুন বা অন্য যে কোন ধরণের বিপর্যয়ের একটু বাড়াবাড়ি হলেই ডাক পড়ে সেনাদের। তারা আগুন নেভানোর যন্ত্র ই হোক বা নৌকা, অস্থায়ী সেতু, হেলিকপ্টারও নানা ধরণের সামগ্রী নিয়ে হাজির হয় যেখানে যেমন প্রয়োজন সে অনুসারে। এঁরা উদ্ধার, ত্রাণ পুনর্বাসন এই তিনি স্তরেই সমান ভাবে কাজ করেন। এমন কি যুদ্ধ না থাকলে অর্থাৎ শান্তির সময়েও জরুরী প্রয়োজনে রোগ ও মহামারি মোকাবিলাকেও তাঁদের দেখা পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও পাওয়া যায়।

বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্নীঝড়, ধ্বংসসহ যে কোন ধরণের বিপর্যয়ে দুর্গম জায়গায় পৌঁছানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম, পেশাদায়িত্ব এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে লেগে পড়ার ক্ষমতার জন্য. মূলত এঁদের ডাকা হয় উদ্ধার, অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ অব্যাহত রাখা ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছানো, অত্যাবশ্যক পরিষেবা, যেমন বিদ্যুৎ, জল, যোগাযোগ প্রভৃতি এবং চিকিৎসার জন্য।

সেনাবাহিনী কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীন। তাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে সরাসরি বা কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে অসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যে কাজ করার জন্য। আবেদন করবেন, সংশ্লিষ্ট, রাজ্যের মুখ্যসচিব। জরুরী অবস্থায় স্থানীয়ভাবে সামরিক সহায়তার জন্য জেলাশাসকও আবেদন করতে পারেন। তবে, তা মুখ্যসচিবের অনুমোদন নিতে হবে।

প্রচার ও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা (Role of Media) ঃ

সব কর্মসূচি বা প্রকল্পের প্রচার দরকার। একদিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে নির্দিষ্ট কাজের জন্য। বিপর্যয় মোকাবিলা, ত্রাণ, পুনর্বাসন এ সব কাজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সঠিক প্রচার দরকার। তাছাড়া যে বিষয়ে প্রস্তুতি নেবার জন্য অর্থবৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শান্তির সময় বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে তা আছড়ে পড়ার আগেই প্রস্তুতি নেবার জন্য প্রচার দরকার। অন্যদিকে মানুষকে কোথায়, কী, কখন ও কেন কাজ হচ্ছে তা জানানো দরকার নতুন নতুন লোককে সংশ্লিষ্ট কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এই কাজে নানা পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে বিষয়টি প্রচার করা। এজন্য

সভা, বৈঠক, পথ প্রচার, ইস্তাহার বা প্রচারপত্র, পথনাটিকা, প্রদর্শনী, মেলা, বই প্রকাশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ আজকাল সংবাদপত্র, সংবাদ মাধ্যমে, বেতার (আকাশবানী) ও টেলিভিশন (দূরদর্শন) প্রভৃতি মাধ্যমে প্রচার জন মানসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কারুর কারুর মনে এই ধারণা রয়েছে যে রেডিও ও টিভিতে প্রচার হলেই সব মিটে গেল। এটা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, এগুলি শোনা ও দেখার ব্যাপার। কিছুক্ষণ পরে তা মনে নাও থাকতে পারে। সেদিক থেকে ছাপা মাধ্যম তথা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও ইস্তাহারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি ছাপার অক্ষরে চোখের সামনে থাকে বলে সব সময় বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়। পড়তে পারা লোকদের কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি টিভি, রেডিও এবং সংবাদপত্র সব ধরণের মাধ্যমেই প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেই সঙ্গে আজকাল বিনোদনের অঙ্গ হিসাবেও ভিডিও বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়। এজন্য বিশেষ ধরণের ভিডিও তৈরি করে গ্রামে বা বস্তিতে দেখানো যেতে পারে। গান, নাটক, যাত্রাপালা ও ভিডিও মাধ্যমে দেখানো যায়। যে সব লোক লেখাপড়া তেমন জানেন না তারাও এতে বিনোদনের সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন।

বিশেষ করে দুর্গত অবস্থায় যখন মানুষ ত্রাণ শিবিরে থাকতে বাধ্য হয় তখন এর গুরুত্ব বেশি বেড়ে যায়।

বিপর্যয় মোকাবিলায় গণ সংগঠনের ভূমিকা

বিপর্যয় মোকাবিলায় সবচেয়ে আগে দরকার আত্ম-বিশ্বাস। বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবার মানসিকতা। মরার আগে মরব না, এই পণ। এই আত্ম-বিশ্বাস অর্জনের জন্যে চাই বিপর্যয় সম্বন্ধে জ্ঞান। কি ধরণের বিপর্যয় হতেপারে কোথায় কোথায় এর সম্ভাবনা বেশী, এতে কী কী বস্তু, প্রাণী, জীব জন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কী করলে এর থেকে অন্ততঃ কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যায় ইত্যাদি জানা দরকার। এর সঙ্গে আপ্তবাক্য— 'তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যং যাবৎ ভয়মনা গতং। আগতন্তু ভয়; বীক্ষ প্রতিকুর্যাৎ যথোচিতম্। অর্থাৎ বিপদ এসে পড়লে তার প্রতিকার যথোচিত ভাবেই করতে হবে।

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে বিপর্যয়, তা প্রাকৃতিক অথবা মানুষের সৃষ্ট যাই হোক না কেন এর পেছনে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির খেলা নাই। কোন দেবতার রোষ বা সাধারণ মানুষের পাপে বিপর্যয় হয় না। মহাত্মা গান্ধী যখন অস্পৃষ্যতার কারণে বিহারের মর্মন্তুদ ভূমিকম্প হয়েছে বলে বলেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে সত্যের কারণেই তার প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। প্রচলিত অর্থে, পাপ নয়, প্রাক্তন প্রারব্ধ কর্মফলও নয়। মানুষের লোভ তার শক্তির এবং অর্জিত জ্ঞানের অপব্যবহার, অসতর্কতা, অজ্ঞতা এবং নিষ্ক্রিয়তা নানা ধরণের বিপত্তি, দুর্ঘটনা এবং বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

নির্মোহ হয়ে, মানব জাতির মঙ্গল সাধনা করলে মানুষের তৈরী বিপর্যয় হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক উন্নয়ন, মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়ের পরিপন্থী। পারমাণবিক বিস্ফোরণ, জৈবিক ও রাসায়নিক যুদ্ধের প্রস্তুতি, একটি জাতি বা ধর্মীয় মতবাদের মানুষ অন্য জাতি বা দেশের বিরুদ্ধে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলেই কোন না কোন ভাবে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। এর প্রতিরোধ মানুষের জাগ্রত শুভ বুদ্ধিই করতে পারে। সতর্কতা এবং সচেতনতা সত্বেও দুর্যোগ ঘটতে পারে। তার মোকাবিলা কিভাবে করা হবে এই নিবন্ধের সেটিই প্রতিপাদ্য।

ভারতবর্ষে একটি বহু মাত্রিক দেশ। জাতীয় সরকার পরিচালিত হয়, একটি যুক্ত রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর মাধ্যমে। এখানে বিভিন্ন রাজ্যেরও নিজস্ব পরিকাঠামো এবং কর্মসূচি আছে। অবশ্যই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। সুতরাং যেমন জাতীয় স্তরে তেমনি রাজ্য স্তরেও বিপর্যয়ে, প্রতিরোধ ও আপৎকালীন ব্যবস্থার চিন্তা কর্মসুচি এবং পরিকাঠামো থাকা উচিৎ এবং আছেও।

বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় কী শহর বা কী গ্রামের গরীব মানুষেরা। সাধারণ মানুষেরা। তাদের ক্ষতির পরিমাণ দ্রব্যমূল্যে অল্প হলেও আণুপাতিক ভাবে সেই স্বল্প ক্ষতিই ঐ সাধারণ মানুষগুলির পক্ষে অসাধারণ। জাতীয় বা রাজ্যস্তরে এই প্রতিরোধ প্রতিকারের ব্যবস্থা কী আছে তা বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষই জানেন না। এই জানানোর প্রচেষ্টাই সমাজ সেবী কর্মীদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

আমাদের দেশ দুশ বছরের মতো ইংরাজদের শাসনে ছিল তার আগেও যারা দেশ শাসন করেছে তাদের সঙ্গেও সাধারণ মানুষের খুব একটা সুসম্পর্ক ছিল তা হয়ত বলা যাবে না। কিন্তু ইংরেজ আমলে সাধারণ মানুষদের নিজস্ব উদ্যোগ একে বারেই নষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের অর্দ্ধ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও তার যথাযথ পুনরুদ্ধার হয় নি। যদিও পঞ্চায়েত ও নগর পালিকার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

রাজশক্তি বা শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে এই চিন্তা ও কর্মসূচনার ফারাকের জন্যই সমস্ত উন্নয়নের কাজ উপর থেকেই পরিকল্পিত ও রূপায়িত হয়েছে। যাদের জন্যে এবং যে জন্যে এই সব পরিকল্পনা তারা কিন্তু এ বিষয়ে অন্ধকারেই থেকে গেছে। পরিকল্পনাকারীরা এবং সরকার, সাধারণ মানুষকে তাদের কী কী সুবিধা হবে, কী লাভ হবে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছে। আসলে কাজের কাজ কিন্তু সামান্যই হয়েছে। এবং সরকাররেরই সব কিছু করে দেওয়ার দায়িত্ব, এই মানসিকতা জগদ্দল পাথরের মত মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

অন্য সব প্রকল্পের মত বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং মোকাবিলা করার জন্যে যা কিছু করা হয়েছে তাও এই দোষেই দুষ্ট।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে বিপর্যয়, মোকাবিলার প্রাথমিক সর্ত আত্ম-বিশ্বাস। এই আত্ম-বিশ্বাস আসে বিষয়টি সম্বন্ধে এবং তার নিবারণ সম্বন্ধে জ্ঞান থেকে, তাৎক্ষণিক এবং দূর প্রসারী কার্য কলাপের জন্য সাম্ভাব্য সামর্থ নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে এইগুলি রূপায়ণের জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা কার্যকরী সম্ভাবনা আছে।

এখানের মানুষেরা দীর্ঘ দিন ধরে নানারকম সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন করে এসেছে।

এ রাজ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গণ সংগঠন আছে। বিশেষ করে শ্রমিক কৃষক, মহিলা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, চিকিৎসক এবং যুবকদের সংগঠন এতাবৎ নানাবিধ সামাজিক কাজে গঠন মূলক ভূমিকা নিয়ে এসেছে। এই সংগঠনগুলির নেতৃস্থানীয় মানুষেরাই জনমত গঠন করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনার এরাই অগ্রণী আকরিক। বিপর্যয় মোকাবিলায় জন্যে সরকারী প্রকল্পগুলির পূর্ণ তথ্য এদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে প্রাথমিক কাজ। লিখিতভাবে, প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছোট ছোট দলে ভাগ করে তথ্যগুলি পর্যায়ক্রমে এঁদের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। একবার নয় অনেকবার। রাজ্যের এবং কেন্দ্রের এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য এবং কর্তব্যের তালিকা আছে। এই মূল্যবান পুস্তকটিও তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গে, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর এবং তাদের সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের আর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তা হচ্ছে আমাদের পঞ্চায়েতী রাজ এবং নগর পালিকা। একথা স্বীকার করতেই হবে যে স্বাধীনতার পরেও জনসাধারণ এবং সরকারের মধ্যে দূরত্ব আশানুরূপ ভাবে কমে নি। ঔপনিবেশিক চিন্তায় সাধারণ মানুষ এখনো সরকারকে প্রতিপক্ষই মনে করে। সরকারী কর্মচারীরা

যে আমাদেরই লোক, সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প দরিদ্রতম ও সাধারণ মানুষেরও অনুদানে নির্মিত এবং পরিচালিত; এই বোধ সাধারণ মানুষ এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও নেই। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু অবস্থাটা নির্মম ভাবে সত্য। বৃটিশ সরকার সৃষ্ট পরিশাসন পরিকাঠামোর সঙ্গে জন প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সমন্বয় ও সমীকরণের প্রচেষ্টা পঞ্চায়েত এবং নগরপালিকা। এই স্বায়ত্তশাসন পরিকাঠামো সংবিধান সম্মত। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চমস্তর পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদ এখন গ্রামের সমস্ত মানুষের কাছে সুযোগ এনে দিয়েছে তাদের নিজ মত বলার এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার। তেমনি শহর অঞ্চলে ওয়ার্ড কমিটি এবং তার নীচে বুথ কমিটিগুলি সক্রিয় হলে শহরের মানুষেরা বিশেষ করে নিচের তলার গরীব মানুষেরা তাদের কথা বলার সুযোগ পাবে। এই সংস্থাগুলি যদি লাগাতার পাড়া ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সকলের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে আনতে পারে তা হলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

এই প্রাথমিক চেতনা প্রসার পর্বের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ বিপর্যয়ের প্রকরণ এবং তজ্জনিত ক্ষয় ক্ষতির হিসাব পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে রাখতে হবে। কোন কোন অঞ্চলে কী ধরণের বিপর্যয় হতে পারে তার বিবরণ সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য রাখতে হবে।

বিপর্যয়ের প্রথম স্তর হচ্ছে সম্ভাবনার সঙ্কেত। সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই যাতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় যা পূর্বেই চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, তাকে যাতে ঠিক মত ব্যবহার করা যায় তা সুনিশ্চিত করা। মানুষ ও প্রাণীকে স্থানান্তরিত করার জন্য যানবাহন এবং স্বেচ্ছা সেবকদের সুশৃঙ্খলিত ব্যবহার করা।

দুর্ঘটনা ঘটলে, উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও সরঞ্জাম মজুত রাখা ও তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

স্থানান্তরিত হবার পর তাদের বাস, খাদ্য, পানীয় এবং স্যানিটেশন-এর ব্যবস্থা মজুত করা। স্থানান্তরিত দুর্গত মানুষেরা বিশেষ করে মহিলারা যাতে সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের খপ্পরে না পড়ে সে বিষয়ে সচেতন থাকা।

প্রশাসন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতামূলক যোগাযোগের ব্যবস্থা ঠিক রাখা। সরকারী এবং বে-সরকারী সাহায্য যাতে যথাযথ স্থানে পৌঁছুতে পারে তার ব্যবস্থা নির্ধারিত করে অন্যান্য আরো আনুসঙ্গিক বিষয় যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠকরা বুঝেছেন, এবং বিপর্যয়ের ধরণ এবং প্রচন্ডতা ভিত্তিক বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব প্রস্তুত করে রাখা।

এই সব বিষয় প্রাথমিক ভাবে নির্ধারিত করে কিছু অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী মানুষ নিয়ে গ্রুপ তৈরী করা এবং তাদের বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এই প্রশিক্ষণ তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দুই রকমই হবে।

এই প্রশিক্ষণ গ্রাম সংসদ/বুথ ভিত্তিক থেকে পর্য্যায় ক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি ওয়ার্ড এবং জিলা অথবা কর্পোরেশন/মিউনিসিপালিটি স্তর পর্য্যন্ত হবে।

কেন্দ্র স্তরে একটি ছোট দপ্তর থাকবে তার পরে পঞ্চায়েত সমিতি পর্যন্ত একটি

ছায়া পরিকাঠামো থাকবে। এই পরিকাঠামোগুলি স্থিতাবস্থা চলাকালীন নিচের বৃত্তের কর্মী ও স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবেন। যাতে বিপর্যয়ের সময়ে তাদের তড়িঘড়ি কাজে লাগানো যায়।

গ্রাম বাংলা একটা চলতি সতর্ক বাণী আছে। বিপর্যয়ে যেমন রিলিফ আছে তেমনি রিলিফ শিকারীরাও আছে। সমস্ত বিষয়টি সাধারণ্যে প্রকাশ্য থাকলে ঠকবাজরা মানুষকে ঠকাতে পারবে না।

এইভাবে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করলে বিপর্য্যয়ে মোকাবিলা করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায় ঃ

১) মানুষের তৈরী বিপর্যয়কে রোধ করা যায়। এর জন্যে চাই সমস্ত মানুষের চেতনা এবং অপকর্মগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবী ও সমাজ কর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এই কাজে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং তাদের শাখা সংগঠন গুলিকে সামিল করতে হবে।

২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ পুরোপুরি নিবারণ করা এখনি সম্ভব নয়। কিন্তু সময়মত পূর্বসংকেত পেলে এবং তাকে সময়মত মানুষদের কাছে পৌঁছে দিলে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশেই কমানো যাবে।

৩) বিপর্যয়ের পরে এবং সময়ে সরকার এবং সব রকমের বেসরকারী স্বেচ্ছা সেবী প্রতিষ্ঠানদের নিয়ে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের যে সম্পদ আছে তা AppropriateTechnology দিয়ে ব্যবহার করলে, আত্মমর্যাদা এবং আত্মনির্ভরতা বাড়বে।

৪) সুদূর প্রসারী কার্যকলাপ (Long Term Projects) আমাদের সামর্থ অনুযায়ী পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ করতে হবে।

৫) এই সমগ্র বিষয়টিই আমাদের মানব মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

সৌজন্যে ঃ ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

সঠিক ভাবে ত্রাণ পরিচালন করার জন্য এ সব প্রয়োজন ঃ

(১) আগের থেকেই ইচ্ছুক কর্মী/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের একটা তালিকা তৈরী রাখুন।

(২) প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁদের ডাকুন, দরকার পড়লে অল্প সময়ের ব্যবধানে

(৩) তাঁদেরকে নিয়ে বসুন। উদ্দেশ্য এবং করনীয় বুঝিয়ে বলুন।

(৪) কী করতে হবে তার একটা তালিকা (Instruction Sheet) তৈরী করে তাঁদের দিন।

(৫) Instruction Sheet তৈরী করুন প্রাঞ্জল ভাবে। কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, পুরো কাজের খতিয়ান (details of operations)। কী পরিস্থিতিতে মোটামুটি কতদিন তাদের কাজ করতে হবে, পারিশ্রমিক পাবে কিনা যা আগের থেকে বলুন।

(৬) প্রয়োজনীয় কিট ব্যাগ/বাক্স তৈরী করে বিলি করুন।

বিপর্যয় মোকাবিলায় ইমারজেন্সি কিট ব্যাগে এগুলি থাকা প্রয়োজন ঃ

(১) পিঠে বওয়ার বড় ব্যাগ
(২) বর্ষাতি
(৩) বড় টর্চ লাইট এবং ব্যাটারী
(৪) হাওয়া বালিশ
(৫) তোয়ালে / গামছা
(৬) সাবান
(৭) মোমবাতি
(৮) দেশলাই / লাইটার
(৯) বড় এবং ছোট খাম
(১০) ডায়েরি
(১১) সাদা কাগজ
(১২) লাল / নীল বল পেন
(১৩) পেনসিল, রবার, শার্পনার
(১৪) ষ্টেপলার / ষ্টেপলার পিন
(১৫) ষ্ট্যাম্প / প্যাড
(১৬) সব কাজে লাগে এমন ছুরি
(১৭) গন্তব্য স্থানের ম্যাপ
(১৮) কী করতে হবে তার পরিকল্পনা
(১৯) নাইলনের দড়ি
(২০) বড় গুন ছুঁচ
(২১) সার্ভে ফর্ম
(২২) মাষ্টার রোল
(২৩) ORS
(২৪) মশারি
(২৫) চাদর

এ ছাড়াও এগুলির যোগাড় রাখা উচিত

(১) ক্যামেরা ফিল্ম, ব্যাটারি
(২) বাইনুকুলার
(৩) রেডিও ও ব্যাটারী
(৪) হাতে ব্যবহৃত মাইক এবং ব্যাটারী
(৫) থার্মোফ্লাস্ক
(৬) পেট্রোম্যাক্স
(৭) লাইফ—জ্যাকেট

(Source : Disaster Management Hand book I, Bangladesh)

জৈব বিপর্যয়
(Biological Disaster)

জীবজগতে প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীবনকে ধারণ করে রয়েছে। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নানা ধরণের। কোথাও খাদ্য-খাদক, আবার কোথাও বা ভারসাম্য রক্ষায় একে অপরের পরিপূরক বা সহায়ক। তারই মধ্যে এমন সব অতি ক্ষুদ্র প্রাণ রয়েছে যারা দীর্ঘস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী বিপর্যয় ডেকে আনে। এই বিপর্যয়কে জৈব বিপর্যয় বলা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা দেখা দেয় মানুষের জীবনহানিকর রোগ হিসাবে।

পরিবেশ, আবহাওয়া, মানুষের জীবনযাত্রা ভেদে সেইসব রোগ জীবাণুর আক্রমনের তীব্রতা বাড়ে কমে। আবার মানুষের উদ্যোগেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যেমন গুটিবসন্ত বা Small Pox। একদিন সারা পৃথিবী জুড়ে এই রোগের দাপটে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সেই আক্রমণ থেকে আমাদের দেশ ও রেহাই পায়নি। এর নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুলীকরণ সম্ভব হয়েছে কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায়। তেমনি ভাবেই এখন চলছে পোলিও মাইলাইটিসের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী জুড়ে অভিযান। এখনই বহু দেশ থেকে ঐ রোগ নির্মূল হয়ে গেছে। তবে আমাদের দেশ এখনও সেই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাই, এখন চলছে ঐ ভাইরাস ঘটিত রোগটির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান। এই অভিযানেরই অঙ্গ হল "পালস পোলিও টিকা করণ।" আশা করা যায় অচিরেই গুটি বসন্তের মত পোলিও রোগের ভাইরাসও স্থান পাবে গবেষণাগারের ঠান্ডা বাক্সে।

আবার বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে চিহ্নিত হয়েছে আর একটি নতুন ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই রোগটি এতই মারাত্মক রূপে রয়েছে যে, এর চিকিৎসা বা টিকা কোনটাই এখন পর্যন্ত মানুষের হাতে আসেনি। অথচ গত ১৬ বছরে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে গুণিতক হারে। মাত্র ১৬ বছরে এইচ আই ভি ভাইরাস ও তার রোগ এইডস মানুষকে কাবু করে ফেলেছে, তেমনি মানুষ অন্যদিকে আতঙ্কে জবুথুবু না হয়ে রোগের প্রধান দাওয়াই সচেতনতা ও সাবধানতার কথা জনে জনে প্রচার করতে শুরু করেছে। এখানেই নিহিত রয়েছে রোগটির মরণকাঠি। আশাকরা যায় এ হেন জৈব বিপর্যয়কেও বশে আনা যাবে।

এই অধ্যায়ে তেমনি কয়েকটি মারাত্মক সংক্রামকরোগ তথা জৈব বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কীটপতঙ্গের আক্রমন (Insects)

কীট পতঙ্গ, রোগ, বন্য প্রাণী প্রভৃতির আক্রমণে যারা পৃথিবীতে খাদ্যশস্যের ৩৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। কীট নাশকসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেবার পরেও ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কীট-পতঙ্গ ও উইপোকার জন্যই ক্ষতি হয় সব থেকে বেশি। তার পরে বন্যপ্রাণী ও পাখি। পশ্চিমবঙ্গে ইঁদুর ও হাতির জন্য ক্ষতি অবশ্য এর মধ্যেই পড়ে।

কীট সংক্রমণের কারণ

কীট-পতঙ্গের আক্রমণ বা সংক্রমণের প্রধান কারণ হল প্রাকৃতিক ভারসাম্য তথা বস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া।

তাপমাত্রা ঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটলে কীট-পতঙ্গের হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে। যেমন শীতের সময় গরম লাগা, বর্ষায় বৃষ্টি কম হওয়া বা গরমের সময় তাপমাত্রা কমে যাওয়া প্রভৃতি।

একই ফসল বার বার চাষ ঃ একই ফসল তথা একই প্রকার বীজ থেকে চাষ করলে তা কীট প্রতিরোধী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিপরীত ক্রমে একথা বলা যায় যে, কীট-পতঙ্গ সেই ফসল আক্রমণের ক্ষমতা অর্জন করে।

নতুন পরিবেশে ঃ নতুন জায়গায় বা নতুন পরিবেশে কোন নতুন ধরণের ফসলের চাষ করা হলে তা কীট-পতঙ্গের সহজ আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে।

আবহাওয়ার ধরণ ঃ হাওয়ায় গতি বদল বা আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্যই পঙ্গপালের মত পতঙ্গের আক্রমণ ঘটে। ওরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই নতুন জায়গায় এসে হাজির হয়।

স্থান বদল (যাযাবর বৃত্তি) ঃ কীট-পতঙ্গেরা সব সময়ই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় এক জায়গা থেকে নতুন জায়গায় চলে যায়। ফলে, সেই নতুন জায়গা আক্রান্ত হয়।

কীভাবে ক্ষতি করে

কীট-পতঙ্গের হাতে ফসলের ক্ষতি বলতে বোঝায়—ফসল তোলার আগেই গাছ খেয়ে বা কেটে নষ্ট করা। তাছাড়া কামড়ে নষ্ট করা বা অন্য যেভাবে ক্ষতি করে তা হল ঃ

- গাছের পাতা খেয়ে ফেলে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া নষ্ট করে করে দেওয়া।
- গাছের কান্ড ফুটো করে বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া।
- কুঁড়িগুলি খেয়ে গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করা।
- ফলগুলি অকালে কেটে ফেলে দেওয়া।
- ফুল কেটে বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া নষ্ট করা।
- আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বীজ নষ্ট করা।
- গাছের মূল আক্রমণ করে জল ও পুষ্টি যোগান বন্ধ করা।
- সংরক্ষিত দানাশস্য ফুটো করে খেয়ে নেওয়া।
- গাছের মধ্যে ফুটো করে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া। ফুটো করার ফলে তার মধ্যে ছত্রাক সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া।
- পাতার উপরের দিকের অংশ ফুটো ফুটো করে দেবার ফলে সালোক-সংশ্লেষন কমিয়ে দেওয়া।

সারা দেশেই কীট সংক্রমণে ফসল নষ্ট হবার ক্ষেত্র রয়েছে। তার মধ্যে রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক ও মহারাষ্ট্র পঙ্গপালপ্রবণ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত।

রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানার রাজ্যে ২ লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চলে মরুভূমি রয়েছে। এর কোন না কোন অংশ পঙ্গপালপ্রবণ। অর্থাৎ সেখানে পঙ্গপাল বংশ বিস্তার করার

সুযোগ পায়। এছাড়া আফ্রিকার (পশ্চিম) মরু অঞ্চল থেকেও ভারতে পঙ্গপাল আসতে পারে। ১৯২৬ থেকে ১৯৪১, ১৯৪৬, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩, ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ এবং ১৯৯৩ সালে পঙ্গপাল ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। ১৯৯৩ সালে মোট ১৭২ ঝাক পঙ্গপাল আক্রমণ করেছিল। এতে বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়েছে।

ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধ বা ধ্বংস করতে হলে আগে চাই তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান ও তথ্য। প্রথমেই জানা দরকার এদের সুতিকাগার, বংশ বৃদ্ধির ধরণ ও তার ঘনত্ব। প্রাকৃতিক অবস্থা জানা, ফসলের ক্ষতি ও কীট নিয়ন্ত্রণে ব্যয় হারের বিচার। পরে চিহ্নিত করতে হবে কীটের জাত বা পরিচিতি। তার পরে কীট ধ্বংস করার পরিকল্পনা এবং তা কার্যকরী করা।

কৃষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ ঃ এর মধ্যে প্রথমেই কৃষকদের সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি। কীট-পতঙ্গের চরিত্র অনুসারে মাটির গভীর পর্যন্ত চাষ করা। কীট প্রতিরোধী জাতের ফসল চাষ, ফসলের প্রজাতি ও ধরণ বদল করা প্রভৃতি।

দৈহিক পদ্ধতি ঃ গাছ থেকে কীট বেছে ফেলে দেওয়া, পোকা মাটিতে পুতে দেওয়া, ফল জলে বা থলে দিয়ে ঢেকে দেওয়া প্রভৃতি।

জৈব পদ্ধতি ঃ এতে বোঝায় জীবিত প্রাণীর সাহায্যে কীট নিধন। শিকারী পাখি, ব্যাঙ, মাকড়সা, অন্য পোকা প্রভৃতিকে পোকা শিকারের সুযোগ করে দেওয়া, অর্থাৎ বন্ধু পাখি ও পোকা লালন পালন।

রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে দ্রুত ফল পাওয়া যায় এবং তা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরণের। যথা তাড়ানো, ধোঁয়া, বিষ খাওয়ানো প্রভৃতি।

বিশেষ প্রস্তুতি ঃ কীট-পতঙ্গ নিধনে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা দরকার। সেই জাতীয় কীট নিধন নীতিকে থাকা দরকার ঃ

— গাছ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম আমদানি ও রপ্তানি বিধি প্রণয়ন।
— কীট ও ক্ষতির সম্ভাব্যতার পূর্বাভাস।
— আন্তর্জাতিক কীট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, যাতে থাকবে নিয়ন্ত্রণ, বিশাল অঞ্চল জুড়ে ব্যবস্থা নেওয়া এবং কৃষকদের আয়ত্বাধীন নয় এমন সুবিধা ও সম্পদের যোগান দেওয়া প্রভৃতি।
— কৃষকদের কীট সম্পর্কে তথ্যের যোগান ও সরবরাহ বজায় রাখা।
— দেশের কর্মীদের সর্বাধুনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও আবিষ্কার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখার ব্যবস্থা।

কীট-পতঙ্গের আক্রমণ জনিত বিপর্যয়ের পরের প্রয়োজন ঃ

কোন অঞ্চল কীট-পতঙ্গের আক্রমনে বিপর্যস্ত হবার পরে সেখানে অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হবার জন্য কৃষকদের সাহায্য করা এবং প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে বীমাকরণের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পূরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর চাষ করার জন্য মাটি পরীক্ষা করে নিতে হবে।

সূত্র ঃ ভারত সরকারের কৃষি দপ্তর

ম্যালেরিয়া মারাত্মক হতে পারে

(Malaria can be fatal)

সুদূর অতীত কাল থেকেই ম্যালেরিয়া এক মারণ ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত। খারাপ আবহাওয়া বা 'ম্যাল-এয়ার'-এর জন্য ঐ জ্বর হয় বলে ধারণা ছিল। তা থেকেই নাম হয়ে যায় ম্যালেরিয়া। ১৮২৮ সালে এক ফরাসী বিজ্ঞানী-এর পরজীবী চিহ্নিত করেন। অনেকদিন ধরেই বিশেষ ধরণের জ্বরে (ম্যালেরিয়া) সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে তৈরি ভেষজ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যাচ্ছিল। অবশেষে ডাঃ এডোয়ার্ড কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে প্রমাণ করেন যে সিঙ্কোনা থেকে তৈরি কুইনিনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ওষুধ। আজও সেই কুইনিন তথা ক্লোরোকুইনিন ম্যালেরিয়ার প্রধান ওষুধ। তবে সঠিক মাত্রায় না খেলে রোগ জীবাণু ওযুধে সহনশীল (রেজিস্ট্যান্ট) হয়ে পড়ে। এখন ম্যালেরিয়ার কয়েকটি বিভাগ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে প্ল্যাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম গোষ্ঠীর পরজীবি খুবই মারাত্মক। এই জীবাণু মানুষের মস্তিষ্ক আক্রমন করে। এর পরিচিত নাম ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ঠিক সময়ে, সঠিকভাবে চিকিৎসা না হলে রোগী মারা যায়।

এ্যানোফেলিস গোষ্ঠীর স্ত্রী মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রমণ করে। ১৮৯৭ সালে কলকাতার পি জি হাসপাতালের অতিসাধারণ গবেষণাগারে ডাঃ রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া পরজীবী সংক্রমণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কোন ম্যালেরিয়া রোগীকে ঐ মশা কামড়ালে (রোগ লক্ষণ না থাকলেও যে কেউ ঐ জীবাণু বাহক হতে পারেন) রক্তের সঙ্গে জীবাণু মশার শরীরে যায়। সেখানে জীবাণু পরিবর্তিত অবস্থায় বংশ বিস্তার করে এবং সেই মশা অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে জীবাণু ঐ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে এবং রোগ জীবাণু শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। সেখানে জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। সাধারণ ম্যালেরিয়ায়, জ্বর প্রধানত আসে কাঁপুনী দিয়ে এবং ছাড়ে ঘাম দিয়ে। অন্য অনেক ধরণের জ্বরের সঙ্গে এর মিল থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। ওযুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়ার লক্ষণ নানা ধরণের হতে পারে। একমাত্র রক্তপরীক্ষা করেই রোগ জীবাণু চিহ্নিত করা যায়। অনেক সময় এই জন্য একাধিকবার রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। রোগ চিহ্নিত হলে ডাক্তারের ব্যবস্থা মত ওযুধ খেতে হবে।

এই মশার জন্মও বংশবিস্তার ঘটে পরিষ্কার, বদ্ধ জলে। যে কোন পাত্র বা বাড়ি তৈরির সময় তৈরি জলাধারে এরা ভালভাবে বংশবিস্তার করতে পারে এবং ম্যালেরিয়া জীবাণু বহনকারী মশা কামড়াতে তাই যে কোন সময়েই মশার বংশবিস্তার রোধে জমা জল অবশ্যই নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। মশার কামড়ানো বন্ধে মশারী ব্যবহার এবং মশা তাড়ানো বা মশা মারবার ওযুধ ব্যবহার করতে হবে।

অন্য প্রধান বিষয় হল জ্বর হলে কাছের সরকারি হাসপাতাল বা পুরসভার চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে রক্তপরীক্ষা করানো ও ডাক্তারের ব্যবস্থামত ওযুধ খাওয়া।

ডেঙ্গুজ্বর
(Dengue fever)

ডেঙ্গু একটি ভাইরাস ঘটিত কঠিন জ্বর। এই জ্বর ইডিস ইজিপ্টাই নামক এক প্রকার মশার দ্বারা সংক্রামিত হয়ে থাকে।

ডেঙ্গু জ্বর দু'প্রকার ঃ সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর ও রক্তক্ষরণকারী ডেঙ্গুজ্বর। রক্তক্ষরণকারী ডেঙ্গুজ্বর দ্রুত মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। শিশু, পর্যটক ও যাত্রীরা সাধারণ ভাবে এই জ্বরে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

জ্বরের উপসর্গ ঃ

১। আকস্মিক তীব্রজ্বর, মাথাব্যথা, চোখের পিছনে, পেশিতে ও জোড়ে (সংযোগ স্থলে) তীব্র ব্যথা।

২। খাদ্যে অরুচি, স্বাদ হ্রাস।

৩। গা গুলানো বমিভাব, বুকে ও বাহুতে হামের মত গুটি।

৪। নাক, মুখ ও মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ, ত্বক ফেটে রক্ত পড়া।

৫। শ্বাসকষ্ট

এর কোন ওষুধ নেই। তাই রোগ নির্ণয়ের আগেই ২০ ভাগ রোগী মারা যায়।

কিভাবে ছড়ায় ঃ স্ত্রী জাতির এডিস মশা কোন রোগীকে কামড়ালে রোগীর রক্তের সঙ্গে জীবাণু মশার শরীরে যায় এবং সে মশা কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার ডেঙ্গুজ্বর হবে। এই মশা দিনের বেলায় কামড়ায়, বিশেষভাবে সকালে।

কিভাবে বংশবৃদ্ধি হয় ঃ

স্ত্রী মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। ডিম ক্রমে মশায় পরিণত হয়। ম্যালেরিয়ার মশার (এ্যানোফিলিস) মতই ডেঙ্গুর মশা (ইডিস ইজিপ্টাই) তার বংশবিস্তার ও রোগ সংক্রমণ ঘটায়। তবে জমা জল শুধু ফেলে দিলে বা তাতে কীটনাশক দিলেই হবে না। পাত্রের গায়ে এই মশার ডিম লেগে থাকে বলে পাত্রটি চেঁছে পরিস্কার করতে হবে। এই রোগের প্রকোপ দেখা দিলে দিনের বেলায় মশার কামড় এড়াতে হবেই। রাত্রেও সাবধানে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশেষ কোন উপসর্গ বা লক্ষণ ছাড়াই এই জ্বরের আক্রান্ত হতে পারেন। ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া ওষুধ খাওয়ায় বিপদ সৃষ্টি হতে পারে। তাই, আগে উল্লেখ করা উপসর্গ সহ জ্বর হলে অ্যাসপিরিণ ঘটিত কোন ওষুধ খাবেন না। গৃহ চিকিৎসক বা হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে যাবেন।

ঠিকমত চিকিৎসা না হলে এই রোগে মৃত্যু হতে পারে।

সূত্রঃ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পুস্তিকা

অ্যানথ্রাক্স
(Anthrax)

একটি রোগের নাম অ্যানথ্রাক্স, একটি আতঙ্কের নাম অ্যানথ্রাক্স। এই আতঙ্ক আজ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। সুউচ্চ প্রসাদ নগরী থেকে বস্তির কুঁড়ে ঘরে সেই আতঙ্কের বার্তা পৌঁছে গেছে। অথচ এই রোগটা আর পাঁচটা কঠিন রোগের মত নয়। জীবাণুও তেমন ভয় পাইয়ে দেবার মত জেদি নয়। তবু বিত্তশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতের গ্রাম পর্যন্ত এর আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ক্ষমতার দাপট মানুষকে ত্রস্ত করে তুলেছে। এরই ফাঁকতালে কিছু সংখ্যক ওষুধ প্রস্তুতকারক ও সাবধানতার উপকরণ প্রস্তুতকারক "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীর" পদধুলিতে কৃতার্থ হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে এটা যত না ভয়ের, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কের, হুজুগের। তবে "সাবধানের মার নেই" এই আপৎকালিন বাক্য মেনে নিলে দোষের কিছু নেই। বরং তাতে আতঙ্ক কাটবে, আর সুস্থও থাকা যাবে।

চিঠির খামের মধ্যে থেকে আমেরিকায় রোগটি ধরা পড়ার অনেক আগেও আমাদেরদেশেও রোগটি ছিল, এখনও আছে। তবে, একে বন্য ও গৃহপালিত পশুর রোগ বলেই গণ্য করা হয়েছে এতকাল ধরে। মাঝে মাঝে মানুষের মধ্যে রোগটি দেখা যায়, কিন্তু কখনোই একে মারাত্মক রোগ বলে গণ্য করা হয় না।

অ্যানথ্রাক্স একটি সংক্রামক রোগ। এর মূলে রয়েছে ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus Anthracis) নামের একটি ব্যাকটেরিয়া (জীবাণু)। সাধারণভাবে গরু-মোষ, ভেড়া, ছাগল, উট, বানর ও অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীদের এই রোগ হয়ে থাকে। এমন কী হাতি ও গন্ডারের মত বলশালী বন্য প্রাণীও এই রোগের শিকার হয়। আর বনের মাংসাশী প্রাণী ও ঐ প্রাণীদের মাংস, ক্ষত, শুকনো চামড়া বা পশম থেকে এ রোগ মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়ে থাকে।

প্রধানতঃ কৃষি অঞ্চলে রোগের প্রকোপ দেখা যায়। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, ক্যারাবিয়ান দেশ সমুহ ও মধ্য প্রাচ্য সহ দূর প্রাচ্য তথ্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে হামেশাই তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে রোগটি দেখা যায়। এই সব দেশে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত বা ঐ সংক্রমণে মৃত প্রাণীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার জন্য মানব দেহে রোগটি সংক্রামিত হয়ে থাকে। ঐ রোগে আক্রান্তরা মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়া, ভেড়ার লোম কাটা, মৃত প্রাণীদের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া বা অন্য কোনভাবে সংক্রামিত হয়ে থাকে।

রোগ সংক্রমণ পদ্ধতি ঃ

মূলতঃ তিন ভাবে রোগটি সংক্রামিত হয়। সেই তিনটি পদ্ধতি হল—ত্বকের মাধ্যমে (Cutaneous), শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে (Inhalation) ও খাদ্যনালীর (Gastrointestinal) পথে।

অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু বহু বছর মাটিতে মিশেও থাকতে পারে। সেই মাটি থেকে গাছপালায় এবং তা থেকে জীবাণু সংক্রামিত হলে রোগের প্রকাশ ঘটতে সাধারণভাবে ৭ দিন লেগে যায়। তবে, জীবাণু কতটা পরিমাণে ও কিভাবে সংক্রামিত হয়েছে তার ওপরেও রোগ লক্ষণের প্রকাশকাল নির্ভর করে। তাছাড়া রোগের জটিলতাও এভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ত্বকের মাধ্যমে (Cutaneous) ঃ

শতকরা ৯৫ ভাগ অ্যানথ্রাক্স সংক্রামিত হয় ত্বকের মাধ্যমে। শরীরের কোন কাটা বা ছেঁড়া ত্বকের মধ্য দিয়ে জীবাণু মানব দেহে সংক্রামিত হয়, পশম সংগ্রহ, চামড়া সংগ্রহ বা প্রাণীদের পশম দিয়ে ব্রাশ-তুলি ইত্যাদি তৈরির সময়। ত্বকে সংক্রামিত হলে প্রথমে সাধারণ চুলকানির মত অবস্থা দেখা দেয় ও গুটি হয়। দু-এক দিনের মধ্যে সেখানে বেদনাহীন ক্ষত দেখা দেয়। সাধারণভাবে এর মাপ থাকে ১ থেকে ৩ সেন্টিমিটার গোলাকৃতি। তার কেন্দ্রস্থল থাকে কালো। কাছের গ্ল্যান্ড (গ্রন্থী) ফুলে উঠতে বা ব্যথা হতে পারে। যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগী মারা যেতে পারে। তবে, জীবাণু নাশক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধে রোগী ভাল হয়ে যায়।

শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে (Inhalation) ঃ

প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ সর্দি-কাশী দেখা যায। নাক, মুখ দিয়ে কাশির সাথে রক্ত, বুকে ব্যাথা, কয়েকদিনের মধ্যে শ্বাস কষ্ট ও শক হতে পারে। তিন ধরণের অ্যানথ্রাক্সের মধ্যে এটাই সব চেয়ে বেশি মারাত্মক। সাম্প্রতিক আতঙ্ক সৃষ্টির কারণও এই ধরণের রোগ। এই রোগের জীবাণু গবেষণাগারে চাষ (Culture) করে সংহত অবস্থায়, বিশেষ ধরণের রাসায়নিক সহযোগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যায়। আর এটা পার্শেল তা বটেই, এমনকি খামের চিঠির মধ্যেও পাঠানো যায়। এই পদ্ধতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া তথা জীবাণু যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়া সহজ সাধ্য। সাম্প্রতিককালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে চিঠিতে সাদা গুঁড়ো পাঠানোর হিড়িক পড়ে গেছে। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক খামে জীবাণু ধরাও পড়েছে। আমাদের দেশে বহু চিঠিতে গুঁড়োর খবর থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জীবাণু পাওয়া যায়নি। তবু, সাবধানতার অঙ্গ হিসাবে ভারত সরকার ডাক কর্মীদের চিঠি বাছাই করার সময় মুখোশ ও দস্তানা পরার নির্দেশ দিয়েছে। প্রয়োজনীয় মুখোশ ও দস্তানা সরকার থেকেই সরবরাহ করা হয়েছে।

আন্ত্রিক পদ্ধতি (Gastrointestinal) ঃ

রোগ জীবাণু-সংক্রামিত পশুর মাংস ও ঐ রোগে মৃত পশুর মাংস ভালভাবে রান্না না করে খেলে রোগ সৃষ্টি হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল জীবাণু সংক্রমণের পরেই পেটের অসুখের লক্ষণ দেখা দেয়। খাদ্যনালী থেকে মলদ্বার পর্যন্ত সমগ্র পরিপাকতন্ত্র

স্ফীত হয়। প্রথমে বমি ভাব বা বমি, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর, পেট ব্যথা, বমির সঙ্গে রক্ত ও গুরুতর পেট খারাপ হয়ে থাকে। যথা সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে ২৫ থেকে ৬০ শতাংশে রোগী মারা যেতে পারে।

অ্যানথ্রাক্স ভ্যাকসিন (টিকা) ঃ

অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ প্রতিরোধে পশুদের টিকা দেবার ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। যে সব দেশে বিপজ্জনক অঞ্চলে পশুদের ব্যাপক টিকা দানের ব্যবস্থা নেই সেখানে পশুদের সংস্রব এড়িয়ে চলা উচিত এবং ভাল করে রান্না না করে মাংস ও মাংস থেকে তৈরি খাবার খাওয়া উচিত নায়। টিকা যেমন পশুদের দেওয়া হয় তেমনি মানুষের জন্যও টিকা রয়েছে। বলা বাহুল্য পশুদের জন্য নির্দিষ্ট টিকা মানুষকে দেওয়া যায় না।

টিকা কাদের নেওয়া দরকার ঃ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যানথ্রাক্সের টিকাকরণ বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এই বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুসারে টিকা নেওয়া দরকার তেমন ব্যক্তিদের যাঁরা অ্যানথ্রাক্স জীবাণুপ্রবণ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করেন।

- গবেষণাগারে দেহের অংশ নিয়ে কাজ করেন।
- পশুর চামড়া বা পশম নিয়ে কাজ করেন।
- অ্যানথ্রাক্সপ্রবণ অঞ্চলে পশুদের নিয়ে কাজ করেন।
- জীবাণু-যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে তেমন অঞ্চলে কর্তব্যরত সৈনিক ও অন্যান্য কর্মী।

চিকিৎসা ঃ

অ্যানথ্রাক্স সংক্রামিত ব্যক্তির চিকিৎসায় বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক বিশেষ কার্যকরী। পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন সিপ্রোফ্লক্সাসিন, ক্লোরামফেনিকল প্রভৃতি। তবে, সংক্রমণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। গ্ল্যান্ড সংক্রামিত হলে বা ক্ষতে পচন ধরলে অবস্থা মারাত্মক হয়ে যায়। এছাড়া ক্ষত থেকে নিসৃত বিষাক্ত দ্রব্য (Toxin) রক্তে মিশে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটে। চিকিৎসা করতে হবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মত।

এই প্রেক্ষিতে কোন জায়গায় বা অঞ্চলে চিঠি বা পার্সেলে সাদা গুঁড়ো দেখলে বা কোন প্রাণীর অ্যানথ্রাক্স হয়েছে মনে হলে সরাসরি হাসপাতালে বিশেষ করে কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের চিঠি সহ যোগাযোগ করতে হবে। এই কাজে ডিরেক্টর, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেল, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন বিষদ জানার জন্য।

সূত্র ঃ ডাঃ তাপস ভট্টাচার্য্য, এস. টি. এম

প্লেগ
(Plegue)

পৃথিবী জুড়ে প্লেগ একদিন এমন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল যে, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে এক সপ্তমাংশ মানুষ মারা যায়। ১৮৯৪ সালে হংকং, ১৮৯৮ এ মহারাষ্ট্রে প্রবল বিক্রমে প্লেগ মানুষ নিধনে ছিল অসীম ক্ষমতাশালী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুসারে ১৯৫০ সালেও সারা পৃথিবীতে প্লেগে ৪০,৪৮৪ জন মারা যায়। ১৯৮০ সালে তা কমে হয় ৩০৩৭ জন। এখন প্লেগে খুব কম মানুষই মারা যাচ্ছে। এইভাবে মৃত্যুহার কমে যাবার প্রধান কারণগুলি হল, উন্নত বসবাস ব্যবস্থা, আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা এবং কীটনাশকে জীবাণুবাহী মাছির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ।

প্লেগ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর রোগ। মেঠো ইঁদুর থেকে ঐ রোগের জীবাণু কুকুর ও বিড়ালে সংক্রামিত হয়। ফলে জীবাণু মানুষে সংক্রামিত হয়। 'র্যাট ফ্লি' নামের এক ধরণের মাছি এই রোগের জীবাণু মানুষের শরীর সংক্রামিত করে। এই মাছি উঁচুতে উড়তে পারে না। তাই দু'ফুটের বেশি উঁচু খাট বা খাটিয়ায় শুলে আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়।

মানুষ থেকে মানুষে সংক্রামিত হয় হাঁচি, কাশি ও থুতু মারফতে। আর মাছি উড়তে কম পারে বলে সাধারণত মানুষকে পায়ে কামড়ায়। এবং আক্রান্ত ব্যক্তির প্রবল জ্বর হয়। সঙ্গে মাথা ব্যথা, বমি ও আচ্ছন্ন ভাব থাকে। শরীরের গ্ল্যান্ডগুলি ফুলে যায়। সময় মত চিকিৎসা না হলে শরীর বিষিয়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটে। অন্য ধরণের প্লেগ শ্বাসযন্ত্র, ফুসফুসকে অচল করে দেয়। এটা বেশি ছোঁয়াচে। হাঁচি ও কাশি থেকে রোগ দ্রুত ছড়াতে পারে।

এই রোগের লক্ষণের সঙ্গে টাইফয়েড, টাইফাস, সিফিলিস, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের লক্ষণের মিল থাকায় রোগ নির্ণয়ে জটিলতা থেকে যায়। তবে, চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করেন। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করেন। চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অ্যান্টিবায়োটিক। ডাক্তারদের তত্বাবধানেই এই রোগের চিকিৎসা করতে হবে। অন্যদিকে রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা ও সেনিটেশন এবং রোগীর পরিচর্যায় সাবধানতা।

চর্মরোগ
(Skin Diseases)

আমাদের গায়ের চামড়া শরীরকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, অনিষ্টকারী জীবাণু প্রবেশে বাধা দেয়, ঘাম বের করে শরীরের ক্লেশ দূর করে, শরীর ঠান্ডা রাখে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, স্পর্শ ও বেদনা জ্ঞান জন্মায় ও ভিটামিন 'ডি' সৃষ্টি করে। চামড়ার দুটি স্তর আছে—বাইরের স্তরকে এপিড্রামিস (উপত্বক) ও তার নীচের স্তরকে ডামিস (ত্বক) বলে, উপত্বকে রক্তনালী নেই। হাত ও পায়ের চেটোর এপিডামিস পুরু ও কঠিন। থাইরয়েড গ্রন্থিরসের অভাব হলে চামড়া শুষ্ক, মোটা ও চিমড়ে হয় এবং রসের আধিক্য হলে চামড়া গরম ও ভিজে ভিজে হয়।

এপিডামিস বা উপত্বকের দুই স্তর। উপর স্তরের কাজ শেষ হলে মরে যায় ও কড়াযুক্ত হয় এতে সাড় থাকে না, জল প্রবেশ করে না এবং তড়িৎ বোধ থাকে না। নিয়মিত নতুন কোষ তৈরী হয়ে এগিয়ে আসে ও পুরাতন কোষগুলি ছাঁটাই হয়। নীচের স্তরকে ম্যালফিজিয়ান লেয়ার বলে এবং এতে একটা রং মেলানিন থাকে যার কম বেশীর দরুণ সাদা, লাল, ব্রাউন ইয়োলো, শ্যাম, কাল বরণ মানুষ দেখা যায়। এবং এর প্রধান কাজ সূর্যের তাপ (একিটনিক) রশ্মি থেকে চামড়াকে রক্ষা করা।

ডামিস বা ত্বকে অসংখ্য সূক্ষ্ম ধমণী ও শিরার জাল আছে এবং চুলের গোড়া, মেদ বা তৈল গ্রন্থি (সিবেসাস্ গ্ল্যান্ড) ও ঘর্ম্মগ্রন্থি (সোয়েট গ্ল্যান্ড) থাকে। চুলের দুধারে মেদগ্রন্থিরা সিরাম নিঃসৃত করে চুলকে মসৃণ রাখে। আর ঘর্ম্মগ্রন্থিরা পাকান নল দিয়ে উপরে উঠে চর্মে ঘাম ছেড়ে দেয়। ঘামের শতকরা ৯৯ ভাগের বেশী জল আর প্রধান উপাদান লবণ। ভিটামিন ও ইউরিয়া। ২০ থেকে ৩০ লক্ষ ঘর্ম্মগ্রন্থি দেহের তাপসাম্য নিয়ত রক্ষা করেছে। গরম দেশে বিশ্রাম কালে ঘন্টায় ২০০ গ্রাম ও শ্রমকালে ৯০০ গ্রাম ঘাম বের হয়। ত্বকের একপ্রস্থ চর্ব্বি আছে। চামড়ায় ৫ প্রকার অনুভূতি হয় স্পর্শ, বেদনা, ঠান্ডা, গরম ও তাপ। কেশের গোড়া ত্বকের মধ্যে পিঁয়াজ কলির মত জন্মে ও উপত্বক ফুঁড়ে বের হয়। সূক্ষ্ম মাংসপেশীর মেদগ্রন্থিদের চাপ দিয়ে সিরাম বা করে। হঠাৎ ঠান্ডা লাগলে বা ভয় পেলে দেহ রোমাঞ্চ হয় মানে ঐ পেশীরা কুঁচকিয়ে চুল খাড়া করে।

চামড়ার বিভিন্ন রোগ ঃ

চামড়ার যে কোন রোগকে চর্মরোগ বলে। চামড়ার কোনও কোনও বিশেষ স্থানে এই রোগ হতে পারে। যেমন চুলকানি, দাদ, কাউর বা একজিমা।

দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি চর্মরোগে সারা শরীর আক্রান্ত হতে পারে যেমন হাম, জলবসন্ত, মরামাস ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ অন্য রোগের লক্ষণ স্বরূপ কিছু কিছু চর্মরোগ দেখা যায় যেমন যক্ষ্মা (চামড়ার), অপুষ্টি (কোয়াসিয়রকর, পেলাগ্রা, ভিটামিন এ-র অভাব, গর্মী (সিফিলিস) কুষ্ঠ, ক্যানসার, এলার্জ্জী ইত্যাদি। এখানে গ্রাম এলাকার

কিছু সাধারণ চর্মরোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন চর্মরোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা থাকলেও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে যাতে প্রায়ই খুব ভাল কাজ হয়।

১নং নিয়ম ঃ

চামড়ায় জ্বালাপোড়া থাকলে আক্রান্ত স্থান লাল হয়, ফুলে উঠে, যন্ত্রণা হয় ও টিপলে ব্যথা লাগে, হাত দিলে গরম বোধ হয় এবং ভিতরে পুঁজ হয়। এগুলি সংক্রমণ জনিত প্রদাহের (ইনফ্ল্যামেশান) লক্ষণ ও চিহ্ন।

আক্রান্ত অঙ্গ বেশী নড়াচড়া না করে শরীর থেকে উঁচুতে রাখুন এবং গরম জলে কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে সেক দিন। প্রদাহ খুব বেশী হলে বা জ্বর থাকলে এন্টিবায়োটিক সালফোনামাইড, কোট্রাইমক্সাজোল ইত্যাদির ব্যবস্থা দেওয়া হয়। লসিকা গ্রন্থি (লিম্ফ গ্ল্যান্ড) ফুলে উঠলে বা আক্রান্ত স্থানের উপর দিয়ে লাল রেখা দেখা দিলে অথবা দুর্গন্ধ হলে রোগ মারাত্মক হয়ে পড়ে।

২নং নিয়ম ঃ

আক্রান্ত স্থানে চুলকানি থাকলে, ফোস্কা উঠলে, কষ বার হলে, জ্বালাপোড়া করলে বা পুড়ে গেলে আক্রান্ত স্থানে ঠান্ডা জলে কাপড় ভিজিয়ে পটি লাগাতে হবে (ভিনিগার পাওয়া গেলে এক কাপ জলে ১ চামচ ভিনিগার মিশিয়ে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পটি দেওয়া যেতে পারে)।

আক্রান্ত স্থানে নতুন চামড়া দেখা দিলে ও স্রাব নিঃস্বরণ বন্ধ হলে ১ ভাগ ট্যালকম পাউডার একত্র মিশিয়ে প্রলেপ লাগাতে হবে।

নতুন চামড়ার পরত পুরু হতে থাকলে আক্রান্ত স্থানকে নরম রাখার জন্য মাথার তেল মালিশ করতে হবে।

৩নং নিয়ম ঃ

শরীরের রোদ লাগা খোলা অংশে চর্মরোগ হলে আক্রান্ত স্থান ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে।

৪নং নিয়ম ঃ

শরীরের যে সব অংশে সব সময় কাপড়ে ঢাকা থাকে সেখানে চর্মরোগের বেলায় আক্রান্ত স্থান খোলা রেখে সূর্য্যের কিরণ লাগাতে হবে।

কারণ অনুযায়ী বিভিন্ন চর্মরোগের নাম, লক্ষণ ও চিহ্ন ও তার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ নিচে দেওয়া গেল ঃ

রোগের নাম ঃ উকুন

কারণ ঃ অতি ক্ষুদ্র পরজীবী প্রাণী

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ মাথার ও শরীরের উকুন চুলকানির কারণ হতে পারে। মাথার চুলে উকুন ও তার ডিম পাওয়া যায়। ডিমগুলি মাথার চুলে চক্ চক্ করে ও আটকিয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ঃ কেরোসিন তেল রাত্রে মাথায় মেখে একটা তোয়ালে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে। পরদিন সকালে সাবান দিয়ে ভাল করে মাথা পরিষ্কার করতে হবে ও চুল আঁচড়াতে হবে। পরিবারের সকলকে একই সাথে এটি করতে হবে। বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর ফুটিয়ে রোদে শুকতে হবে। চিরুণী সম্বন্ধে সাবধান। লোরেক্সেন বা বেনজাইল বেনজোয়েট লোশনও ব্যবহার করা যেতে পারে। এক সপ্তাহ পরে পুনরায় চিকিৎসা করা ভাল।

রোগের নাম ঃ আঁটুলি

কারণ ঃ অতি ক্ষুদ্র প্রাণী

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ এই পোকা চামড়া কামড়ে ধরে শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকে, আঁটুলির শরীর ধরে টান দিলে মাথা ছিঁড়ে চামড়ার সঙ্গে থেকে যেতে পারে এবং সংক্রমণ হবার ভয় থাকে। আঁটুলির কাছে একটি জলন্ত সিগারেট নিয়ে গেলে কামড় ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে অথবা এক টুকরো তুলা এলকোহলে ভিজিয়ে আঁটুলির গায়ে স্পর্শ করলে গন্ধ সহ্য করতে না পেরে কামড় ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে।

প্রতিরোধ ঃ আক্রান্ত স্থান ব্যথা করলে ও চুলকালে ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল ও চুলকানির জন্য ফরিষ্টাল, জিট বা ইনসিডাল বড়ি খেতে হবে। গরু ও কুকুর থেকে সাবধান হতে হবে ও পরিচ্ছন্নতা পালন করতে হবে।

রোগের নাম ঃ খোস পাঁচড়া (চুলকানি) বা স্কেবিস

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ একপ্রকার ছোট পোকার আক্রমণে (কতকটা আঁটুলি পোকার বাচ্চার মত বা ওলের মত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়।) চামড়ার নীচে সুড়ঙ্গ তৈরী হয়। আক্রান্ত স্থান থেকে শরীরের অন্যত্র রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসফুড়িতে শরীরের অংশ বিশেষ ভরে যায় ও খুব চুলকায়। হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে, কব্জিতে, কোমরের চারদিকে, যৌনাঙ্গের আশেপাশে, অন্ডকোষের উপর, নীচের হাতের বা বগলের কাছে ও পায়ের গোছে সাধারণতঃ হয়। মুখ, হাতের ও পায়ের তালুতে সাধারণতঃ হয় না। কিন্তু খুব কচি বাচ্চার হাতের ও পায়ের তালুতে হয়। চুলকানির জন্য ফুসকুড়িতে পুঁজ হয় এবং পরে গলে গিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ায় সেখানেও চুলকানি হয়। লসিকা গ্রন্থির প্রদাহও হতে পারে—ব্যথা করে এবং জ্বরও হতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ বাড়ীর সবারই চিকিৎসার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত জরুরী। রোজ স্নান, পোষাক বদল, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে গামছা ফুটিয়ে রোদে শুকাতে হবে। নিম সাবান দিয়ে স্নান করার পর গা ভাল করে মুছে নিয়ে বেনজিল বেনজোয়েট লোশন ২৫% (বাচ্চাদের শতকরা সাড়ে বার) গলা থেকে পায়ের আঙ্গুল অবধি তুলা দিয়ে ভাল করে লাগাতে হবে তিন দিন। ঐ তিন দিন পোষাক ছাড়া চলবে না ও স্নানও বন্ধ রাখতে হবে। চতুর্থ দিনে জামাকাপড় ফুটিয়ে রোদে দিতে হবে ও সাবান দিয়ে ভাল করে স্নান করে ফেলতে হবে। ফুসকুড়িতে যদি পুঁজ হয় তবে আগে তার চিকিৎসা করে পরে এই লোশন লাগাতে হবে। অথবা

সস্তার গ্রাম্য চিকিৎসায় ১০ ভাগ তেলের মধ্যে ১ ভাগ গন্ধকের গুঁড়া মিশিয়ে লাগাতে হবে।

রোগের নাম ঃ পুঁজযুক্ত ছোট ছোট ফুস্কড়ি

কারণ ঃ বীজাণু

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ কীট পতঙ্গের দংশন করলে, খোস পাঁচড়া হলে এবং নখ দিয়ে চুলকালে সেখানে ছোট ছোট ফুস্কড়ি হয় এবং সেগুলিতে পুঁজ হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ গরম জল ও সাবান দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। ছোট ফোঁড়া হলে বাতাস লাগাবার জন্য খোলা রাখতে হবে। প্রদাহের চিহ্ন থাকলে পেনিসিলিন্ বা সালফা বড়ি বা কোট্রাইমক্সাজোল বড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। ফুস্কুড়ি চুলকাতে নেই। ছোট ছেলেমেয়েদের হাতের নোখ কেটে হাতে গ্লাভস্, পরিস্কার মোজা বা কাপড় পরিয়ে দিতে হবে।

রোগের নাম ঃ চর্মদল সংক্রমক ক্ষত বা ইম্পেটাইগে

কারণ ঃ বীজাণু

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ এতে চামড়ার উপর সাংঘাতিক সংক্রামক ক্ষত ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক বীজাণু দ্বারা সৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ক্ষতগুলি বাচ্চার মুখে, নাকে, কানে, বা মাথায় ও পাছায় দেখা যায়। প্রথমে লাল লাল দানা বের হয় ও তারপর জলযুক্ত ফুস্কুড়ি দেখা যায়। কখনও কখনও খুব বড় ফোস্কার ন্যায়ও হয়। জলযুক্ত ফুস্কুড়ি দেখতে পাওয়া খুব কঠিন। কারণ এগুলি খুব শীঘ্র ফেটে যায়। এই ফাটা ফুস্কুড়িগুলি লাল হয়ে রস ও পাতলা পুঁজযুক্ত হয় ও হলদে মামড়ি পড়ে (সাধারণতঃ এই অবস্থাতেই দেখা যায়)। এই মামড়িগুলি অনেক সময় ধারের কাছে দেখা যায় কারণ মধ্যভাগ শুকিয়ে যায় এবং রিং এর মত দেখায়। তাই রিংওয়ার্ম বা দাদের সঙ্গে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। এই জীবাণু অনেক সময় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে হাড়ে পুঁজ বা রক্তদূষিত করতে পারে। ছোট শিশুর এতে মৃত্যু হতে পারে। অতি সহজেই বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ সাবান ও গরম জল দিয়ে ঘা ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ভালভাবে ভিজিয়ে উপরের শক্ত ও পাতলা মামড়িটি তুলে ফেলতে হবে। ঘায়ে ২% জেনসিয়ান ভায়োলেট লাগাতে হবে। রোগীর লসিকাগ্রন্থি ফুলে উঠলে বা জ্বর হলে যথাযথ ওষুধ খাওয়াতে হবে। চর্মদলে আক্রান্ত শিশুকে অন্য শিশুদের সঙ্গে ঘুমাতে বা খেলতে দেওয়া উচিত নয়। রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই চিকিৎসা করা উচিৎ।

রোগের নাম ঃ কুষ্ঠ

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ এটি জীবাণু সংক্রান্ত ব্যাধি এবং মানুষ থেকে মানুষে সংক্রামিত হয় এবং চামড়ার বা নাকের স্রাবের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। ৯৫% থেকে ৯৮% লোকের এই রোগের বিরুদ্ধে সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। কেবলমাত্র শতকরা

১৫-২০ ভাগ রোগী সংক্রামক। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, যৌনরোগ, অভিশাপ গরমখাদ্য ইত্যাদি এই রোগের কারণ নয়—এগুলি নিছক কুসংস্কার। কুষ্ঠ চিনবার প্রধান কটি উপায় হল ঃ

ফ্যাকাসে বা লালচে দাগ এক সেন্টিমিটারের বেশী। তাতে অনুভূতি থাকে না। স্থান বিশেষে স্নায়ুগুলি মোটা হয় দাগগুলি চুলকায় না বা পুঁজ দেখা যায় না। দাগে চুল থাকে না। চামড়া চক্‌চকে ও মোটা হয়। ভ্রু খসে পড়ে। সাধারণতঃ দুবছরের কম বয়সে এই রোগ হয় না, এটি বংশগত রোগ নয়। চামড়া আঁচড়িয়ে নিয়ে তাতে এই রোগের জীবাণু মাইকোব্যাক্‌টিরিয়াম লেপ্রি পাওয়া যায়। শরীরের প্রতিরোধ শক্ত থাকলে এই রোগ হয় না এবং উচ্চ প্রতিরোধশক্তিতে স্থানীয় রোগ (টিউবারকিউলয়েড) দেখা যায়। মাঝারি প্রতিরোধ শক্তিতে বর্ডার লাইন টিউবারকিউলয়েড, অল্প প্রতিরোধ শক্তিতে রোগটি মোটামুটি ছড়িয়ে পড়ে (বর্ডার লাইন, লেপ্রোমেটাস) এবং প্রতিরোধ শক্তির একান্ত অভাবে, সারা শরীর ব্যাপী রোগ লেপ্রোমেটাস্ হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ (ক) কম জীবাণু ঘটিত কুষ্ঠ ঃ তিন প্রকার ঃ

১। ইনডিটার মিনেট ঃ

(চামড়ায় ও নাকে বীজাণু পাওয়া যায় না) দাগ ও অনুভূতি, স্নায়ু আক্রান্ত হয় না।

২। টিউবারকিউলয়েড ঃ

চামড়ায় ও নাকে জীবাণু পাওয়া যায় না। অনুভূতি নষ্ট হয়। চুল থাকে না বা অতি অল্প থাকে। প্রায়ই স্নায়ু আক্রান্ত হয়।

৩। বর্ডার লাইন টিউবারকিউলয়েড ঃ

চামড়ায় সামান্য বীজাণু পাওয়া যায়, নাকে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা ঃ

ড্যাপসোন ১০০ মিগ্রা প্রতিদিন ৬ মাস ব্যাপী। রিফামপিসিন ৬০০ মিগ্রা মাসে একবার ছমাস ব্যাপী। ৬ মাস পর পর্যালোচনা করে অবস্থা বুঝতে হবে। যদি রিএ্যাকসন বা প্রতিক্রিয়া হয় তবে ড্যাপসনের সঙ্গে কর্টিকোষ্টেরয়েড দিতে হবে যতদিন না রিএ্যাকসন বা প্রতিক্রিয়া দূর হয়।

(খ) বহু জীবাণু ঘটিত কুষ্ঠ ঃ

তিন প্রকার ঃ

১। মিড বর্ডার লাইন ঃ

অনেকগুলি দাগ যেন বসে যাওয়া চামড়ায় বীজাণু মাঝারী রকম পাওয়া গেলেও নাকে পাওয়া যায় না। অনেকগুলি স্নায়ু আক্রান্ত হয়। প্রায়ই দেখা যায় না।

২। বর্ডারলাইন Leptomatous ঃ

চামড়ায় বহু বীজাণু পাওয়া যায়, নাকে সামান্য।

৩। **Lepromatous ঃ** চামড়ায় ও নাকে প্রচুর জীবাণু, সাধারণতঃ ইনফিলট্রেশান ও নোড়ি উলার টাইপ। চিকিৎসা ড্যাপসোন ১০০ মিগ্রা প্রতিদিন, ল্যামপ্রিম ৫০ মিগ্রা প্রতিদিন, রির্ফামপিসিন ৬০০ মিগ্রা + ল্যামপ্রিন ৩০০ মিগ্রা মাসে একবার। ২৪ মাস।

রোগের নাম ঃ ফোঁড়া

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ এতে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে চামড়ার নীচে পুঁজভর্তি একটি থলি তৈরী হয়, কোনকিছু চামড়ায় ফুঁটলে বা অপরিচ্ছন্ন ছুঁচে ইনজেকসান দিতে প্রায়ই এই অবস্থা দেখা দিতে পারে। ফোঁড়া হলে জায়গাটি লাল হয়, গরম হয়, ফুলে উঠে, ব্যথা হয়, পুঁজ হয়, জ্বর হয় এবং লসিকা গ্রন্থিগুলির ও প্রদাহ হয় ও অঙ্গটি প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে গরমের দিনে লোমকূপ বা চুলের গোড়ায় সংক্রমণ হয়ে বাচ্চাদের একাধিক ফোঁড়া হয়।

প্রতিরোধ ঃ গরম কম্প্রেস বার বার লাগালে উপশম হয়। ফোঁড়াটিকে নিজে নিজেই ফাটতে দেওয়া ভাল। ফাটার পরও গরম কম্প্রেস চালিয়ে যেতে হবে। কখনও টিপে পুঁজ বার করা উচিৎ নয় কারণ এতে সংক্রমণ দেহে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। জ্বর ও লসিকা গ্রন্থি প্রদাহে যথাযথ ওষুধ খাওয়াতে হবে।

রোগের নাম ঃ চামড়ার অথবা লসিকা গ্রন্থির যক্ষ্মা

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ যে জীবাণুর আক্রমণে ফুসফুসে যক্ষ্মা হয় সেই জীবাণুই চামড়া ও লসিকাগ্রন্থি আক্রমণ করে। চামড়ার যক্ষ্মাকে লুপাস ভালগারিস বলা হয়। এতে একক লালচে অসমান উঁচু চাকার মত দাগ হয়। রং পাটকিলে অথবা ম্যাড়মেড়ে লাল। একদিক ভাল হয়ে অন্যদিকে ঘা হয়। যক্ষ্মা কখনও কখনও লসিকা গ্রন্থিতেও সংক্রমণ ঘটায় বিশেষ করে ঘাড়, ঘাড় ও কাঁধের মাঝের অংশ এবং কণ্ঠাস্থির পিছনের অংশের গ্রন্থিগুলি এবং সেগুলি বড় হয়, ফুলে ওঠে তার থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়ে। সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং আবার পুঁজ গড়ায়। ব্যথা বিশেষ থাকে না।

প্রতিরোধ ঃ যক্ষ্মার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধে ভাল হয় এবং ঘা ফোস্কার দ্বারা রোগটি নির্নিত হতে সাহায্য করে। পুনরায় রোগ যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য চামড়ার উপরিভাগ ভাল হয়ে যাবার পরও কয়েক মাস ধরে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে।

রোগের নাম ঃ ইরিসিপ্ল্যাস

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ চামড়ার ক্ষণস্থায়ী আক্রমণ। এতে আক্রান্ত স্থান লাল হয়, ফুলে উঠে—গরম হয় এবং চারদিকে সীমারেখা স্পষ্ট। মুখমন্ডল ও নাকের কিনারে প্রথমে ও পরে সারা শরীরে লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ ও জ্বর হয়।

প্রতিরোধ ঃ গরম কম্প্রেস, ব্যথা কমানোর ওষুধ, পেনিসিলিন বড়ি/ ইন্জেকসান।

রোগের নাম ঃ গ্যাংগ্রিন ও গ্যাস গ্যাংগ্রিন

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ এক প্রকার ভয়ানক সংক্রমণ। সাধারণঃ ঘায়ে এ ধরণের সংক্রমণ ঘটে এবং বিশেষ করে বহুমূত্র থাকলে। গ্যাংগ্রিন হলে ঘায়ে কালচে ফোঁড়ার মত ফোস্কা দেখা যায় এবং মাংসের ভিতরে বাতাস ঢুকে পড়ে। বেশী আঘাত লাগালে এবং পেশী থেঁতো হলে বা ছিঁড়ে গেলে ৬ ঘন্টা থেকে ৩ দিনের মধ্যে সংক্রমণ ঘটতে পারে। গ্যাংগ্রিন খুব তাড়াতাড়ি মারাত্মক অবস্থার দিকে যায় এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুচিকিৎসা না হলে মৃত্যু হয়।

প্রতিরোধ ঃ গরম জলে খার সাবান দিয়ে ভাল করে ধুতে হবে। মরা চামড়া, পচা নষ্ট হয়ে যাওয়া মাংস কেটে ফেলে দিতে হবে। প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর ১০ লাখ ইউনিট পেনিসিলিন ইন্‌জেকশান দিতে হবে। ঘা খোলা রাখতে হবে যাতে বাতাস লাগে। রোগীকে সত্বর হাসপাতালে পাঠাতে হবে। অন্য অ্যান্টিবায়োটিকও কার্যকর।

রোগের নাম ঃ শয্যা ঘা বা বেড্‌সোর

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ এটা এক ধরণের দীর্ঘস্থায়ী ঘা। দুর্ব্বল, ক্ষীণস্বাস্থ্য, বহুদিনের রোগী ও বয়োবৃদ্ধদের এই রোগ হয়। শরীরের যে সব অংশে হাড়ের উপর পাতলা চামড়া থাকে ও বিছানার ঘর্ষণ বেশী লাগে সে অবস্থানেই এই ঘা হয়। যেমন পিঠে, কনুই, পায়ের গোড়ালী ইত্যাদি।

প্রতিরোধ ঃ রোগী যেন একভাবে না শুয়ে থাকে, একবার চিৎ, তারপর উপুড় আবার পাশ ফিরে শুতে হবে। প্রতিদিন স্নান ও চামড়া পরিষ্কার রাখতে হবে (স্পিরিট ও নেবাসাল্‌ফ পাউডার।) নরম বিছানা ও মসৃণ চাদর ও এবং প্রতিদিন চাদর বদল করে দিতে হবে। হাড়ে যাতে ঘষা কম লাগে সেজন্য গদির মত কিছু দিতে হবে। অভাবে বালিশ, মোটর গাড়ীর টিউব বাতাস ভরে দেওয়া যায়। পুষ্টিকর খাদ্য, ভিটামিন ইত্যাদি। শিশুরোগীকে যথাসম্ভব মায়ের কোলে রাখতে হবে। হাল্কা ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে।

রোগের নাম ঃ চামড়ার ক্যান্সার

কারণ ঃ অজানা

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ যারা বেশী সময় রোদে থাকে তাদের চামড়ায় ক্যান্সার হতে পারে এবং ঢাকা না থাকা জায়গায় ক্যান্সার বেশী হয় যেমন কানে গালের হাড়ের উপর চামড়ায়—নাকে ও ঠোঁটে। চামড়ায় নানা আকারের ক্যান্সার হয়। সাধারণতঃ গোল চাকার মত হয় এবং মাঝখানে একটা গর্ত্ত থাকে ও আস্তে আস্তে বড় হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ চামড়ায় ক্যান্সার প্রতিরোধে যাদের গায়ের চামড়া খুব পাতলা তাদের রোদে বেশী ঘোরাঘুরি করা উচিৎ নয়। জিংক অক্সাইডের মলম মেখে রোদে কাজ করলে সুরাহা হয়। সময় মত চিকিৎসা করলে চামড়ার অধিকাংশ ক্যান্সার ভাল হয়। শরীরে দীর্ঘস্থায়ী ঘা থেকে ক্যান্সার হতে পারে।

রোগের নাম ঃ পায়ের চামড়ার আলসার বা ক্ষত।

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হলে এই রোগ হয়—এটি একটি বড় ধরণের ঘা। বয়স্ক লোকের বিশেষ করে স্ত্রীলোকের পায়ে গোড়ালীর আশে পাশে দীর্ঘস্থায়ী ঘা রক্ত চলাচলের অসুবিধার জন্যই হয়ে থাকে। কারণ রক্ত স্বাভাবিক ভাবে পায়ের দিকে চলাচল করতে পারে না। ঘায়ের চারদিকের চামড়া নীল এবং খুব পাতলা হয়ে যায়, ব্যথা হয় ও পা ফুলে যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ এ ধরণের ঘা সারাতে খুব দেরী হয়। পা উপরে রাখতে হবে—যতক্ষণ সম্ভব এমন কি ঘুমোবার সময়ও। চলাফেরায় রক্তচলাচল ভাল হয়। এক লিটার গরম জলে এক চামচ লবণ মিশিয়ে সেক দিতে হবে। তারপর ষ্টেরাইল গজ দিয়ে ব্যান্ডেজ ভাল কাজ দেয়। এতে ফুলে উঠা শিরা চেপে থাকবে। ঘা সেরে যাবার পর ও শিরার চাপ ব্যান্ডেজ দিয়ে অব্যাহত রাখতে হবে যতদিন না শিরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রোগের নাম ঃ সোরিয়াসিস বিচচিফা, পাঁপড়া।

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ প্রায়শঃই পারিবারিক রোগ। এই চর্মরোগের লক্ষণ হল লালচে খস্খসে উঁচু চাবড়া খুব সূক্ষ্ম আঁস দিয়ে ঢাকা। প্রথমে কনুই ও হাঁটুতে দেখা যায়। ছোট ছোট ফুস্কুড়ি রূপে শুরু হয়ে পরে ২-৩ ইঞ্চি চাবড়া বা প্যাচে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে শরীরের অন্য অংশে এবং মাথায় ও মুখে বিশেষ করে দেখা যায়। হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুতে কেউ কেউ এই রোগে আক্রান্ত হন। এটি সংক্রামক নয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি এবং মানসিক বিষন্নতার সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক আছে।

প্রতিরোধ ঃ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি, বাত থাকলে তার চিকিৎসা। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ এই রোগে প্রায়ই হয় না। আলকাতরা যুক্ত মলম কর্টিকোষ্টেরয়েড মলম ভাল কাজ দেয়। সূর্য্যালোক ও আলট্রাভায়েলেট রশ্মি খুবই কার্য্যকরী।

রোগের নাম ঃ এক্নি, ব্রণ, কাল আঁচিল ফুসকুড়ি ইত্যাদি।

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ যৌবনকালে যুবক যুবতীদের মুখমন্ডলে, বুকে অথবা পিঠে এক ধরণের ছোট ছোট ফুস্কুড়ি দেখা যায়। একে বয়োব্রণ বলে। ব্রণের মাথা অনেক সময় সাদা হয় এবং তাতে পুঁজ থাকে। কখনো মাথা কালো হয়। কখনো কখনো ব্রণ আকারে বড় হয় এবং ঘা হয়ে যায়।

প্রতিরোধ ঃ গরম জল ও সাবান দিয়ে মুখ রোজ ২ বার ধুয়ে ফেলতে হবে। সূর্য্যের কিরণ লাগান ভাল। পুষ্টিকর খাদ্য, প্রচুর জল পান ও সুনিদ্রার প্রয়োজন। টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল ২৫০ মি, গ্রাম রোজ চারটে চার বারে ৩ দিন খেতে হবে তারপর রোজ ছটা ক্যাপসুল খেতে হবে। এভাবে একমাস খেলেই যথেষ্ট ভিটামিন 'এ' বড়ি ও মুখে মাখার কিছু মলমও ভাল কাজ দেয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করা প্রয়োজন।

রোগের নাম ঃ ক্রেডলক্যাপ। সেবোরিয়া বা মরামাস।

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ শিশুর মাথার চামড়ার উপর তেলতেলে এক ধরণের আস্তরণ পড়ে। আস্তরণটা হলদে রং এর, কিন্তু আস্তরণের নীচের চামড়া লালচে দেখায় এবং চুলকায়। শিশুর মাথায় টুপি বা আর কিছু দিয়ে ঢেকে রাখলে এবং রোজ স্নান করার সময় ধুয়ে না দিলে এ ধরণের আস্তরণ পড়ে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ প্রতিদিন মাথা ভাল করে ধুয়ে দিতে হবে। মরামাস ইত্যাদি তুলে পরিষ্কার করতে হবে। তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঢাকা রেখে চামড়া নরম করে তারপর মরামাস তুলে ফেলতে হবে। জীবাণু নাশক মলম ব্যবহার করলে ভাল ফল হয়।

রোগের নাম ঃ ডায়াপার র‍্যাশ শিশুদের ভিজে নেংটি থেকে ফুস্কুড়ি।

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ শিশুর কোমরে জড়ানো নেংটির মধ্যে শিশু প্রস্রাব করলে নেংটির মধ্যে লালচে রং এর ফুস্কুড়ি উঠে দুই উরুর ফাঁকে কুঁচকিতে ও পাছায়। এসব স্থানে অনবরত চুলকায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ অল্প গরম জলে বেবিসোপ দিয়ে রোজ স্নান করাতে হবে নেংটি ব্যবহার করলেও বারবার তা বদলাতে হবে। নগ্নতাই সবচেয়ে ভাল। নেংটি কেচে নিয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে। এন্টিসেপ্‌টিক পাউডার নেবাসল্‌ফ বা নিওস্পোরিণ পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

রোগের নাম ঃ দাদ, টিনিয়া ঃ

কারণ ঃ ছত্রাক ঃ

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ যে কোন স্থানে হতে পারে তবে বেশীর ভাগ হয় মাথার চামড়ায়, গায়ে, কুঁচকিতে, হাত পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকার মত গোলাকার হয় এবং চুলকায়। মাথার দাদ গোলাকার হয় এবং চুল কমে যায় বা প্রায়ই থাকে না। হাত বা পায়ের নখে ফাংগাস আক্রমণ করলে নখের উপরিভাগ পুরু হয় এবং মসৃণতা নষ্ট হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ সাবান জলে ধোয়া, আক্রান্ত স্থান শুকনো রাখা—মুক্ত রাখা উচিৎ। আজকাল অনেক ভাল নতুন ওযুধ বার হয়েছে যেমন ঃ

১। ক্লোট্রাইমাজোল্‌

২। মাইকোলাজল্‌

৩। কাষ্টেলানিস পেন্ট বিশেষ করে নখ এবং আঙ্গুলের ফাঁকের দাদের জন্য।

৪। টলন্যাফেটট

খাবার ওযুধ ঃ

১। গ্রিসোভিন এফ. পি

২। ইডিফুলভিন

৩। ভালাভিন এফ. পি ১২৫ মিগ্রা বড়ি দিনে ১টি করে চারবার ৮ সপ্তাহ ধরে খেতে হবে।

রোগের নাম ঃ ছুলি, টিনিয়া ভাসিকলর

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ ছোট ছোট কাল এবং সাদা দাগ পাশাপাশি সৃষ্ট হয় এবং কখনো স্পষ্ট কখনো বা অস্পষ্ট রূপে দেখা যায়। সাধারণতঃ চুলকায় না। ঘাড়ে বুকে পিঠে প্রায়ই দেখা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ ১। ১০ ভাগ তেল ও এক ভাগ গন্ধক চুর্ণ। ২। সোডিয়াম থায়োসালফেট (ফটোগ্রাফারের হাইপো) একগ্লাস জলে এক টেবলস্পুন হাইপো বা ২০% সলিউশান আক্রান্ত স্থানে লাগাতে হবে এবং পরে তুলা ভিনিগারে ভিজিয়ে ঘষতে হবে। প্রতিদিন এইভাবে একমাস লাগাতে হবে। ২ সপ্তাহ পর আবার ঐরূপ করলে রোগের পুনরাবির্ভাব হবে না।

রোগের নাম ঃ পেলাগ্রা

কারণ ঃ অপুষ্টি

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ নিকোটনিক এসিড বা নিয়াসিনের (ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের একটি অংশ) অভাবের জন্য হয়। যারা শুধু ভুট্টা বা অন্য শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য খায় এবং শিম, মাংস, ডিম, শাকসব্জিই যথেষ্ট পরিমাণে খায় না। তাদের এই রোগ হয়। শরীরের যে সব স্থানে রোদ লাগে সে সব স্থানে চামড়া মরে খোসার মত হয়ে উঠে যায়। এমন অবস্থা ঘটে হাতের বাহিরের দিকে, ঘাড়ে ও হাঁটুর পিছনে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ পুষ্টিকর খাবার শিম, মটর চিনাবাদাম, ডিম, মাংস, মাছ এবং পনির। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স বড়ি বা নিয়াসিনামাইড বড়ি।

রোগের নাম ঃ কোয়াসিয়রকর

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ অপুষ্টিতে ভুগছে এমন ছেলেমেয়েদের হাত ও পায়ের চামড়ায় ঘন কালচে দাক পড়ে, ঘা হয় এবং ঘায়ের খোসা উঠে চটা ওঠা রঙের মত দেখায়। পা ও পায়ের পাতা ফোলে, চাঁদের মত মুখের দুদিকে ঘা, জিভ লাল এবং ঘা যুক্ত ক্ষুধাহীনতা। মোটা পেট ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ প্রোটিন ক্যালরি অপুষ্টি জনিত। প্রোটিন অপুষ্টিই বেশী। সুতরাং পুষ্টিকর আহারই এর চিকিৎসা। দুধ, মাছ, মাংস, চিনাবাদাম, সোয়াবিন ইত্যাদি।

রোগের নাম ঃ চামড়ার এলার্জ্জি

কারণ ঃ এলার্জ্জি ঃ

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ আহারে, ইনজেকশানে অথবা শরীরে কোন কিছুর স্পর্শ লাগলে অনেকেরই প্রতিক্রিয়াশীলতা বা অস্বস্তি হয় এবং একে এলার্জ্জি বলে। এতে শরীরের চামড়ার উপর স্থানে স্থানে ফুলে উঠে এবং খুব চুলকায়। কোন কোন ওষুধের প্রতি বিশেষ করে পেনিসিলিন ইনজেকশান এবং ঘোড়ার রক্ত রস (সিরাম) থেকে তৈরী প্রদাহ ও বিষনাশক ওষুধের প্রতি অনেকেরই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা থাকে এবং

ওষুধ গ্রহণের কয়েক মিনিট পর থেকে ১০ দিন অবধি প্রতিক্রিয়াশীলতা বজায় থাকে। কিন্তু লতাপাতা গায়ে ঠেকলে গায়ে গুটি উঠে ও চুলকায় যেমন বিছুটি, মানকচু, আইভিলতা ইত্যাদি। কিছু কীটপতঙ্গও এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে যেমন ঃ কেঁচো, শুঁয়োপোকা ইত্যাদি। আবার প্লাষ্টিকের জুতা, ঘড়ির ফিতা। প্রসাধন দ্রব্যাদিও এইরূপ অবস্থা আনতে পারে। এছাড়া নানা অজানা কারণে এলার্জি হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ঃ বিশেষ খাদ্য ও ওষুধ বর্জ্জন করতে হবে। চুলকানির প্রতিকার ঠান্ডাজলে স্নান ও আক্রান্ত স্থানে ঠান্ডা জলের বা বরফের পট্টি লাগান। যে কোন শর্করা জাতীয় পদার্থ জলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে প্রলেপ লাগান। এন্টিহিস্টামিনিক ওষুধ খেতে হবে। শিশুর নখ কেটে হাতে দস্তানা পরিয়ে দিতে হবে। অবস্থা বেশী খারাপ হলে প্রেডনিসোলোন বা বিটা ও ডেকস্ামেথাসোন ক্রীম লাগাতে ও বড়ি খেতে হবে।

রোগের নাম ঃ একজিমা

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ ছোট বাচ্চাদের গালে, বাহুতে এবং হাতে লালচে ধরণের ফুস্কুড়ি হয় ও তাতে পুঁজ হয় ও ফেটে গিয়ে পুঁজ বাইরে গড়িয়ে আসে। বড়দের সাধারণতঃ কনুই ও হাঁটুর পিছনে শুষ্ক বা রসযুক্ত হয়।

প্রতিরোধ ঃ সংক্রমণ থাকলে তার চিকিৎসা ঠান্ডাপট্টি। সূর্য্যের আলো এবং কর্টিকোষ্টেরয়েড ক্রীম ও বড়ি ব্যবহার করতে হবে।

রোগের নাম ঃ ধবল বা (ভিটিলিগো লিউকোডার্মা)

কারণ ঃ চামড়ার রং এর অভাব বা আধিক্য

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ কোন কোন লোকের শরীরের স্থানে স্থানে চামড়ার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে সে স্থানটি একেবারে সাদা হয়ে যায়। সাধারণতঃ হাত, পা, মুখমন্ডল এবং শরীরের উর্ধাঙ্গে এ অবস্থা বেশী দেখা যায়। কোনও কোনও ফাংগাস আক্রমণেও যেমন ছুঁলিতে সাদা দাগ হয়। কালো চামড়ার ছেলেমেয়েদের বেশী রৌদ্র লাগানোর ফলে মুখে সাদা দাগ হতে পারে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ঃ অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিওসোরোলেন বা সোরালিন বড়ি ও মলম ধবলে ব্যবহৃত হয়। বহুদিন চিকিৎসার দরকার হয়। ভিটামিন 'সি' টক ও ফল বারণ। আলট্রাভায়োলেট ও সকালের সূর্য্যরশ্মি ভাল। কৃমি থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

রোগের নাম ঃ গর্ভকালীন মুখের দাগ (মাস্ক অফ প্রেগনান্সি)

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ গর্ভকালীন সময়ে অনেক মহিলার মুখমন্ডলে, স্তনে ও তলপেটের একটু নীচে মধ্যস্থলে কালচে ধরণের দাগ হয়। কখনও কখনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এ উপসর্গ দূর হয়। গর্ভরোধকারী বড়ি ব্যবহারের ফলেও কারো কারো এ উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে।

প্রতিরোধ ঃ এর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

সূত্র ঃ WBVHA পুস্তিকা

সমষ্টি পরিকল্পনা
(Community Planning)

বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সমষ্টি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে রাখা দরকার। এই পরিকল্পনার মধ্যে সাবধানতার ব্যবস্থা থাকবে বলে নিশ্চিতভাবেই দুর্গতি কমানো যাবে। পরিকল্পনা তৈরি করার সময় সবার আগে ঠিক করতে হবে সম্ভাব্য দুর্গত অঞ্চলের তালিকা। সেই সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আগাম বিপদ সঙ্কেত দেবার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য জানান দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরিকল্পনায় মোট ৫টি স্তর রয়েছে।

স্তর	কী	কে	পদ্ধতি
১।	পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	সমষ্টি স্তর	গোষ্ঠী আলোচনা
২।	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	সমষ্টি স্তর	গোষ্ঠী আলোচনা
৩।	দুর্গত অঞ্চলের মানচিত্র	সমষ্টি স্তর	সামাজিক মানচিত্র
৪।	ঝুঁকির মানচিত্র	সমষ্টি স্তর	সামাজিক মানচিত্র
৫।	সুবিধা/ সুযোগ চিত্র	সমষ্টি স্তর	সামাজিক চিত্র

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

বন্যা ও ঘূর্ণীঝড়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করতে হবে। আগে কী ঘটেছিল, ব্যাপকতা কতটা ছিল, তার আগাম খবর ও সাবধানতা কতটা ছিল এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই তৈরি করতে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। এই সভায় থাকবেন তরুন স্বেচ্ছাসেবক, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি, টালির ঘর, পাকাঘর, পরিবার সংখ্যা এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কতজন বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, গর্ভবতী, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী রয়েছেন। তাছাড়া তালিকায় পুকুর, জলাশয়, পানীয় জলের উৎস, চিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল, নদী বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, টেলিফোন কেন্দ্র প্রভৃতির ঠিকানাসহ তালিকা তৈরি করতে হবে স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায়.

সুবিধা সুযোগ ঃ

জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বর্তমান সুযোগ সুবিধাগুলির সুনির্দ্দিষ্ট তালিকা আগে থেকে তৈরি করতে হবে।

চিহ্নিত করার বিষয় ঃ

- আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহারযোগ্য বাড়ি।
- ঘূর্ণীঝড় দেখা দিলে আশ্রয় নেওয়া যায় তেমন পাকা বাড়ি।
- গৃহপালিত পশুদের আশ্রয় নেবার মত উঁচু জায়গার নাম ঠিকানা।
- উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় যাবার পথ।
- বন্যা ও ঘূর্ণীঝড়ের সময় কাছে লাগবে তেমন হাসপাতালে, চিকিৎসা কেন্দ্র।

- তহবিল মজুত ও সংগ্রহ।
- স্বেচ্ছাসেবক তালিকা ও তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।

ঝুঁকি রয়েছে	কিভাবে ঝুঁকি কমানো যাবে
১। জেলে (মৎস্যজীবী)	• মৎস্যদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তালিকা তৈরি করা। • মৎস্যজীবীরা নদী বা সমুদ্রে যাবার আগে যেন লাইফবোট ও রেডিও সঙ্গে নিয়ে যান তা নিশ্চিত করতে হবে। • আতসবাজী, মশাল বা টর্চ দিয়ে সঙ্গেত জানানো।
২। চিংড়ি পোনা চাষী	• আগাম সঙ্কেত দেওয়া ও নিরাপদ স্থানে যাবার ব্যবস্থা।
৩। বিধবা ও একক মহিলা	• ভাল ঘর ও শিশুদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা
৪। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী	• স্থানান্তর করার ব্যবস্থা
৫। গর্ভবতী ও শিশু	• স্থানান্তরের সময় বিশেষ সতর্কতা
৬। সমুদ্রতীরে বসবাসকারী পরিবার	• বিপর্যয়ের সময় তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া। • স্বাভাবিক অবস্থায় নিরাপদ দূরত্বে বাড়ি তৈরি করা। • স্থানান্তরের জন্য জায়গা আগেই ঠিক করে রাখা।
৭। গরু, মোষ ও হাঁস-মুরগী	• উঁচু জায়গায় স্থানান্তর ও গোষ্ঠীবীমা করে রাখা।
৮। পারিবারিক সম্পদ	• গয়না, নগদ অর্থ ও দলিলপত্র জল নিরোধক কাগজে জড়িয়ে নিরাপদ বাক্সে রাখতে হবে।
৯। বাড়িঘর	• ঝড়বৃষ্টির আগেই বাড়িঘর মেরামত করা। • জিনিসপত্র, মজুদ শস্য, শুকনো মাছ, নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া। • নিরাপদ জায়গায় যাবার জন্য নৌকা।
১০। শস্য ও ফসলের খেত	• প্লাবিত অঞ্চলের উপযোগী ফসলের বীজ বোনা। • অল্প সময়ে তোলা যায় তেমন ফসলের চাষ। • ফসলের বীমা করে রাখা।
১১। দাহ্য বস্তু তথা পাম্প, তাঁত প্রভৃতি	• জীবন বীমা করন।
১২। গাছ গাছড়া	• নারকেল, তাল, খেঁজুর প্রভৃতি গাছ গ্রামে যে দিক দিয়ে ঝড় আসে সেদিকে লাগাতে হবে। এতে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যাবে।
১৩। জলের উৎস	• বন্যায় জলে সম্ভাব্য মাত্রার উপরে নলকূপের মুখ রাখতে হবে, যাতে জল দূষণ না ঘটে তার জন্য। • কূয়োর পাড় উঁচু করে বাঁধানো।

বিপর্যয় পূর্ব মূল্যায়ণ

এই প্রশ্ন পত্র ঘূর্ণীঝড় বা বন্যার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগেই তৈরি করে রাখা দরকার। তাহলে বিপর্যয়ের সময় উদ্ধার ও ত্রাণ এবং বিপর্যয়ের পরে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সহায়তা পাওয়া যাবে।

তারিখ—

তথ্য সংগ্রহকারী—

জেলা—

ব্লক—

গ্রামপঞ্চায়েত—

পরিবার সংখ্যা—

লোক সংখ্যা—

তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরের টিক (✓) দেবেন

সড়ক যোগাযোগ ঃ হ্যাঁ/না

নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দূরত্ব ঃ —————— কিমি

নাম ....

নিকটবর্তী মজুদ ভান্ডারের দূরত্ব ও নাম ঃ —————— কিমি

নাম ....

ক) গ্রামের সুযোগ সুবিধা

- দোকান/বাজার ঃ হ্যাঁ/না
- প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ হ্যাঁ/না
- সব ঋতুর উপযোগী রাস্তা ঃ হ্যাঁ/না
- ধর্মীয় স্থান ঃ হ্যাঁ/না
- নিরাপদ পানীয় জলের উৎস সংখ্যা—
- ট্রাকটর ঃ হ্যাঁ/না
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ হ্যাঁ/না
- সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী ঃ হ্যাঁ/না
- ধাত্রী/দাই ঃ হ্যাঁ/না
- অন্যান্য ....

(খ) সাধারণ প্রশ্নাবলী

- স্থায়ী চাকুরীজীবীর পরিবার সংখ্যা
  (সরকারী/পৌরকর্মী, শিক্ষক, নার্স প্রভৃতি)
- উপার্জনকারী পরিবার সংখ্যা
  (জেলে, হস্তশিল্পী, তাঁতি, ক্ষেতমজুর)
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ঃ
  (রেকর্ড না থাকলে হ্যাঁ/না টিক দিন)
- পাঁচ বছরের কমবয়সীদের মধ্যে অপুষ্টি বেড়েছে কিনা
  (সি এইচ ডব্লু তথ্য না থাকলে হ্যাঁ/না টিক দিন)
- গ্রামে গরু মোষের সংখ্যা—
- কতটি পরিবারে গরু/ মোষ নেই—?
- কত পরিবারে হাঁস/মুরগী/ ভেড়া/ছাগল/শুয়োর নেই ?
- বিগত ও বর্তমান বছরে বিক্রি হয়ে যাওয়া বা মৃত গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যা কত ?

সূত্র ঃ ভারত সরকারের কৃষি দপ্তর

<u>শিবির স্তরে পরিকল্পনা</u>

১। অবস্থান

২। শিবির প্রধান (নাম ও পদমর্যাদা)

৩। শিবিরের আওতাধীন গ্রাম

	গ্রাম	বিপদ (সম্ভাব্য)	জনসংখ্যা	সঙ্কেত জানাবার সময়
ক।	....	....	....	....
খ।	....	....	....	....
গ।	....	....	....	....
ঘ।	....	....	....	....
মোট—	....	....	....	....

৪। পাকাবাড়ি .... ঘরসংখ্যা ....

তাঁবু .... ধারণ ক্ষমতা ....

৫। উদ্ধারের ব্যবস্থাপনা

গ্রাম	সাঁতারু সংখ্যা	ট্রাক্টর	ট্রাক	নৌকা	মাইক হ্যাঁ/না
ক।	....	....	....	....	....
খ।	....	....	....	....	....
গ।	....	....	....	....	....
ঘ।	....	....	....	....	....

৬। খাদ্যের ব্যবস্থাপনা

ক) ভারপ্রাপ্ত (খ) রেশন দোকান

মজুদ খাদ্য গম/ময়দা/চাল/আটা

৭। ক) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

ক। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার

খ। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

গ। দূরত্ব .....

খ) মজুদ ওষুধ

ক্লোরিণ বড়ি ও আর এস প্যাকেট

অন্যান্য

৮। আলোর অবস্থা

৯। অন্যান্য গ্রাম সম্পর্কে তথ্য

গ্রাম	টেলিফোন	থানা	রাস্তা
ক।	....	....	....
খ।	....	....	....
গ।	....	....	....
ঘ।	....	....	....

১০। প্রাণী সম্পদ

গ্রাম	প্রাণীর সংখ্যা	এদের জন্য ব্যবস্থা
ক।	....	....
খ।	....	....
গ।	....	....
ঘ।	....	....

১১। সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা)

ক। তাবু

খ। খাদ্য

গ। ওষুধ

ঘ। আলো

ঙ। শ্রম

চ। জিপ/পরিবহণ (গাড়ি)

ছ। নৌকা

জ। প্রাণী/গৃহপালিত

ঝ। অন্যান্য

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ত্রাণ শিবির পরিচালনায় গ্রাম ভিত্তিক পরিকল্পনা

১। গ্রামের নাম   ২। জনসংখ্যা   ৩। হুসিয়ারীর সময়

৪। কে প্রথম হুসিয়ারী দেবেন   কাকে দেবেন

৫। গ্রামের দায়িত্বে কে আছেন,

৬। গ্রামের টিম

ক)

খ)

গ)

৭। অস্থায়ী শিবির

ক) অবস্থান   (সাধারণতঃ গ্রামেই অবস্থিত)

খ) ইনচার্জ

গ) ইনচার্জ টিম

১)

২)

৩)

৮। স্থায়ী শিবির

ক) অবস্থান   (সাধারণত গ্রামেই অবস্থিত)

খ) ইনচার্জ

গ) ইনচার্জ টিম

পরিবহণ

৯। অস্থায়ী শিবিরে

দূরত্ব   পদ্ধতি

১০। স্থায়ী শিবিরে

দূরত্ব   পদ্ধতি

১১। যানবাহন (ট্রাকটর)

১। গাড়ির মালিক ও তার ঠিকানা   গাড়ির নম্বর

২। ট্রাক

মালিকের নাম ও ঠিকানা   গাড়ির নম্বর

উদ্ধার ব্যবস্থা

১২। সাঁতারজানা লোক ঠিকানা/অঞ্চল

নাম

১৩। নৌকা ঠিকানা/অঞ্চল

মালিক

১৪। লাউড স্পীকার কার কার কাছে আছে

অবস্থান

অস্থায়ী শিবির ব্যবস্থাপনা

১৫। বাড়ি ঘরের সংখ্যা

১৬। বাড়ির দায়িত্বে রয়েছেন

১৭। খাদ্যের দায়িত্ব

১৮। পি ডি এস দোকানের অবস্থিতি

১৯। খাদ্য তৈরির (রান্না) ব্যবস্থা

২০। স্বাস্থ্যের দায়িত্ব

২১। কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দূরত্ব

২২। কাছের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র অবস্থান দূরত্ব

কী কী ওষুধ পাওয়া যায়

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে

২৩। আলোর ব্যবস্থা মোমবাতি /

২৪। অবস্থান দূরত্ব

২৫। কাছের পাকা রাস্তা

২৬। কাছের বেতার কেন্দ্র

২৭। কাছের টেলিফোন

২৮। কাছের থানা

২৯। কাছের বনাঞ্চল রক্ষক

৩০। গ্রামের পোষা পশু-পাখি এদের কোথায় পাঠানো যাবে।

৩১। এদের পরিচর্যা করা যাবে কোথায় ?

সূত্র ঃ ভারত সরকারের কৃষি দপ্তর প্রকাশিত জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বই থেকে।

গ্রামস্তরে বিপর্যয়ের প্রয়োজনীয় তালিকা
(Community Contengencies List)

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাসেবীদের ৫ থেকে ১০ জনের গোষ্ঠীকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই সব দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে আগাম প্রচার। উদ্ধার ও ত্রাণ প্রভৃতি।

সক্রিয় গোষ্ঠী	বিপর্যয় পরিস্থিতি ও তাতে সাড়া দেওয়া		
	প্রাক বিপর্যয়	বিপর্যয়কালে	বিপর্যয়ের পরে
হুসিয়ারী	✔	✔	✔
আশ্রয় শিবির ব্যবস্থাপনা	✔	✔	✔
উদ্ধার ও তদারকী	✔	✔	✔
প্রাথমিক চিকিৎসা	✔	✔	✔
জল ও সেনিটেশন	✔	✔	✔
মৃতদেহ সৎকার গোষ্ঠী			✔
পরামর্শদান গোষ্ঠী			✔
ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ			✔
ত্রাণে সমন্বয়	✔	✔	✔
পুনর্বাসন		✔	✔

হুসিয়ারী গোষ্ঠী ঃ (ক) গ্রামের তরুনদের নিয়ে গঠিত এই গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং তারা রেডিও বা টিভি থেকে পাওয়া হুসিয়ারির প্রতি নজর রাখবে ও সকলকে তা জানিয়ে দেবে।

(ক) ঘূর্ণীঝড় ও বন্যার আগে সারাদিন এরা দূরদর্শন ও রেডিওর প্রচারের প্রতি লক্ষ রাখবে। খোঁজ খবর নেওয়া ও তা সকলকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা আগে থেকে তৈরি থাকবে ও সেই মত নিজেরাও প্রয়োজনীয় যানবাহন সংগ্রহ করে রাখবে।

(খ) বন্যা ও ঘূর্ণীঝড়ের সময় ঃ রেডিও বা টিভি থেকে পাওয়া খবর যাচাই করে নেবে। গ্রামের সবাইকে বিশেষভাবে সম্ভাব্য বিপদ ঘরবাড়ির অধিবাসীদের তা জানাবে। জরুরী আশ্রয়ের জন্য যে সব বাড়ি চিহ্নিত হয়েছিল দেখবে, যোগাযোগ করবে এবং তাদের বিষয় জানিয়ে দেবে।

(গ) ঘূর্ণী ঝড় / বন্যার পরে ঃ ঘূর্ণীঝড়ের গতি প্রকৃতির দিকে নজর রাখবে। সরকারি ও পঞ্চায়েত অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরবর্তী স্তরের গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে করনীয় বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। আশ্রয় দাতা ও উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ রাখবে।

আশ্রয়স্থল/শিবির পরিচালনা গোষ্ঠী ঃ

অস্থায়ী আশ্রয় স্থল বা শিবির পরিচালনায় একটি কমিটি গঠিত হবে চেষ্টা করা হবে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়ে ঐ কমিটি গঠন করার। এই কমিটিতে মহিলা, অঙ্গন ওয়ারি কর্মী। স্বাস্থ্যকর্মীদের রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এই কমিটি শরণার্থীদের খাদ্য, জল, সেনিটেশনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বলা বাহুল্য মূল আশ্রয়স্থল বা শিবিরকে অস্থায়ী বাসোপযোগী করবেন তারাই। তবে, সেটা যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় তাও তারাই দেখবেন। অন্যদিকে এরাই সরকারি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে খাদ্য, পুষ্টি, ওষুধপত্র যাতে বিপন্ন শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও ও প্রসুতিরা পায় সে দিকটিও দেখবেন।

বন্যা ও ঘূর্ণীঝড়ের আগে ঃ

এই কমিটি বন্যা ও ঘূর্নী ঝড়প্রবণ অঞ্চলে সম্ভাব্য বিপন্নদের জন্য আশ্রয়স্থল প্রকৃত বিপর্যয় শুরু হবার আগেই দেখেশুনে রাখবে। প্রয়োজনে মেরামতও করবে।

অন্তত এক সপ্তাহ চলতে পারে তেমন খাদ্য, জ্বালানী, জল, বাসনপত্র, ওষুধ, দুধের গুড়ো, মোমবাতি, কেরোসিন, দেয়াশলাই প্রভৃতি বিপর্যয়ের আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

সেনিটারি ব্যবস্থা যথেষ্ট ভাল হয় তা দেখবে এবং মহিলাদের জন্য অবশ্যই আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

বিপর্যয় চলাকালে ঃ

বিপর্যয় চলাকালে, শুরুতেই সংগৃহীত ও মজুদ ত্রাণের যাবতীয় সামগ্রী শিবিরে পৌঁছে দিতে হবে। উদ্ধার করে আনা বা নিজে থেকে আসা শরণার্থীদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। আলোর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে শৌরশক্তি চালিত আলোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিবিরবাসী শিশু, গর্ভবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অসুস্থদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। শিবিরে সব শরণার্থীর নাম লিখে নিতে হবে। সেনিটেশন প্রভৃতি ঠিক থাকছে কিনা দেখতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যাতে কোন আশ্রয় প্রার্থী ঝড় জল থাকতে শিবির ছেড়ে না যান।

বিপর্যয় শেষ হয়ে গেলে ঃ

বিপর্যয় বন্ধ হলে ও কমিটির কাজ শেষ হয়ে যায় না। তখন ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যক শরণার্থী বাড়ি ফিরে যেতে শুরু করে। তখন দেখতে হবে তাদের নিজ নিজ বাড়ি বাসোপযোগী হয়েছে কিনা। তখনও অনেকের ত্রাণের প্রয়োজন থেকে যায়। তাই, শিবির কেন্দ্র থেকেই ত্রাণ বন্টন ও পুণর্বাসন ব্যবস্থার তদারকী করতে হবে। চিকিৎসা ও ওষুধের যোগান তখনও অব্যাহত রাখতে হবে। প্রত্যেক বিপর্যস্ত মানুষের

জলের উৎসগুলি ক্লোরিন দিয়ে জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া পুনর্বাসনের প্রধান বিষয়, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও ক্ষতিপূরণে এই গোষ্ঠীকেই উদ্যোগী হতে হবে।

বলা বাহুল্য বিপর্যয় বন্ধ হয়ে গেলেও, এমন কি পুনর্বাসনের পরেই স্বাভাবিক অবস্থার কাজ আবার শুরু করতে হবে। অর্থাৎ সম্ভাব্য পরবর্তী বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি তখনই শুরু করতে হবে। প্রয়োজনে গোষ্ঠীর পুনর্গঠনও করে নেওয়া যেতে পারে।

উদ্ধার ও শিবিরে স্থানান্তর গোষ্ঠী ঃ

ঘূর্ণীঝড় বা বন্যা যাই হোক না কেন বিপর্যস্ত মানুষ বহু ক্ষেত্রেই ঝড়-জলে বা ভাঙ্গা বাড়িতে আটকে পড়েন, এদের খাদ্য ও পানীয়জল জোটে না। তা ছাড়া প্রকৃতির রুদ্ররোশতো আছেই। তাই এসময়ে তাদের প্রথম প্রয়োজন হল উদ্ধার হওয়া বা বেঁচে যাবার প্রথম ধাপে পা রাখা। এদের উদ্ধার করার জন্য দরকার দক্ষ ও সবল স্বেচ্ছাসেবক। স্বাভাবিক ভাবেই এদের বাছাই করতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এই বয়সে থাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সামর্থ। এদের হওয়া দরকার স্থানীয় এবং তাদের অসামরিক প্রতিরক্ষাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী বা জাতীয়রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভাল হয়।

প্রাক্ প্রস্তুতি ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ বিপর্যয় শুরু হবার আগেই স্থানীয় অঞ্চলের কে কোথায় থাকে, কে কে মাছ ধরতে যায়, কার কার বাড়িঘর বিপন্ন তার খোঁজ রাখতে হবে। সেই সঙ্গে গুছিয়ে রাখতে হবে উদ্ধারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পরিবহনের জন্য যানবাহন, জানতে হবে উদ্ধার করা লোকদের কোন পথে সহজে আশ্রয়স্থলে বা আহতদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যাবে। ঘরের পোষা পশু-পাখিদের কোন কোন উঁচু জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে।

বিপর্যয়ের সময়ে বা বিপর্যয় শুরু হলে দ্রুত উদ্ধার কাজে নেমে পড়তে হবে। সবার আগে নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া লোকদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরেই অন্যান্য বিপর্যস্তদের উদ্ধার করতে হবে। কোথাও বা গাছ কেটে বা দরজা ভেঙ্গেও উদ্ধার করতে হবে। এই সব কাজে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আগেই প্রস্তুত থাকবে। সব কাজটাই করতে হবে শৃঙ্খলার সঙ্গে। বলাবাহুল্য ঘরের পশুপাখিদের আগেই বাঁধন মুক্ত করে দিতে হবে।

বিপর্যয়ের পরে ঃ বিপর্যয়ের চরম অবস্থা শেষ হতেই কর্মীরা সমগ্র অঞ্চল ঘুরে দেখবেন, তখনও কেউ আটকে রয়েছে কিনা বা অসুস্থ কেউ বিনা চিকিৎসায় আছে কিনা। এদের উদ্ধার করে আশ্রয় শিবির বা চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠাতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে হবে। তখনও যদি কেউ নিখোঁজ থাকে তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করে সরকারিদপ্তর ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পুনর্বাসনে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরবর্তী চিকিৎসা গোষ্ঠী ঃ

পুরুষ ও মহিলা কর্মী, সম্ভব হলে আগেকার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও দক্ষকর্মীদের এই গোষ্ঠীতে রাখতে হবে। সম্ভব মত দাই এবং অঙ্গন ওয়ারি কর্মীদেরও এই সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এদের কাজ হবে স্বাস্থ্যরক্ষায় চিকিৎসা ও সেনিটেশনের ব্যবস্থা করা।

বিপর্যয় শুরু হবার আগে থেকেই এই গোষ্ঠীকে নিজেদের তৈরি হতে হবে বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসাবে তাদের গর্ভবতী, প্রসুতি, শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের তালিকা তৈরি করতে হবে, এদের ব্যক্তিগত অবস্থা উল্লেখ করে। ফার্স্ট এড-বক্স, জল শোধনের ওষুধ, ব্যান্ডেজ, ও আর এস, জরুরী প্রসব করানোর সরঞ্জাম, পরিষ্কার কাপড়। সাধারণ ও জরুরী ওষুধ জোগাড় করে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে অসুস্থদের স্থানান্তরের জন্য স্ট্রেচার ও গাড়ি রাখতে হবে।

বিপর্যয়কালে ঃ

সংগৃহীত ও ওষুধপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র শিবিরে পৌঁছে দিতে হবে। ঝড়-বন্যা শুরু হয়ে গেলে কেউ যেন বাইরে না যান তা দেখতে হবে। শরণার্থীদের চিকিৎসার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

বিপর্যয়ের পরে ঃ আহত বা অসুস্থদের চিকিৎসার দিকে লক্ষ্য রাখবে। দরকারি ওষুধ পত্রের সরবরাহ ঠিক থাকছে কিনা দেখবে। . ডাক্তার নার্সদের কাছে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক রোগীদের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে স্থানান্তর ও রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করবে।

সেনিটেশান গোষ্ঠী ঃ মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে গঠিত এই গোষ্ঠী আশ্রয় স্থল ও বাইরে, সব সময় যাতে সেনিটেশন বজায় থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।

বিপর্যয়ের আগে তাদের স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বেশি পরিমাণে ব্লিচিং পাউডার সংগ্রহ করে রাখতে হবে। জল পরীক্ষার কিট বা থলে সংগ্রহ করে রাখবে এবং দেখবে অঞ্চলের জলের উৎসগুলি যেন দুষিত না হয় বা দুষিত হলে ও ঠিক সময়ে তার প্রতিবিধান করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে আগেই।

ঝড়বন্যা চলাকালে ঃ

শরণার্থী শিবিরে আসতে শুরু করলেই উপযুক্ত সেনিটেশনের ব্যবস্থাও করে ফেলতে হবে।

বিপর্যয়ের পরে ঃ বিপর্যয় থেমে গেলে এই গোষ্ঠীর কাজকর্ম আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কারণ তখন সমগ্র অঞ্চলের সেনিটেশনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নলকূপ, কুয়ো, পুকুর প্রভৃতির জল দূষণ দূর করার জন্য ক্লোরিন দেওয়া, জল পরীক্ষা করা

সঙ্গে সঙ্গে জমে থাকা বাড়তি জল নিকাশের ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখতে হবে সাপ বা ঐ জাতীয় কোন প্রাণী কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা।

ত্রাণ বন্টন গোষ্ঠী ঃ

ত্রাণ সামগ্রী তথা খাদ্য, বাসনপত্র, কাপড়, কেরোসিন ও জ্বালানী এবং গাড়ি চালানোর প্রয়োজনীয় তেল সংগ্রহ করবে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তা বন্টন করবে। সেই সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

বিপর্যয়ের আগে ঃ দুর্গতিপ্রবণ অঞ্চলের জন্য এই কমিটি সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় অনেক আগে থেকে সরকার ও অন্যান্য উৎস থেকে জলের পাউস/ বোতল, শিশুখাদ্য, খাদশস্য, ওষুধ, টর্চ, হ্যারিকেন, কেরোসনি, সৌরশক্তিচালিত আলো ও উনুন, জ্বালানী প্রভৃতি সংগ্রহ করে রাখবে।

অস্থায়ী শিবির তৈরিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তথা, বাঁশ, দড়ি, ত্রিপল, প্রভৃতি সংগ্রহ করে রাখবে। সেই সঙ্গে কত লোককে তাদের পক্ষে আশ্রয় ও ত্রাণ দেওয়া সম্ভব হবে তারও আগে থেকেই ঠিক তার রাখতে হবে।

বিপর্যয় কালে এই গোষ্ঠীই নিজেদের গুদাম অথবা সরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী ভান্ডার থেকে ত্রাণ সামগ্রী সংশ্লিষ্ট শিবিরগুলিতে পৌঁছে দেবে। সেই সঙ্গে নিজেদের সম্পদ ও পরবর্তী প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নতুন করে সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে।

বিপর্যয়ের পরে ও ত্রাণ বন্টনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ, তখনও মানুষজন তথা দুর্গত মানুষকে ত্রাণের ওপর নির্ভর করেই বাঁচতে হবে, দেখতে হবে দুর্গত মানুষ সরকারি কর্মকর্তারা যাতে দুর্গত মানুষকে পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

তার পরেই আবার পরবর্তী সম্ভাব্য বিপর্যয়ের মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

অন্যান্য গোষ্ঠী ঃ

উপরে যে সব গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে তা সব অঞ্চলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব নানা সমস্যা থাকতে পারে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজেদের উপযোগী গোষ্ঠী গঠন করবেন সেখানকার চাহিদা অনুসারে। আগে থেকে সেগুলি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবু, বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েকটি কমিটির কথা এখানে বলা হচ্ছে।

পাহারাদারী গোষ্ঠী কমিটি ঃ

দুর্গত মানুষ শিবিরে আশ্রয় নিলেও তাদের সব সম্পদ আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তখন এই অনুপস্থিতির সুযোগে দুষ্কৃতিরা জিনিসপত্র, ফল, সবজি বা অন্য কিছু চুরি করতে পারে। সেই সময় পাহারাদারীর জন্য একটি গোষ্ঠী গঠন করার দরকার হয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠীর সদস্য মাঝে মাঝে অঞ্চলে ঘুরে সে বিষয়ে তদারকী করবে।

সংযোগ রক্ষাকারী গোষ্ঠীর কাজ হবে দুর্গত মানুষদের অবস্থা সম্পর্কে সরকারি কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত অবস্থা জানান এবং সেখান থেকে পাওয়া তথ্য শিবিরবাসীদের জানানো।

ব্যক্তি ও পরিবারের ভূমিকা ও দায়িত্ব ঃ

এতক্ষণ ঘূর্ণীঝড় ও বন্যার জন্য বিপর্যয়ে সমাজ ও সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন আলোচনা করা হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের কী ভূমিকা হওয়া উচিত এবং তাদের দায়িত্বই বা কী তা নিয়ে। ঘূর্ণীঝড় বা বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে সাধারণত যখন বন্যা বা ঘূর্ণীঝড় হয়ে থাকে তাঁর অন্তত মাস খানেক আগে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী এলাকার অধিবাসীদের নিয়ে সভায় বসে আলোচনা করবে। ঐ সভায় আলোচনা করা হবে বিপর্যয়ের সময়ে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে। অংশগ্রহণ করতে হবে পরিকল্পনা তৈরি ও তা রূপায়ণ উভয় ক্ষেত্রেই। গোষ্ঠী কী করতে চায় সে কথা নিয়েও ঐ সভায় খোলাখুলি আলোচনা হবে।

বিপর্যয় শুরু হবার আগেই প্রত্যেক পরিবার তার নিজ নিজ বাড়ি মেরামত করবেন ঝড়-বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। বিপর্যয়ের সময় উপার্জনের ব্যবস্থা, সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলে যাবার সহজ পথ ঠিক করে রাখা এবং ঘরের দামী জিনিসপত্র নির্ভরযোগ্য বাড়িতে রাখবার ব্যবস্থা করা।

ঝড়-জলের সময় ঃ ঘরে চালা বেঁধে, ভারী ও কঠিন জিনিস পত্রগুলি উপর থেকে নামিয়ে রাখতে হবে। ঝড়ে সেগুলি পড়ে গেলে আঘাত লাগতে পারে। দামী জিনিসপত্র, খাদ্যশস্যের বস্তা, শুকনো মাছ নিরাপদে থাকার মত বাড়িতে রেখে আসতে হবে। জাল, তাঁত বা পাম্পসেটের মত মূল্যবান দ্রব্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে জরুরী প্রয়োজনের সময় লাগতে পারে যেমন—দিয়াশলাই, মোমবাতি, হ্যারিকেন, টর্চ, ব্যাটারী প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে এবং অন্যবাড়িতে রক্ষিত সামগ্রীর তালিকা ও দলিলপত্র নিয়ে অস্থায়ী শিবিরে চলে যেতে হবে। প্রবল ঝড় বৃষ্টি চলতে থাকলে ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। গরু, হাঁস, মুরগী নিরাপদ জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করা না গেলে বাঁধন খুলে দিতে হবে।

বিপর্যয়ের পরে ঃ

উদ্ধার ও ত্রাণে যুক্ত গোষ্ঠীগুলির নির্দেশমত চলতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে রান্না ও সবাইকে খেতে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই সেনিটেশন ও অন্যদের উদ্ধারের কাছে সাহায্য করতে হবে। সমষ্টির সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের ওপর তাই, এই সময় ব্যক্তিগত ও পরিবারের অন্যদের স্বাস্থ্যসম্মত কাজের প্রতি নজর দিতে হবে।

বিপর্যয়ের পরে অর্থাৎ দুর্যোগ কেটে গেলে সবারই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। তবে তার আগে সেখানকার জঞ্জাল পরিষ্কার করা এবং ঘরবাড়ি মেরামত করে নিতে হবে। এই জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ঋণ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিপর্যয় পরবর্তী পরিকল্পনা
(Post Disaster Planning)

পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন ঃ

ঘূর্ণীঝড় ও বন্যার ঠিক পরেই পুনরুদ্ধার, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের বড় দায়িত্ব এসে পড়ে। এটা সম্পূর্ণ করতে হবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার আগেই। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় বিভিন্ন গোষ্ঠী এই কাজ শুরু করবে।

মৃতদেহ সৎকার গোষ্ঠী ঃ

যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেই মানুষ, গৃহপালিত পশু বা রাস্তার বেওয়ারিশ প্রাণী মারা যায় এবং যেখানে সেখানে পড়ে থাকে। এদের মধ্যে অনেকগুলি পচে গিয়ে পরিবেশ দূষনের কারণ হয়ে যায়। এগুলিকে যথাযোগ্যভাবে সৎকার করতে হবে। এজন্য কর্মীদের মানসিক প্রস্তুতি, দৈহিক সামর্থ ও সামাজিক কর্তব্যবোধ থাকতে হবে এবং আগেই তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই কাজে অসামরিক প্রতিরক্ষাকর্মী, এন এস এস/ এন সি সি, বয়েজ স্কাউট প্রভৃতির সাহায্য যথেষ্ট কাজে লাগে।

দেহগুলিতে ঢেকে ফেলার জন্য কাপড়, দুর্গন্ধ নষ্ট করার উপযোগী কেরোসিন ও জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হবে। মৃত মানুষদের চিহ্নিত করার জন্য পরিবারগুলিকে সুযোগ দিতে হবে এবং সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা অনুসারে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। বলাবাহুল্য, পড়ে থাকার জায়গাকে মৃতদেহ সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু মুক্ত করতে হবে। FIR করতে হবে থানাতে।

পরামর্শদাতা গোষ্ঠী ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবকিছু হারিয়ে গেলে বা পরিজন কেউ মারা গেলে মানুষ মানসিক দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ে। তখন এমন পরামর্শ বা সান্ত্বনা দেওয়া ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরতে সাহায্য করতে পরামর্শদাতা গোষ্ঠী দরকার। এই কাজে সুদক্ষ, ধৈর্য্যশীল ও সংবেদনশীল লোক দরকার। তারা পরামর্শ দেবার সঙ্গে বেঁচে থাকার উপযোগী, খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দেবেন।

ক্ষয়ক্ষতি নিরুপক গোষ্ঠী এমন লোকদের নিয়ে গটন করতে হবে, যারা লেখাপড়া জানেন। বিপর্যয়ের আগের মাসগুলিতে এরা সমগ্র গ্রামের তথা গ্রামবাসীদের নামের (পরিবার) তালিকা তৈরি করবেন। এই তালিকায় পারিবারিক আয়, সম্পদ ও স্থায়ী সম্পদ তথা ঘরবাড়ি ও জায়গা জমি ইত্যাদির বিবরণ লেখা থাকবে। ফলে বিপর্যয়ের পরে ক্ষতিপূরণের দাবির সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যাবে।

ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে, মানুষজনের মৃত্যু, সম্পত্তি নষ্ট (ফসল, নৌকা, উদ্যান, পশুপাখি প্রভৃতি) সমষ্টিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি এবং গোষ্ঠীর অনুমান মিলিয়ে নিতে হবে। সেই সঙ্গে সড়ক, জল, সরবরাহ ব্যবস্থা, বাজার, বিদ্যুৎব্যবস্থা ও বন্টন ব্যবস্থার কী কী ক্ষতি হয়েছে তার ও বিবরণ তৈরি করতে হবে।

পুনর্বাসন সহায়তা ঃ

ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণে সরকারি ব্যবস্থা যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

প্রতিটি পরিবারকে তাদের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত দাবিপত্র পেশের জন্য কাগজপত্র তৈরিতে সাহায্য করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হলে "ডেথ সার্টিফিকেট" সংগ্রহ, বীমার টাকা পাওয়ার জন্যও সাহায্য করতে হবে। এই সব কাগজপত্র যাতে যথাসময়ে সরকারি দপ্তরে পৌঁছায় এবং তার একপ্রস্ত নকল নিজের কাছে থাকে তার জন্য সাহায্য করতে হবে।

পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন গোষ্ঠী ঃ

এই গোষ্ঠী বিপর্যয় পরবর্তীকালে ঘরবাড়ি বা বিদ্যালয়, সাধারণের ব্যবহৃত স্থান পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনে সহায়তা করবে। এই কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকেদের নিয়ে পরিকল্পনা তৈরির কাজ সেরে ফেলতে হবে। এই কাজে সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা অবশ্যই চাই। তাই কিভাবে সেই সাহায্য পাওয়া যাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হবার জন্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ, ঘরবাড়ি পূনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে সাহায্য করবে।

এই পর্যায়ে ও শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রসূতি ও গর্ভবতীদের ত্রাণের কাজ চালিয়ে যেতে হবে অন্যদিকে "ফুড ফর ওয়ার্ক" প্রভৃতি সরকারি কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজ করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও সরকারিকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

ব্যক্তি ও পরিবারের ভূমিকা ঃ

পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন প্রকল্প কখনোই ব্যক্তি ও পরিবারের সহযোগিতা ও সাহায্য ছাড়া পূর্ণতা পেতে পারে না। এ বিষয়টি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষদের জানিয়ে দিতে হবে।

এ পর্যায়ে পরিবারগুলিকে, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ ও গোষ্ঠীকে যে সব ব্যক্তি, বিশেষভাবে যারা মানসিক দিকে থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাদের নাম জানান। ঘরবাড়ি মেরামত বা পুননির্মাণে নিজেদের উদ্যোগী হওয়া।

ঋণ পাবার জন্য দলিলপত্র (ব্যাঙ্ক, বীমা, জমি) সব গুছিয়ে রাখতে হবে। তবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে বিপদে পড়ে জমি, গরু-বাছুর বিক্রি করতে না হয়।

মহড়া ঃ

পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলে তা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মানুষদের জানাতে হবে এবং তার কপি সরকারি দপ্তর ও পঞ্চায়েত যে দিতে হবে। এই ভাবে যে কোন বিপর্যয় পরবর্তী পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনে সাধারণ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পঞ্চায়েত, সরকারি, উদ্যোগকে একত্রিত করতে পারলে সাফল্য পাওয়া যাবেই।

সহভাগী পরিকল্পনা
(Participatory planning)

প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে চলে, এই চলার পথেই রয়েছে শৃঙ্খলা ও সম্পদ এবং বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়। এই স্বাভাবিক অবস্থাকে মেনে নিয়ে, কাজে লাগিয়ে আমাদের চলতে হয়। এক কথায় বলতে গেলে বিপর্যয়কে সঙ্গে নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। এই বেঁচে থাকার পথ ও পদ্ধতি জেনে, বুঝে চলতে পারলে একদিকে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে, জীবন হানি কমবে এবং এবং কমবে দুর্গতিও। এটাই হল বিপর্যয় মোকাবিলা। আর এর কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এরাই বেঁচে থাকে, বাঁচায় মানুষ ও সম্পদ।

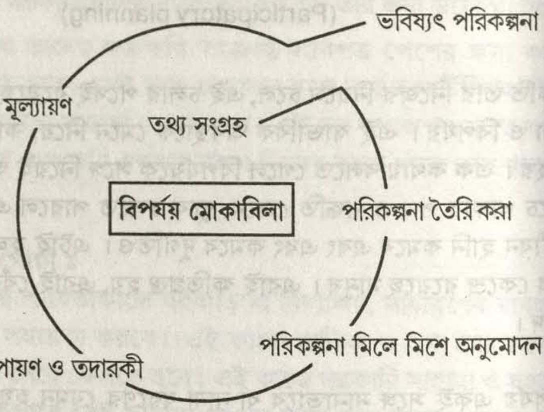
বিপর্যয় একই সঙ্গে নানাভাবে বা নানা ধরণের যেমন হয় না, তেমনি এমন সব নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে যেখানে ঘুরে ফিরে বার বার বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয় হতে পারে এবং হয়েও থাকে। এর যেমন ভূগোল আছে, তেমনি আছে ইতিহাস। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ মানুষ এই দুটোই জানেন। এদের কাছ থেকে জেনে, হাতে কলমে শিখে, আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বেঁচে থাকা যায়। এই জানা ও শেখার ক্ষেত্রে মিলেমিশে শেখা ও কাজ করায় সাফল্য পাওয়া যায় বেশি। এটাই হল "করতে করতে শেখা ও শিখতে শিখতে করা।" একেই বলে সহভাগী পরিকল্পনা বা PLA তথা "অংশগ্রহণ কর, শেখ ও কাজে প্রয়োগ কর" (Participate, Learn and Act)।

কোন মানুষই সবকিছু জানেন না বা জানা সম্ভব না। এক সঙ্গে কাজে লাগার পরিকল্পনা করলে একে অপরের জানা ও অজানাকে ভাগাভাগী করে নিতে পারে। এই ভাবে পারস্পরিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে যে পরিকল্পনা নেওয়া হবে তা নিশ্চিতভাবেই অন্য যে কোন পরিকল্পনা থেকে ভাল হবে। এতে একদিকে যেমন কাজটা সুশৃঙ্খল হবে, তেমনি অন্যদিকে তাতে সাফল্যও বেশি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ও পরে জীবন ও সম্পদহানি এবং দুর্গতি হবে কম।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জীবনচক্র বিশ্লেষণ করলে চারটি মূল পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল—১। নীরব (শান্ত) অবস্থা। যখন বিপর্যয় থাকে না তো বটেই, এমন কি অদূর ভবিষ্যতে বিপর্যয় আসতে পারে বা আসছে তেমন সম্ভাবনা ও দেখা যায় না। ২। প্রাক বিপর্যয় কাল, ৩। বিপর্যয় চলাকালিন সময়, ৪। বিপর্যয়ের পরে।

তাই নীরব সময়ে পরিকল্পনাটা করে রাখতে পারলে, মিলেমিশে আলোচনা সেরে রাখলে সব দিক থেকেই সুফল পাওয়া যাবে।

একে সাজিয়ে লিখলে অবস্থাটা হবে এরকম ঃ



ঐ পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হবে সঠিক সংগঠন, কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে অবশ্যই বিপন্নতাকে কমানো যায়। আত্মবিশ্বাস থাকলে একদিকে বিপর্যয় মোকাবিলা করা সহজ হয়, অন্যদিকে মানুষের দুর্গতি কমানো যায়। এই আত্মবিশ্বাস শুধু নিজের থাকলে হবে না, এটা অন্যদের মধ্যেও জাগিয়ে তুলতে হবে। এটা করতে হবে বিপর্যয় ঘাড়ে এসে পড়বার আগেই।

তাই, বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য দরকার ঃ—

স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ, স্থানীয় মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যবহার, স্থানীয় সম্পদ ও সামর্থের সঠিক মূল্যায়ণ ও সঠিক ব্যবহার। স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ পরিকল্পনা, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ও তাদের রূপায়ণ স্তরে তদারকী ও মূল্যায়ণ।

পরিকল্পনা তৈরির সময়ই বিভিন্ন স্তরের কাজগুলি নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব বন্টন করে দিতে হবে, এর মধ্যে প্রথমেই নির্দিষ্ট করতে হবে কোন কোন অঞ্চল বিপর্যয় প্রবণ, এটা চিহ্নিত করতে হবে অভিজ্ঞতা সংকলন করে। এই সঙ্গেই দুর্গত মানুষের আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করা, সেখানে মানুষজন নিয়ে যাবার পথ ও পদ্ধতি ঠিক করা, তাঁদের বাসস্থান ও খাদ্য, সেনিটেশন চিকিৎসা ও পড়াশুনা চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া প্রভৃতি। পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ বিপর্যয় থেমে গেলে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে শিবিরবাসীদের নিজ নিজ বাড়িতে যাবার পরিবেশ তৈরি করা ও তাঁদের পাঠানো ও পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা। এটা পুনর্বাসনের অঙ্গ হলেও বাড়িঘর বিদ্ধস্ত মানুষের প্রকৃত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার পরবর্তী বা সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য তৈরি হও। সংক্ষেপে বলা যায়—"জোট বাঁধো তৈরি থাকো, কোমর বেঁধে কাছে লাগো।"

(সূত্র ঃ দেবব্রত বসুর নিবন্ধ)

APPENDIX — I

Checklist of relief equipment and supplies

- Collecting bag
- Collecting forms
- Mouth or battery powered aspirator
- Tea-strainer, flashlight and spare batteries
- Grease pencil
- Memo pad
- Sweep pad
- Pencil
- Tweezers
- White ink enamelled dipper
- Keys and other references
- Labels
- CDS light traps
- Collecting vials
- Bulb syringe or medicine dropper
- Fly grill mirror
- Scissors
- Gloves
- Snap traps
- Plastic cups

Medical checklist

- Equipment for paediatric intravenous use
- Assorted ferrules
- Tracheal cannulae
- Set of laryngoscopes for infants, children and adults
- Endotracheal tubes, No. Murphy
- Endotracheal tubes, No.
- Nasogastric probes
- Oxygen masks for adult and children
- Large scissors for cutting bandages
- Plastic lining
- Phonendoscopes

Sterilisation supplies

- Trachectomy set
- Thorachotomy set
- Venous dissection set
- Set of small sutures
- Bottles for drainage of thorax
- Hand scissors, no. 4
- Disposable syringes-2 cc, 10cc, 50 cc

Supplies for a population of 1,000

- Powder sprayer
- Hand-pressured sprayer, capacity of 20-30 litres
- Duster
- Space sprayer
- Insecticides:
  - * DDT, technical power — 0.5 tons
  - * DDT, 75% water-soluble — 1-2 tons
  - * DDT, 10% powder — 1 ton
  - * Dieldrin, 0.625-1.25% emulsifiable concentrates — 100 kg
  - * Lindane, 0.5% emulsifiable concentrates — 100 kg
  - * Chlordane, 2% emulsifiable concentrates — 100 kg
  - * Malathion, 1% emulsifiable concentrates — 100 kg
  - * Dichlorovos emulsion — 100 litres
  - * Rodent traps — 100
  - * Rodenticides, anticoagulants type i.e. warfarin — 1-2 kg
- Screen for fly control, 10 rolls
- Garbage cans, capacity 50-100 litres 300-500

Ambulance fleet

- The ambulances should carry the following equipment:
  - * Oxygen, oxygen mask, manometer
  - * Stretches and blankets
  - * Emergency first aid kit
  - * Suction equipment
  - * Supplies for immobilising fractures
  - * Venoclysis equipment
  - * Drugs for emergency use
  - * Minimal equipment for resuscitation maneuvers

Electricity

- Cables
- Poles
- Pulley blocks

- Shovels
- Concrete pans
- Gunny bags
- Cane baskets
- Generator
- Fuses
- Torch
- Candle
- Ropes
- Cement bags
- Axes
- Crosscut saws
- Chains and fightening wrenches
- Cable cutters
- Spanners
- Hand gloves

Water supply

A rough list of sanitation equipment and supplies required to meet the needs of 10,000 people is given below:

WORK EQUIPMENT

* Comparator for chlorine residual and pH, together with orthotolidine and pH indicator solution
* Thermometer, 0-100'C with protective casing
* Tape measures, cloth or metal, 30m, graduated in m and cm
* Tape measure, metal, pocket size, 2m
* Standard household measuring cup, 500 ml
* Clip board
* Flashlight with spare batteries and bulbs
* Magnifying glass, 5x to 20x
* Collection vials
* Felt-up marking pen ink
* Pocket compass, with plastic case
* Pump rod
* Spirit level
* Mosquito larvae dipper
* Aspirator with stoppage tubes, for collecting mosquitoes
* Kit for membrance filter for water testing water pressure gauge, positive and negative pressure
* Hand level
* Rapid phosphate determination kit
* Drawing board and instruments

Sanitation equipment

- Mobile chlorinator, mounted on truck or trailer with liquid chlorine cylinder
- Mobile hypo chlorinator with solution tanks, hose and accessories
- Mobile water purification unit with a capacity of 200-250 litres/min
- Tank trucks for water, capacity of 7 m3
- Portable elevated storage tanks with supporting tanks with supporting elements and accessories
- Well-driving equipment and well points
- Hand operated pumps for water capacity of 15-20 litres/min
- Electric or diesel driven pumps, capacity of 200-250 litres/min
- Pipes (cast iron, galvanised, asbestos cement) diameter 1.25-10 cm, with valves and fittings
- Chlorinated lime (25-30%), stored in a cool, dry place and renewed every 6 months
- Calcium hypo chlorine (60-70%), in power or granute form, stored in a cool, dry place and renewed every 2 years
- Alum, ferric chloride, and other chemicals for water treatment
- Masonry tools
- Carpentry tools
- Truck mounted generators

For waste water, sewage and execreta disposal

- Mobile mud pump
- Sludge pump (non-clogging diaphragm or other type)
- Sludge tank trucks, capacity of 7 ml
- Mobile repair shop with necessary tools and equipment, masks, boots, working gloves, excavation tools, etc
- Pipes with joining materials, diameter of 10-30 cm

- Moulds (iron / wood) for concrete pipes and slabs
- Timber, bamboo mats, nails, etc

CHECKLISTS FOR GOVERNMENT AGENCIES

RAILWAYS

Every railway work gang should have:

* Crosscut saws
* Axes
* Ropes
* Chain saws
* Raincoats, caps and gumboots should be made available to work gangs in an emergency situation
* Tractor shovel
* Tripper
* Auxiliary jeep
* First aid box
* Polythene, tarpaulins
* Fishplates
* Masonry articles
* Hand gloves

TELECOMMUNICATIONS

Emergency tool kits at each exchange should include:

* Cable
* Cable cutter
* Cutting pliers
* Spanners
* Ropes
* Ratchel tension
* Crosscut saws
* Pulley blocks with ropes
* Hand gloves
* Tarpaulins
* Standby generators for rechanging of batteries
* Poles

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Essential equipment for work teams:

* Towing Vehicle
* Teams with Equipment tenches
* Custesy blocks with chain and rope
* First aid box
* Old must papers
* Spesies
* Power chains
* Sharpening files
* Chains and tightening wrenches
* Pulley blocks with chain and rope
* First aid box
* Match boxes
* Old newspapers
* Spades
* Poles
* Flashings, torch and batteries
* Insecticide dusting pan
* Plastic bags an transfer bags
* Alcohol
* Anticoagulant rodenticides
* Live traps

APPENDIX –II

ADDRESS LIST FOR STATE VHA'S OF INDIA

Sl No	State	Address	Phone Numbers		Fax No.	Email
			Office	Residence		
1.	**Andhra Pradesh**	Executive Director, Andhra Pradesh VHA 157/6, Gun Rock Enclave West, Secunderabad Andhra Pradesh - 500003	040-7840089	0404-952928		Steevik@usa.net
2.	**Arunachal Pradesh**	Executive Secretary, VHA of Arunachal Pradesh, P.O. Box No. 185, Polo Hospital Compus, Ganga Market, Itanagar Arunachal Pradesh - 791111	0360-217651	0360-257978	0360-212046	
3.	**Assam**	Executive Secretary, Assam VHA 'Ashirwad' H/O Mr. N. C. Chakraborty, Geetanagar Area (Near ABITA Office), Zoo-Narengi Road, Guwahati Assam-781 024	0361-652613		0361- 264892 0361- 263633 (FAX- ATTN. VHAA)	Vhaa_gw1 @satyam.net.in

Sl No	State	Address	Phone Numbers		Fax No.	Email
			Office	Residence		
4.	**Bihar**	Executive Secretary, Bihar VHA West of Ganga Apartment, Opp. L.C.T. Ghat, Mainpura, Patna, Bihar - 800001	0612-266605	0612536712	0612- 266884	bvha1@dte.vsnl.in
5.	**New Delhi**	Executive Secretary, VHA of Delhi, D-199, Saket, First Floor, New Delhi 110017	011-696330	011-66419480	011- 6689330	
6.	**Gujarat**	Secretary, Gujarat VHA, E-5, Streling Row Houses, Gurukul Road, Subhash Chowk, Memnagar P.O. Ahmedabad 380052, Gujarat	0793- 7453828	0793-7421242	0793- 7453828	
7.	**Himachal Pradesh**	Executive Secretary, Himachal Pradesh VHA, B-37, Phase I, Sector II New Shimla 171009, Himachal Pradesh	0177- 270132, 271151 & 271307	Mobile No. 9816027013	0177- 271151	Hpvha@sify.com

Sl No	State	Address	Phone Numbers: Office	Phone Numbers: Residence	Fax No.	Email
8.	**Jammu & Kashmir**	Jammu & Kashmir VHA Mir Manzil, Pandrethan Srinagar 191101, Jammu and Kashmir	0194-466199 & 465626		0194- 466199	Ali@vsnl.com
9.	**Karnataka**	Executive Secretary, Karnataka VHA No. 60, Rajini Nilaya, 2nd Cross, Gurumurthy Street, Ramakrishna Mutt Road, Ulsoor, Bangalore, Karnataka - 560008	080-5546606		080- 5564847	
10.	**Kerala**	Executive Officer, Kerala VHS, Mullankuzhi, P.O. Collectorate Kottayam 686002, Kerala	0481-572781	0481-430264	0481- 573875	Kvhsc@sancharnet.in
11.	**Madhya Pradesh**	Executive Secretary, Madhya Pradesh VHA P.O. Kasturbagram, Khandwa Road, (Near Bilawali Lake) Indore-452020, Madhya Pradesh	0731-288794 & 288795	0731-460420	0731- 469848	Mpvha@sancharnet.in

Sl No	State	Address	Phone Numbers		Fax No.	Email
			Office	Residence		
12.	**Maharashtra**	Secretary VHA of Maharashtra, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram 442102, Wardha, Maharashtra	07512-8434155	07512-84320	07152-84730	net.in
13.	**Manipur**	Executive Secretary, Manipur VHA Wangkhei Ningthern Pukhri, Mapal, Imphal 795 0111, Manipur	0385-223795 & 442867	0385-421604	0385-223795 & 222936	Mvha@dte.vsnl.net.in
14.	**Meghalaya**	Executive Secretary, VHA of Meghalaya, Goenka Engineering Complex, Keatinge Road, Shillong 793001, Meghalaya	0364-228844	0364-225315	0364-222922	
15.	**Nagaland**	Acting Executive Director, Nagaland VHA Midland, Opp. War Cemetry, Kohima 797001 Nagaland	0370-221164	0370-280560	0370-22607 (c/o Telegraph Office, Kohima)	

Sl No	State	Address	Phone Numbers		Fax No.	Email
			Office	Residence		
16.	**Orrissa**	Executive Director, Orissa VHA Lokaswasthya Bhaban Plot No. 165, Laxminagar Chaka, Bhubaneswar - 751006 Orissa	0674-572842 & 572849	0674-436145	0674- 430933	
17.	**Punjab**	Executive Secretary, Punjab VHA SCF 18/1, Sector 10-D, Chandigarh 160011	0172-743557	0172-616982 Mobile No. : 9814109712	0172- 743557	
18.	**Rajasthan**	Executive Director, Rajasthan VHA 111/404, Shipra Path, Aggarwal Farm, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan	0141-398919		0141- 397720 (pp)	
19.	**Sikkim**	Executive Secretary, Sikkim VHA, Nam Nang Deorali Road, Mazong Kothi Compound, P. O. Box 144, Gangtok - 737101 Sikkim	03592-26505	03592-84320	03592- 22707	Bbrai@sikkim.org

Sl No	State	Address	Phone Numbers		Fax No.	Email
			Office	Residence		
20.	**Tamil Nadu**	Executive Director, Tamil Nadu VHA, 18 Appadurai Main Street, Ayananvaram, Chennai 600023, Tamil Nadu	044-6450462 & 6479585		044- 6479585	
21.	**Tripura**	Executive Secretary, Tripura VHA, Circuit House Area Opp. Bangladesh Visa Office, P. O. Kunjaban, Agartala 799006 Tripura	0381-222849	0381-324298	0381- 222849	Vhatripura@yahoo.co.in
22.	**Uttar Pradesh**	Administrator, Uttar Pradesh VHA 5/459, Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010, U.P	0522-725539 0522-725586		0522300 828	Upvha@sancharnet.in
		Regional Program Officer, U.P. VHA Regional Office, 2, Vivekananda Nagar Office, Varanasi, U.P. - 221002	0542-347101		0542- 360440 0542- 348710	

Sl No	State	Address	Phone Numbers		Fax No.	Email
			Office	Residence		
		Regional Program Officer U. P. VHA Regional Office, 164 Vasant Vihar, Phase I, Dehra Dun, Uttaranchal-248006	0135-773006		0135-773245	
23.	**West Bengal**	Executive Director, West Bengal VHA 19-A Sundar Mohan Avenue, Kolkata 700014, West Bengal	033-2460163 033-2446754	033-446790	033-2446754	
24.	**Goa (Upcoming VHA)**	Co-ordinator, Goa Health Collective C/O, The Sangath Society For Child Development and Family Guidance, 841/1 Alto Porvorim, Goa - 403521	0832-414916		0832415244	Sangath@goatelecom.com

APPENDIX –III

Important Telephone Nos. of the officials/ Institutions/NGOs connecting with Disaster Management and Relief operation

State Govt Officials of West Bengal

Designation	Address	Telephones	Fax
Chief Secy	Writers Building Kolkata-1	2215858	2354328
Principal Secy Home Dept	Do	2215656	2353001
Commn., Food Principal Secy	Food Supply Dept Kolkata-87	2442800	2453492
Principal Secy Relief Dept	Writers Building Kol-1	2215674	2215674
Principal Secy Public Health	New Secret. Building Kol-1	2485999	2485999
Principal Secy Fisheries	Writers Building Kol-1	2215777	
Principal Secy. Panchayat & Rural Devp.	Panchayat Bhavan 1/A, K.S. Rd, Kol-1	2483904	2484327
Secy Agril. Dept	Writers Building	2215506	2350045
Principal Secy Animal Resource	Do	2217616	2157494
Principal Secy P W D	Do	2215444	2215825
Secy, Health & F. W	Do	2215899	2215625
Irrigation & Water ways	Saltlake	3216980	

Important Situation

Name & Designation	Address	Telephones	Fax/ Email
All India Inst. Of Hygiene & Public Health	C. R. Avenue Kol-73	2413954	2418717
Administrative Training Inst.	Saltlake FC Block Sec-III, Kol-91	3370120	3373960
Jadavpur University	Jadavpur Kol-32	4735339	
SIPRD	Kalyani Nadia		

Important NGOs

Name & Designation	Address	Telephones	Fax/ Email
Lutheran World Service	84, Dr, Suresh Sarkar Rd, Kol-14	2449200/ 9730/9731	2443062 Iws@ IWS@cal.vsnl.net.in
UNICEF Kolkata	219/2 AJC Bose Rd., Kol-17	287 5049/ 2872511, 281 5049	
R. K. Mission Narendrapur	R. K. Mission Narendrapur 24 Pgns (S) W.B.	4772201/ 2207	4779025
Bharat Seva Ashram Sangha	211; Rashbehari Avenue, Kol-19	4405178/ 2327	
Oxfam-Cal	3, Bridge Street Kol-19	4635572/ 5573	cal@giasc.vsnl.net.in
MCC Cal	22, Girish Ch. Bose Rd., Kol-14	2453825 2442417	<mccindia@cal3.vsnl. net.in
Care, W.B.	12, Haralal Das Street, Kol-14	2462840/ 2843	
Save the Children	Kolkata		
Seva Kendra	52 / B Radhanath Chowdhury Rd Kol-15	3290381/ 3296028	

Name & Designation	Address	Telephones	Fax/ Email
Caritas	52 DRN Chowdhury Rd. Kol-15		cical@cal2. vsnl.net.in
Casa	5, Russel St. Kol-71	2268206/ 8187	cical@cal12. vsnl.net.in
WBVHA	19A Sundari Mohan Avenue Kolkata-14	246 0163	244 6754 wbvha@glascl01. vsnl.net.in.
IGSSS			
Red Cross St. John Ambulance	5 & 6, Govt. Place North Kolkata-1		

Important

Designation	Address	Telephones	Fax/Email
Director National Disaster Management	Ministry of Agrl. Krishi Bhavan	0113389023	0113382417
Director National Centre Disaster Management.	IP Estate Ring Rd New Delhi	0113358629	0113319954 Ncdmiipa@bol.net.in.
Director IIPA	Indraprasika Estate Ring Rd New Delhi.	0113317309	0113319954 Ilpa@.vsnl.net.in.
IIPA-New Delhi	Do	Do	vksnedm@usa.net.
IGNOU	IGNOU New Delhi		
Director Disaster Management Institution	P.B. No. 563 Paryavaram Parisar E%, Arera Colony Bhopal 462016	0755-566715 /561538	0755-566653
MSF	C-106, Defence Colony New Delhi 100 024	011-462 3567	011-462 3567
OSDM	9th Floor Rajib Bhaban Bhubaneshewar-1	0674 401773	0674 401871

Sl No.	Type Of Service	Name of the Organisation	Address	Tele Phone
1.	Day and Night Chemists	Marwari relief Society	225/227, Rabindra Sarani Kolkata-700 007	2383724/5/6/
		Jibandeep	114/B, Hazra Road, Kolkata-700 026	4553609/4908/ 4152
		Hazra Medical Stores	62/1c, Diamond Harbour Rd, Kolkata- 700 023	4496993
		Dhanwantry	65, Diamond Harbour Rd, Kolkata-700 023	4495594/42/3734
		Dreamland Nursing Home	2, Nayratna Lane, Kolkata- 700 004	5553216/ 3217/ 3245
		Ruby General Hospital	Kasba, Golpark-Em-Bypass, Kolkata-700 078	4420291/ 6091/ 6576
		Nandan Medical Stores	D D, 35 Seba Hospital, Kolkata-700 064	3581723
2.	24 Hrs Doctor Services	Swasti Nurses Bureau	10a, Ram Mohan Dutta Road, Kolkata- 700 020	4748881 / 4759158
		Ruby General Hospital	Kasba, Golpark Em-Bypass, Kolkata-78	4420291 / 6091 / 6576
3.	Oxygen Services	Circus Medical Hall	68a, Beckbagan Row, Kolkata-700 017	2472809
		Dhanwantry	65, Diamond Harbour Road, Kolkata-700 023	4495594/ 42/ 3734
		Jibandeep	114/B, Hazra Road, Kolkata - 700 026	4553609/ 4908/ 4152
		The Gujrati Relief Society	20, Pollock Street, Kolkata-700 001	255188/ 9585
4.	24 Hours Ambulance Service	Automobile Association of Eastern India	12, Promothesh Barua Sarani, Kolkata-700 019	4755131 / 5132/ 5233
		Jibandeep	114/B, Hazra Road, Kolkata:700026	4553609/0926
		Dhanwantry	65, Diamonad Harbour Rd, Kolkata-700 023	4495594/42/3734
		Hazra Medical Stores	62/1c, Diamond Harbour Road, Kolkata-700 023	4496993

Sl No.	Type Of Service	Name of the Organisation	Address	Tele Phone
		Medicare Services	6, Bishop Lefroy Road, Kolkata-700 020	2401333 / 1337/ 2053
		Calcutta Heart Research Centre	114b, Sarat Bose Road, Kolkata-700 029	4647613/4756747/ 2393373
		Indian Red Cross Society	West Bengal State Branch 5 & 6, Government Place North, Kolkata-700 001	2483636
		Meera Seva Kendra	2/87, Naktala, Kolkata:700 047	4119400/0968/ 8316
		Rameswara Nursing Home	P-155, C I T Scheme VIIM, Ultadanga, Kolkata: 700054	3374247/3349923/ 9863
		Indian Association Of Blood Cancer And Allied Diseases	81 C, Narkeldanga Main Road, Kolkata: 7000054	3512634/ 35301338
		Swasti Nurses Bureau	10a, Ram Mohan Dutta Road, Kolkata-700 020	4748881 / 4759158
		Ruby General Hospital	Kasba, Golpark Em-Bypass, Kolkata-700 078	4420291/ 6091/ 6576
		The Gujrati Relief Society	20, Pollock Street, Kolkata-700 001	255188/9585
		Dreamland Nursing Home	2,Nayratna Lane, Kolkata-700 004	5553216 / 3217/ 3245
		St. John Ambulance Association	41/1A Townshend Road, Kolkata : 700025	46356031/4761935
		Marwari Relief Society	225/227, Rabindra Sarani Kolkata-700 007	2383724/5/6/
5.	Blood Bank	Bhoruka Public Welfare Trust	63, Rafi Ahmed Kidwai Rd, Kolkata-700 016	2449619/ 8092
		Lions District 322 B Blood Bank	27/8a, Waterloo Street, Kolkata-700 069	2485778 / 5780
		Indian Association Of Blood Cancer And Allied Diseases	81c, Narkeldanga Main Road, Kolkata-700 054	3512634 / 3530138
6.	Cardiac Units	Beckbagan Nursing Home Pvt Ltd.	1/1, Ahiripukur 1st Lane, Kolkata: 700019	2470461/5067/13

Sl No.	Type Of Service	Name of the Organisation	Address	Tele Phone
		B. M. Birla Heart Research Centre (mobile unit)	1/1, National Libarary Avenue, Kolkata: 700027	4567777/7890/7800
		Capital Nursing Home Pvt Ltd	288/2, A.P.C. Road, Kolkata: 700009	3507272/4913
		Devine Nursing Home Pvt Ltd	11/A, Abinash Ch Banerjee Lane,Beliaghata, Kolkata: 700010	3502761/5636/4765
		Dreamland Nursing Home	2, Nayratna Lane, Kolkata: 700004	5553216/7/3245
		Gamma Centauri	3B, Albert Road, Kolkata: 700017	2476410/4772
		Medicare Services (mobile unit)	6, Bishop Lefroy Road, Kolkata: 700020	2809510/9791/6112
		Rameswara Nursing Home	P-155, C I T Scheme VIIM, Ultadanga, Kolkata: 700054	3374247/3349923/9863
		Ruby General Hospital	Kasba, Golpark Em-Bypass, Kolkata-700 078	4420291 / 6091/6576
		The Gujrat Relief Society	20, Pollock Street, Kolkata-700 001	255188/9585
		Woodlands (mobile unit)	8/5, Alipore Road, Kolkata: 700027	4567075/77/78

APPENDIX -IV

Centers of Bharat Sevasharam Sangha

Head Office: 211, Rash Behari Avenue, Kolkata- 700 019
Phone : 440-5178, 440-2327 Fax : 440-2326

1. Swarajyapuri Road, Gaya (Bihar), Pin. 823001, Ph. 0631-420579/423663.
2. Sigra, Varanasi-10 Ph. 0542-221639.
3. 93, Tularam Bag, Allahabad-6 (U.P), Ph.0532-500897.
4. Vrindavan, Dt. Mathura (U.P.) , Pin. 281121 Ph. 0565-443324.
5. Srinivaspuri, New Delhi-65. Ph. 011-6848181/6839757, Fax : 011-6316566.
6. Kurukshetra, (Haryana) Pin. 132118, Ph. 01744-20445.
7. Hardwar, Post Box No. 23, Pin. 249401, Ph. 0133-426363, 423456, 423457.
8. Kedarnath, Dt. Rudraprayag (U.P.), Pin. 246445 Ph. 01364-6213.
9. Gourikunda, Dt. Rudraprayag (U.P.), Pin. 246476 Ph. 01363-69206.
10. Badrinath, Dt. Chamoli (U.P.), Pin. 246422, Ph. 01358-2242, 3245.
11. L. T. B. Road, Hyderabad, Pin. 500380, Ph. 040-7612284.
12. Swargadwar, Puri (Orissa) Pin. 752001, Ph. 06752-23227.
13. Navarangpura, Ahmedabad-9 (Gujrat), Ph. 079-6580367, 658-6038.
14. Katargarm, Surat, Pin-395004, Ashram, Ph. 0261-480016, A. B. Road-428352.
15. Vashigaon, Vashi, New Bombay-400703, Fax Ph. 022-782 3707, 782-6625, Tele Fax. 782-6539.
16. Kattupillaiyar Koel Rd., Rameshwaram-623526 Ph. 04573-21215.
17. Anju Kuttu Villai Road, Kanyakumari-629702, Ph. 04652-46164.
18. River's meet Rd. Sonari West, Jamshedpur-11, Ph. 0657-302371.
19. Subhaspally, Siliguri, Pin. 734401, Ph. 0353-422232.
20. Gangasagar, (S) 24 Pgs. Pin. 734606, Ph. 03210-40205.
21. Pranavanandapally, Bankura, Pin. 722101, Ph. 03242-50744.
22. Pranavananda Rd. Garia, Cal-84, Ph. 033-4303580.
23. N. S. Rd. Navadwip, Nadia, Ph. 03472-40227.
24. Diamond Harbour, 24-Pargs (s), Ph. 03174-55269.
25. Horekhali, Dt. Midnapore, Ph. 03224-31219.

26. Mahishadal, Do Ph. 03224-40361.
27. Pukuria, Do Ph. 03221-55341.
28. Colonelgola, Midnapore, Ph. 03222-63364.
29. Sahapur, Malda Ph. 03512-60459.
30. Raiganj, Dt. Dinajpur Ph. 0352-352775.
31. Aurangabad, Dt. Murshidabad, Ph. 03485-62442.
32. Teor, Dt. South Dinajpur, Ph. 03522-52433.
33. Ranibadh, Bankura Ph. 03243-50232.
34. Purulia Ph. 03252-22056.
35. Suri, Dr. Birbhum Ph. 03462-55481.
36. Tarapith, Do Ph. 03461-53227.
37. Choto Nilpur, Burdwan, Ph.0342-562697.
38. Pranavanada Vidyamandir, Chaitanya Ave. Durgapur Ph. 0343-563333 Ashram-562121.
39. Lakhra Road, Gauhati 781018, Ph. 0361-471329.
40. Station Rd., Dwaraka Ph. 02892-34157.

APPENDIX –V

Kolkata Based Hospitals

Advanced Medicare & Research Institute
P-4 & 5, C.I.T. Scheme - LXXII, Block - A,
Gariahat Road,
Kolkata - 700 029,
West Bengal,

Assembly Of God Church Hospital & Research Centre 125/1, Park Street
Kolkata-700 017, Tel No. 296572

Bangur Institute Of Neurology
52/1a, S. N. Pandit Street
Kolkata-700 025, Tel No. 223 2235

Beliaghata I. D. Hospital
57, Baliaghata Main Road
Kolkata - 700 010
Tel No. 350 1251/ 1252

B. C. Roy Polio Clinic & Hospital
For Crippled Children
38, Bidhan Roy Lane
Kolkata - 700 010
Tel No. 335 1969

Barisha Hospital
Barisha, Kolkata-700 008

Boral T. B. Hospital For Tropical Medicine
Boral Road, Boral, Garia
Kolkata-700 084
Tel No. 721240

Balananda Arogya Bhavan
4, Dr. R. N. Tagore Road
Kolkata-700-057

B. M. Birla Heart Research Centre
1/1, National Library Avenue
Kolkata-700 027
Tel No. 4792711

Bellevue Clinic
9, Loudon Street, Kolkata-700 017
Tel No. 247 2321

Carmichael Hospital ForTropical Medicine
Chittaranjan Avenue
Tel No. 239 0900

Chittaranjan Seva Sadan & Shishu Sadan
37, S. P. Mukherjee Road
Kolkata-700 026
Tel No. 4751021/ 4584 / 5074

Calcutta National Medical College & Hospital
242, Gora Chand Road
Kolkata - 700 014
Tel No. 2440122 / 3

Calcutta Hospital
7/2 Diamond Harbour Road.
Kolkata-700 027
Tel No. 4791921

Cancer Centre & Welfare Home
Thakurpukur
Tel No. 4678001, 4678003

Champa Mohini Maternity Home
Chetla Hat Road
Kolkata

Dr. B. C. Roy Memorial Hospital For Children
Narkeldanga Main Road
Kolkata-700 054
Tel No. 3528101

Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital
114, A. J. C. Bose Road
Cal-700 054

Dr. M. N. Chatterjee Memorial Eye Hospital
295/1, A. P. C. Road
Cal-700 009

Dhanwantary
65, Diamond Harbour Road
Kolkata-700 023
Tel No. 495594

Institute of Child Health
95, Dilkhusha Street
Kolkata-700 017
Tel No. 2475515

Kothari Medical Centre
8/3, Alipore Road
Kolkata-700 027
Tel No. 4792557

Medical College and Hospital
88, College Street
Kolkata-700 012

Medinova Diagnostic Services
1, Sarat Chatterjee Avenue
Kolkata-700 029
Tel No. 4663651

Nightingle Diagnostic & Eye Care Research Centre
11, Shakespeare Sarani,
Kolkata-700 071
Tel No. 2427263/ 2427255

Peerless Hospital & B. K. Roy Research Centre
360, Panchasayar, Garhia
Kolkata-700 084, Tel No. 4620955

Ruby General Hospital
483, E. M. Bye Pass,
Kolkata-700 087
Tel No. 4656091

Seth Sukhlal Karnani Memorial Hospital
244, A.J.C. Road,
Kolkata-700 020
Tel No. 2236242, 2239692

Wockhardt Medical & Research Centre
2/7, Sarat Bose Road
Kolkata-700 020
Tel No. 4754096, 4754320

Woodlands Nursing Home
8/5, Alipore Road, Kolkata-700 027
Tel No. 4791951

Garden Reach Maternity Hospital
Cicular Garden Reach Road
Kolkata-700 024

G. K. Khemka Chest Clinic & Hospital
107B, Raja Dhirendra Street
Kolkata-700 006

Abinash Dutta Maternity Home
109/111, B. K. Pall Avenue
Kolkata-700 005, Tel No. 5308504

Baranagar S. G. Hospital
104, Akhay Mukherjee Road
Calcutta-700 090
Tel No. 5573636/ 6246

Balaram Seva Mandir Hospital
Khardah, District 24 Parganas (N)
Kolkata
Tel No. 5533772

Kolkata Police Hospital
2, Beni Nandan Street
Kolkata-700 025
Tel No. 4552064

Gandhi Memorial Hospital
Kalyani
Tel No. 828443

J. N. M. Hospital
P.O. Kalyani
Dist - Nadia
Tel No. 828386 / 8562

Institute Of Psychiatry, Bhawanipur
7, D. L. Khan Road
Kolkata-700 025
Tel No. 2232841

K. S. Roy T. B. Hospital
Jadavpur University
Kolkata-700 032
Tel No. 4122202 / 3257

National Medical College & Hospital
Park Circus, Kolkata-14
Phone : 244-0122/23

R. G. Kar Medical College & Hopital
R. G. Kar Road, Kolkata-4
Phone : 555-8838

Nilratan Sarkar Medical College & Hospital
A.P.C. Road, Kolkata-14
Phone : 244 3213/14/15/16

APPENDIX –VI

Important Contact Number for District Administration

District	STD Code	Savadhipati	District Magistrate	CMOH	SP	Fire Brigade(101)
Bankura	03242	Tel: 50270/50365/50644	Tel: 50304 Fax: 54807	Tel:50545 Fax: 50305	Tel:50305	Tel:51291
Bardhaman	0342	Tel: 562045/562406/ 562401 Fax: 563327	Tel: 562428 Fax: 54807	Tel: 562467 Fax: 569620	Tel: 562495	Tel: 557901
Birbhum	03462	Tel:55712/55713/ 55472 Fax: 57003	Tel: 5522 Fax: 565222	Tel: 55216	Tel: 50305	Tel: 55500 (Suri)
Coochbehar	03582	Tel: 22550/22486	Tel: 27101 Fax : 27000	Tel: 22274	Tel: 27755	Tel: 29101
Dakshin Dinajpur	03522	Tel : 55366/55229 Fax : 55279	Tel: 55201 Fax : 55488	Tel: 55640	Tel: 55321	Tel : 55613
Darjeeling (DGHC)	0354	Tel : 54434/54377 Fax : 54372	Tel: 54233/54266 Fax: 54338	Tel : 532456	Tel: 54270/54277	Tel: 52128/52121
Hooghly	033	Tel : 6801089/2225/ 2139/9211/3265 Fax : 6802048	Tel : 6802122/ 2044 Fax : 6802048	Tel : 6802138	Tel : 6804827	Tel : 6802309 (Chinsurah)
Howrah	033	Tel : 6603367/6602531/ 6604630 Fax : 6603367	Tel : 6602024 Fax : 6604913	Tel : 6604326	Tel : 6602626	Tel : 6668111

District	STD Code	Savadhipati	District Magistrate	CWOH	SP	Fire Brigade(101)
Jalpaiguri	03561	Tel : 32045/30287	Tel : 30127	Tel : 32001	Tel : 30492	Tel : 22129
Maldah	03512	Tel : 52377/53042 Fax : 52423	Tel : 52381 Fax : 53049	Tel : 52337	Tel : 52520	Tel : 52054
Medinipur	03222	Tel : 62428/ Fax : 660454	Tel: 62571 Fax : 62785	Tel : 62773/ 62695	Tel : 62609	Tel : 63895
Murshidabad	03482	Tel : 51653	Tel : 51650/ 54645	Tel : 53851	Tel: 50751	
Nadia	03472	Tel : 56106/52499 Fax : 53085	Tel : 52381 Fax : 53030	Tel: 523306	Tel : 52229	Tel : 52250
North 24 Parganas	033	Tel : 5624596/523640 Fax : 5523535/5523005	Tel : 5523662 Fax :	Tel : 5523129 (Barasat)	Tel : 5423055	Tel : 5423444
Purulia	03252	Tel : 22255/ 22575	Tel : 22302 Fax : 22490	Tel : 22480	Tel : 22304	Tel : 22201
South 24 Parganas	033	Tel : 4791385/8998/ 4791738	Tel : 4793713 Fax : 793456	Tel: 55640 Fax :	Tel: 4793333	Tel:
Uttar Dinajpur	03523	Tel : 52276/ 52826 Fax : 52276	Tel : 52925 Fax : 52250	Tel : 52039 Fax :	Tel : 52461	Tel : 52222 Raiganj)
Siliguri Mahakuma	0353	Tel : 432597/431544 Fax: 433997	Tel: Fax:	Tel: Fax:	Tel:	Tel:

APPENDIX –VII

Important Contact Numbers for Sub-Divisional Administration

District	Sub Divisions	STD CODE	SDO	STD CODE	ADM	Dy. CMOH-II	Dy. CMOH-III	SRO
Bankura	1. Sadar	03242	50260	03242	ADM(G)-50757	53847	54831	
	2. Bishnupur	03244	52055		ADM-50355			
	3. Khatra	03243	55262		(DEV)			
Bardhaman	1. Sadar	0342	562353	0342	ADM(G)-562364	65192	62074	
	North	0342	563319		ADM 563335			
	2. Sadar	0343	545141		(DEV)			
	South	0341	252222		ADM(L.R)-562443			
	3. Durgapur	03453	55550	0341	ADM-25311-14			
	4. Asansol	03454	55026		(Asansol)			
	5. Katwa							
	6. Kalna							
Birbhum	1. Sadar	03462	55239	03462	ADM(I)-55272	55296	55493	
	2. Rampurhat	03461	55002		ADM-55422			
	3. Bolpur	03463	52671		(II)			
Coochbehar	1. Sadar	03582	27105	03582	ADM(DEV)-27002	22351	22615	
	2. Tufanganj	03582	44220		ADM-27103			
	3. Dinhata	03581	55001		(Election)			
	4. Mathabhanga	03583	55287					
	5. Mekhiliganj	03584	55297					

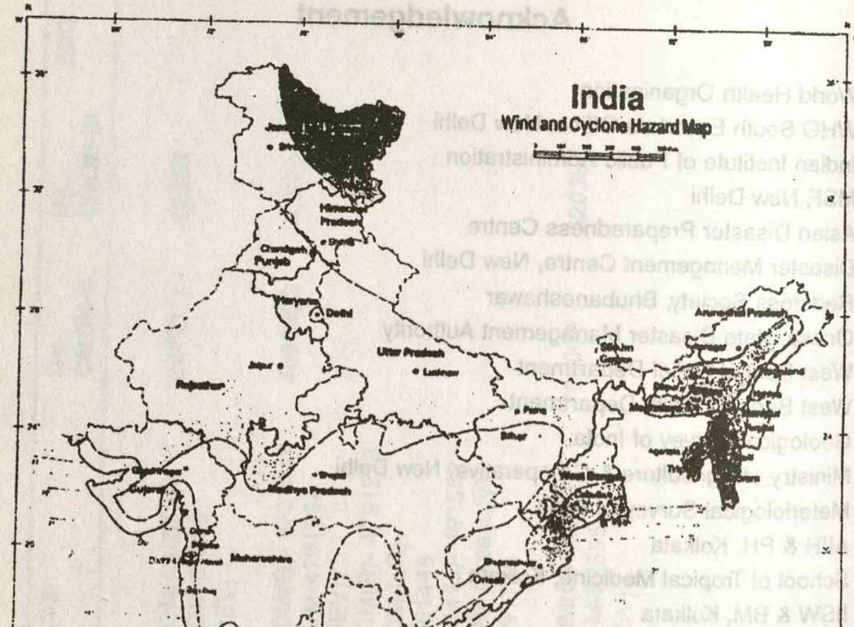
District	Sub Divisions	STD CODE	SDO	STD CODE	ADM	Dy. CMOH-II	Dy. CMOH-III	SRO
Dakshin Dinajpur	1. Balurghat 2. Gangarampur	03522 03524	55205 59086	03522	ADM(G)-55203 ADM-55248 (DEV)	55642	55643	
Darjeeling	1. Darjeeling 2. Siliguri	0354 0353	54284 430800	0354	ADM(G)-54245 ADM-54284 (DEV) ADM(L.R)-54313	54747	54449	
Hooghly	1. Sadar 2. Chandannagar	033 033	6802535 6834193	033	ADM(G)-6802043 ADM-6802317 (DEV)	802505	802835	
Howrah	1. Sadar 2. Uluberia	033 033	6602329 6610336	033	ADM(G)-6603121 ADM-6606474 (DEV) ADM(L.R)-6602749	688157		
Jalpaiguri	1. Sadar 2. Alipurduar	03561 03564	32017 56391	03561	ADM(G)- ADM- (DEV)	22255	22763	
Madah	1. Sadar 2. North	03512 03512	52733 52083	03512	ADM(G)-52351 ADM-53049 (DEV)	52493	52658	

District	Sub Divisions	STD CODE	SDO	STD CODE	ADM	Dy. CMOH-II	Dy. CMOH-III	SRO
Medinipur	1. Midnapur	03222	62330	03222	ADM(G)-62455	62854	62217	
	2. Kharagpur	03222	55345		ADM-62630			
	3. Ghatal	03225	55040/ 55145		(DEV) ADM(L.R)-63796			
	4. Contai	03220	55001	03228	ADM(Tamluk)-			
	5. Jhargram	03221	55001		66098			
	6. Tamluk	03228	66021					
	7. Haldia	03224	74015					
Murshidabad	1. Sadar	03482	50389	03482	ADM(G)-50147	52403	50480	
	2. Lalbag	03483	55222		ADM-50389			
	3. Jangipur	03483	66234		(DEV)			
	4. Kandi	03484	55221					
Nadia	1. Sadar	03472	53080	03472	ADM(G)-52293	52711	52587	
	2. Tehatta	03474	50292		ADM-52889			
	3. Ranaghat	03473	55095		(DEV) ADM(D.L & L.R)- 52421 ADM (Z.L)-52233			
North 24 Parganas	1. Basirhat	9117	55298/	033	ADM-5523207	5524170	5523772	
	2. Barasat	033	5523311		ADM(G)- 5523355			
	3. Bangaon	03215	55001		ADM-5523007 (DEV)			

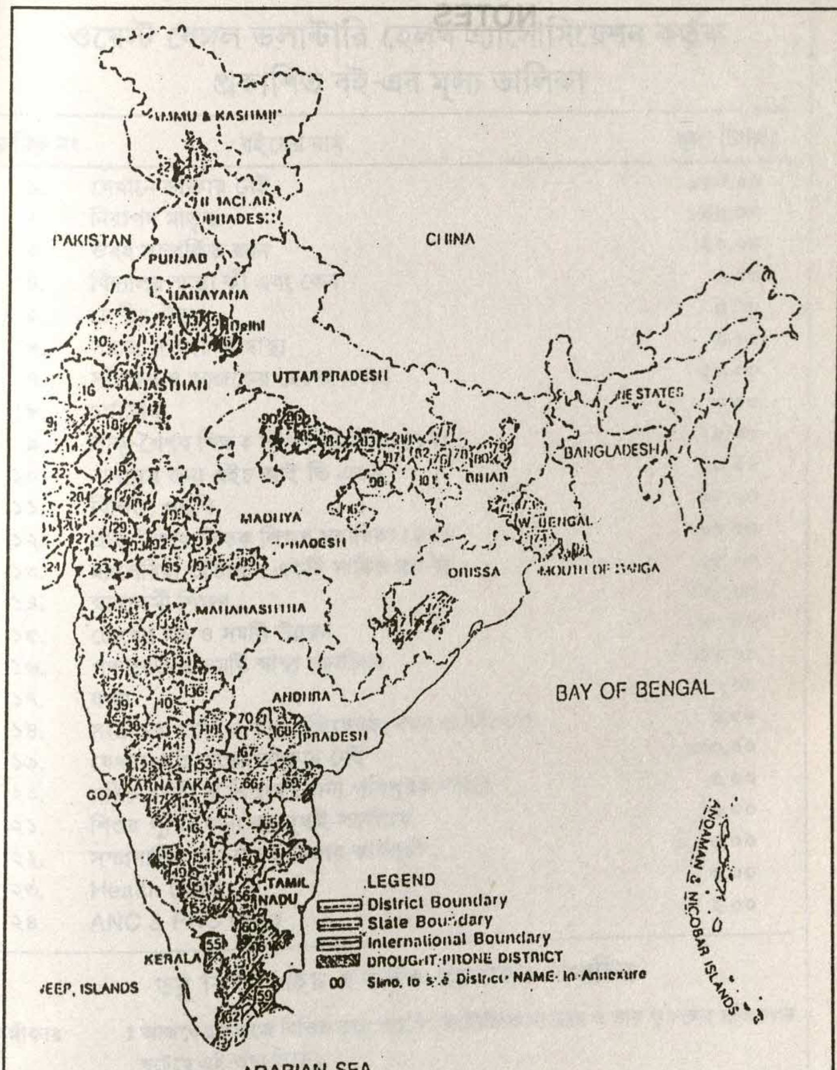
District	Sub Divisions	STD CODE	SDO	STD CODE	ADM	Dy. CMOH-II	Dy. CMOH-III	SRO
Purulia	1. East Sadar 2. West Sadar 3. Raghunathpur	23252 03252 03251	03266 23263 55234	03252	ADM(G)-23120 ADM-23259 (DEV)	22401	22553	
South 24 Parganas	1. Alipur 2. Canning 3. Baruipur 4. Kakdwip 5. Diamond Harbor	033 9118 033 03210 9174	4791681 55340 4338579 55200 55222	033	ADM(G)- 4791215 ADM-4791694 (DEV) ADM(R)- 4791233 ADM(L.R)- 4791448 ADM (J)- 491552 ADM (Treasury)- 4791755	4686990	4732018	
Uttar Dinajpur	1. Raigunj 2. Islampur	03523 03521	52444 55001	03523	ADM(G)- 52347 ADM-52555 (DEV)	00000	52039	

Acknowledgement

World Health Organisation
WHO South East Asia Office, New Delhi
Indian Institute of Public Administration
MSF, New Delhi
Asian Disaster Preparedness Centre
Disaster Management Centre, New Delhi
Redcross Society, Bhubaneshawar
Orissa State Disaster Management Authority
West Bengal Relief Department
West Bengal Health Department
Geological Survey of India
Ministry of Agriculture & Co-operative, New Delhi
Meteriological Survey of India
AIIH & PH, Kolkata
School of Tropical Medicine, Kolkata
IISW & BM, Kolkata
B. E. College, Shibpur
Unicef, Kolkata
Inter Agency Partners
Voluntary Health Association of India, New Delhi
NGO & CBO & Panchayat
Donors and Welwishers
All District Administration, West Bengal
Mr. S. K. Swami, Director, N. D. M., Ministry of Agriculture Govt. of W. B.
Anil Sinha, I. A. S., Director, N C D M, New Delhi
Michle Seromony, I A S, India Red Cross Society, New Delhi
Sri Nikhilesh Das, I A S, Principal Secretary, Relief Govt. of W. Bengal
Prof. P H Anandanarayan Director AIIH&PH, Kolkata
John Kosh I A S Director A T I Kolkata
Prof. G. P. Datta, Members Govt. of W. B. State Planning Board
Prof. V K Sharma N C D M, New Delhi
Prof. S. P. Mukhopadhyay Social Welfare and Bussiness Management
Prof. Ranadeb Biswas, Kolkata AIIH&PH, Kolkata
Prof. Tapash Bhattacharjee, School of Tropical Medicine, Kolkata
R. N. Golder Director, Kolkata Metrological Institute
Sree Chandan Roy Retd. Chief Engineer, Irrigation, Govt. of W.B.



Source : District Disaster Management
Ministry of Agriculture, Govt. of India.



MAP OF INDIA SHOWING LOCATION OF THE DROUGHT - PRONE DISTRICTS

Source : District Disaster Management Ministry of Agriculture, Govt. of India.

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত বই-এর মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	মূল্য (টাকা)
১.	যেখানে ডাক্তার নেই	১৩০.০০
২.	নিরাপদ মাতৃত্ব	১৩০.০০
৩.	ঔষধ সম্পর্কিত জ্ঞান	২০.০০
৪.	বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কী এবং কেন	৩.০০
৫.	দেশীয় ঔষধ	৩.০০
৬.	সমাজ সংস্কার ও স্বাস্থ্য	৩.০০
৭.	সন্ধিক্ষণ ও আজকের ছেলেমেয়েরা	২০.০০
৮.	চর্মরোগ	৩.০০
৯.	প্রাক্-শৈশব শিক্ষক শিক্ষণ সহায়িকা (১ম)	২৫.০০
১০.	নার্সদের জন্য এইচ আই ভি এডস	২০.০০
১১.	বিলিংস পদ্ধতি	৪৫.০০
১২.	প্রাক্-শৈশব শিক্ষক শিক্ষণ সহায়িকা (২য়)	৩০.০০
১৩.	ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ একটি সার্বিক প্রচেষ্টা	১৫.০০
১৪.	স্বাস্থ্যকর্মী শিক্ষণ	১০০.০০
১৫.	চোখের যত্ন ও সমষ্টি উন্নয়ন	১০০.০০
১৬.	পঞ্চায়েত ও সমষ্টি স্বাস্থ্য সহায়িকা	১০০.০০
১৭.	যক্ষ্মা	৩.০০
১৪.	সংক্রামক ব্যাধি ও তার প্রতিষেধক, দমন ও চিকিৎসা	৩.০০
১৯.	যেখানে মহিলাদের ডাক্তার নেই	১৩০.০০
২০.	সঠিক বদলী বা শিশুদের জন্য পরিপূরক খাবার	৩.০০
২১.	শিশুর পুষ্টির জন্য স্তন্যদুগ্ধই সর্বোত্তম	৩.০০
২২.	সম্প্রসারিত প্রতিষেধক টিকার কার্যসূচী	৩.০০
২৩.	Health Card	৩.০০
২৪.	ANC & PNC Card	২.০০

ডব্লু বি ভি এইচ এ কর্তৃক প্রযোজিত তথ্যচিত্র

অঙ্গীকার : আজকের সমাজে বিভিন্ন স্তরে ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার ও তার কুফলের প্রতিফলন ঘটেছে এই তথ্য চিত্রে।

সংকল্প : ছেলেবেলা থেকে প্রতিটি শিশুকেই স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা উচিত যা তাদের সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। পরিচালনা - রাজা সেন।

মঈনের ঠিকানা : ড্রাগের নেশা ও তার কুফল, কী কী কারণে মানুষ ড্রাগাসক্ত হয়ে পড়ে, সম্ভাব্য প্রতিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৪০ মিনিটের - এই ভিডিও ফিল্মটির পরিচালক-জয়দীপ ঘোষ।

দর্পণ : এড্স একটি ভয়ঙ্কর রোগ। এই রোগের থেকে বাঁচার জন্য কীভাবে সচেতন হওয়া যায়, এই রোগের লক্ষণগুলি কী কী, এর কুফল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ তথ্য চিত্র।

এছাড়া রয়েছে ভিহাই-এর - রোগ সম্পর্কে সচেতনতার নানান তথ্য চিত্র।

COMMUNITY DEVELOPMENT MEDICINAL UNIT

(A LOW COST PROJECT MEANT FOR HEALTH SECTOR NGOs)

Background :

Community Development Medicinal Unit [CDMU] is a non-profit making social service organization engaged in promoting Rational Use of Drug in West Bengal, operating since 1986.

Activities :

CDMU's activity involves supply of Drugs and medicinal items to the NGOs, working in health sector in West Bengal at an affordable price.

Our drug distribution system caters more than 500 NGOs and other Social Welfare Service Organizations helping poorest of the poor people in West Bengal.

Our main mission is to cater low cost and quality assured medicines from our stores at Kolkata & Siliguri as per WHO (World Health Organization) guidelines.

CDMU procures medicines through a tender based selection process. For this reason, it can provide medicines to it's members at a rate 35-40% less than the market price. Bulk purchase and direct price negotiations are the key factors to this achievement which is translated to our members in turn.

CDMU's Membership :

Any NGO/Voluntary Organization working in health care activities can be a member of CDMU with a nominal Lifetime Membership Fees of Rs. 50/- which enables them to collect quality assured/low priced medicines for their organizational requirement.

Other activities of CDMU :

Other than our rational drug distribution activities, we provide unbiased drug information to our members. To organize seminars, workshops and training programmes on behalf of our members, a team of Medical Professionals are attached to our CDMU Documentation Centre as resource persons.

Our main motto is to improve the health scenario in the country through Rational Use of Drugs at par with the guidelines of WHO (World Health Organization).

Contact address :

Head Office :

Community Development Medicinal Unit
86C, Dr. Suresh Sarkar Road, Entally
Kolkata - 700 014
Ph No : 245-4758 (Fax), 245-2363.

Documentation Centre :

47/1B, Garcha Road, Kol- 19
Ph No. : 475-5668 (Fax), 474-8553
E_mail : cdmudocu@giascl01.vsnl.net.in

Siliguri Unit : East Vivekananda Palli, Raja Rammohan Roy Road, P. O. Rabindra Sarani, Siliguri 734406, Dist. Darjeeling. Ph. No. : (0353) 432807